বোর্ড প্রশ্ন ও উত্তরমালা ২০২৪ ও ২০২৩

বাংলা দ্বিতীয় পত্র

ঢাকা বোর্ড–২০২৪

সেট : ক

বাংলা দ্বিতীয় পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 1 0 2

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময় : ৩০ মিনিট — পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি কালো কালির বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. **মুখের ভাষা ক্রমশ কোন বিষয়ে পরিণত হয়েছে?**
ⓚ লেখার ও শুনার ⓚ লেখার ও দেখার
ⓖ লেখার ও ছাপার ⓖ ছাপা ও বলাদর

২. **ধ্বনিতত্ত্বে আলোচ্য বিষয় কোনটি?**
ⓚ ধ্বনি ⓚ প্রত্যয় ⓖ কারক ⓖ সমাস

৩. **সাধু রীতির বহু সর্বনামে কী যুক্ত থাকে?**
ⓚ 'কা'-বর্ণ ⓚ ত-বর্ণ ⓖ 'হ'-বর্ণ ⓖ 'ম'-বর্ণ

৪. **তালুর অংশ কয়টি?**
ⓚ দুইটি ⓚ তিনটি ⓖ চারটি ⓖ পাঁচটি

৫. **কোনটি মৌলিক স্বরধ্বনি?**
ⓚ [ঐ] ⓚ [ই] ⓖ [ঔ] ⓖ [ঈ]

৬. **'চাই' শব্দের পূর্ণ স্বরধ্বনি কোনটি?**
ⓚ [ই] ⓚ [আ] ⓖ [চ] ⓖ [গ]

৭. **পার্শ্বিক ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ কোনটি?**
ⓚ ম ⓚ ন ⓖ ল ⓖ থ

৮. **'মৌমাছি'–এর সঠিক উচ্চারণ হলো–**
ⓚ মোওমাছি ⓚ মউমাছি ⓖ মওমাছি ⓖ মোউ্মাছি

৯. **শব্দমূলের অন্য নাম কী?**
ⓚ ধ্বনিমূল ⓚ প্রকৃতি ⓖ শব্দগুচ্ছ ⓖ বিভক্তি

১০. **বাংলা ভাষায় উপসর্গের সংখ্যা কতটি?**
ⓚ অর্ধশতাধিক ⓚ শতাধিক
ⓖ সহস্রাধিক ⓖ অর্ধ সহস্রাধিক

১১. **যে কারকে ক্রিয়ার উৎস নির্দেশ করা হয় তা কোন কারক?**
ⓚ কর্তা ⓚ কর্ম ⓖ করণ ⓖ অপাদান

১২. **'পাখিগুলো নীল আকাশে উড়ছে।' –গঠনবৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাক্যটি হলো–**
ⓚ সরল ⓚ মিশ্র ⓖ জটিল ⓖ যৌগিক

১৩. **যোজক দ্বারা দুইটি বিশেষ্যযুক্ত হয়ে কোন বর্গ তৈরি হয়?**
ⓚ ক্রিয়াবর্গ ⓚ বিশেষ্য বর্গ
ⓖ বিশেষণ বর্গ ⓖ ক্রিয়াবিশেষণ বর্গ

১৪. **'তারা সাগরের তীরে ঝিনুক কুড়াত'। –বাক্যটি কোন কালের ক্রিয়ার?**
ⓚ সাধারণ অতীত ⓚ ঘটমান অতীত
ⓖ নিত্য অতীত ⓖ পুরাঘটিত অতীত

১৫. **'লোকে কিনা বলে' –বাক্যের লোক শব্দের সঙ্গে কোন বিভক্তি যুক্ত আছে?**
ⓚ - তে ⓚ - রে ⓖ - এ ⓖ - কে

১৬. **'বৃক্ষ' শব্দকে বহুবচন করতে কোন লগ্নকটি ব্যবহৃত হয়?**
ⓚ বর্গ ⓚ রা ⓖ মালা ⓖ সমূহ

১৭. **অনুসর্গকে কত ভাগে ভাগ করা যায়?**
ⓚ দুই ⓚ তিন ⓖ চার ⓖ পাঁচ

১৮. **নিচের কোনটি সংযোগ ক্রিয়ার উদাহরণ?**
ⓚ এগিয়ে চলা ⓚ উদয় হওয়া
ⓖ ছটফটানো ⓖ খেলছে

১৯. **নিচের কোন ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্বের মাঝখানে স্বরধ্বনির আগমন ঘটেছে?**
ⓚ থকথকে ⓚ মজায় মজায়
ⓖ পটাপট ⓖ চুপচাপ

২০. **বাচ্য কত প্রকার?**
ⓚ দুই ⓚ তিন ⓖ চার ⓖ পাঁচ

২১. **বাক্যের মধ্যকার একাধিক পদকে সংযুক্ত করতে কোন যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হয়?**
ⓚ কমা ⓚ দাঁড়ি
ⓖ সেমিকোলন ⓖ হাইফেন

২২. **'অপরূপ' শব্দটি দ্বারা শ্রীহীনতা না বুঝিয়ে অনির্বচনীয় সৌন্দর্যকে বোঝালে অর্থের কী ধরনের পরিবর্তন হয়?**
ⓚ অর্থের উন্নতি ⓚ অর্থের অবনতি
ⓖ অর্থের বদল ⓖ অর্থসংকোচ

২৩. **'ঠোঁটকাটা'–এর সমার্থক বাগ্ধারা কোনটি?**
ⓚ ভিজে বিড়াল ⓚ তালকানা
ⓖ চশমখোর ⓖ খয়ের খাঁ

২৪. **'রাত' শব্দের সঠিক প্রতিশব্দ কোনটি?**
ⓚ অবনী ⓚ দ্রুম ⓖ শর্বরী ⓖ মরুৎ

২৫. **কোন নির্দেশকটি বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়?**
ⓚ টা ⓚ খানা ⓖ জন ⓖ টুকু

২৬. **নিচের কোন বাক্যটিতে প্রশংসা আবেগ প্রকাশ করে?**
ⓚ হ্যাঁ, আমাদের জিততেই হবে।
ⓚ হে বন্ধু, তোমাকে অভিনন্দন।
ⓖ শাবাশ! এমন খেলাই তো চেয়েছিলাম।
ⓖ আহ, কী চমৎকার দৃশ্য!

২৭. **কোন শব্দটি নিত্য নারীবাচক?**
ⓚ শিক্ষিকা ⓚ সতীন ⓖ মেয়েলি ⓖ জেলেনি

২৮. **'রাজপথ' কোন সমাস?**
ⓚ তৎপুরুষ ⓚ কর্মধারয়
ⓖ উপমান কর্মধারয় ⓖ বহুব্রীহি

২৯. **নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি কোনটি?**
ⓚ শুভেচ্ছা ⓚ নায়ক ⓖ নাবিক ⓖ কুলটা

৩০. **'উন্নতি' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?**
ⓚ উন্নাসিক ⓚ অপকর্ম ⓖ অবনতি ⓖ ঘাটতি

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

ঢাকা বোর্ড–২০২৪

বাংলা দ্বিতীয় পত্র (রচনামূলক প্রশ্ন)

সেট : ০৩ **বিষয় কোড : | 1 | 0 | 2 |**

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। উত্তর প্রাসঙ্গিক ও যথাযথ হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

১। যে-কোনো একটি বিষয়ে অনুচ্ছেদ লেখো : ১০

(ক) বইমেলা

(খ) জাতীয় পতাকা।

২। (ক) মনে করো, তুমি সাদি/সাদিয়া। সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিকারের দাবি জানিয়ে পত্রিকায় প্রকাশের উপযোগী একটি চিঠি লেখো। ১০

অথবা,

(খ) মনে করো, তুমি নিখিল/নীলিমা। এসএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতির কথা জানিয়ে তোমার মায়ের নিকট একখানা চিঠি লেখো।

৩। (ক) সারাংশ লেখো : ১০

অভাব আছে বলিয়া জগৎ বৈচিত্র্যময় হইয়াছে। অভাব না থাকিলে জীব-সৃষ্টি বৃথা হইত। অভাব আছে বলিয়া অভাব-পূরণে এত উদ্যম, এত উদ্যোগ। সংসার অভাবক্ষেত্র বলিয়া কর্মক্ষেত্র। অভাব না থাকিলে সকলেই স্থাণু-স্থবির হইত, মনুষ্যজীবন বিড়ম্বনাময় হইত। মহাজ্ঞানীগণ অপরের অভাব দূর করিতে সর্বদা ব্যস্ত। জগতে অভাব আছে বলিয়াই মানুষ সেবা করিবার সুযোগ পাইয়াছে। সেবা মানবজীবনের পরম ধর্ম। সুতরাং অভাব হইতেই সেবাধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে। আর এ সেবাধর্মের দ্বারাই মানুষের মনুষ্যত্বসুলভ গুণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

অথবা,

(খ) সারমর্ম লেখো :

বসুমতি, কেন তুমি এতই কৃপণা,
কত খোঁড়াখুঁড়ি করি পাই শস্যকণা।
দিতে যদি হয় দে মা, প্রসন্ন সহাস–
কেন এ মাথার ঘাম পায়েতে বহাস?
বিনা চাষে শস্য দিলে কী তাহাতে ক্ষতি?
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কন বসুবতী,
আমার গৌরব তাহে সামান্যই বাড়ে,
তোমার গৌরব তাহে নিতান্তই ছাড়ে।

৪। যে-কোনো একটি ভাব-সম্প্রসারণ করো : ১০

(ক) গ্রন্থগত বিদ্যা আর পরহস্ত ধন,
নহে বিদ্যা নহে ধন হলে প্রয়োজন।

(খ) বই কিনে কেউ দেউলিয়া হয় না।

৫। (ক) মনে করো, তুমি আবিদ/আবিদা। পটুয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের নবীনবরণ অনুষ্ঠান সম্পর্কে সংবাদ প্রতিবেদন রচনা করো। ১০

অথবা,

(খ) মনে করো, তুমি সুজন/শাহিনা। জাতীয় দৈনিক পত্রিকার কুয়াকাটা প্রতিনিধি। সবুজ সৈকত বেষ্টনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ উৎসবের বর্ণনা দিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করো।

৬। যে-কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করো : ২০

(ক) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

(খ) কৃষি উদ্যোক্তা

(গ) মাদকাসক্তি ও এর প্রতিকার।

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	গ	২	ক	৩	গ	৪	ক	৫	খ	৬	খ	৭	গ	৮	ঘ	৯	খ	১০	ক	১১	ঘ	১২	ক	১৩	খ	১৪	গ	১৫	গ
	১৬	ঘ	১৭	ক	১৮	খ	১৯	গ	২০	খ	২১	ঘ	২২	ক	২৩	গ	২৪	গ	২৫	খ	২৬	গ	২৭	খ	২৮	ক	২৯	ঘ	৩০	গ

রচনামূলক

১. ক. বইমেলা হলো লেখক, প্রকাশক ও পাঠকের মিলনমেলা। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা-আন্দোলনে সালাম, বরকত, রফিক, শফিউর প্রমুখ শহিদ হন। তাদের সেই স্মৃতিকে অম্লান রাখতেই ১৯৭২ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি মুক্তধারার প্রকাশক চিত্তরঞ্জন সাহা ঢাকার বর্ধমান হাউজ প্রাঙ্গণে ৩২টি বই সাজিয়ে বইমেলার সূচনা করেন। সেই থেকে প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে আয়োজন করা হয় একুশে বইমেলা এবং এর নামকরণ করা হয় 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় এ মেলা। মাসব্যাপী একুশে বইমেলা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হয় অসংখ্য বই। মেলা প্রাঙ্গণে প্রবেশের প্রধান তোরণটি সাজানো হয় অত্যন্ত চমৎকারভাবে। মেলার ভেতরে বটবৃক্ষের বেদিমূলে তৈরি করা হয় নজরুল মঞ্চ। চারদিকে চক্রাকারে থাকে প্রয়াত জ্ঞানীগুণী মনীষীদের ছবি এবং সাজানো থাকে বিখ্যাত ব্যক্তিদের অমর বাণী। মেলায় প্রবেশ করতেই চোখে পড়ে স্টল এবং স্টলে সাজানো বই। বইমেলায় সাধারণত সৃজনশীল বইয়ের সমাবেশ ঘটে। বিভিন্ন রুচির পাঠক তাদের পছন্দমতো বই সংগ্রহ করে বইমেলা থেকে। শিশু-কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ সবারই রুচিসম্মত বইয়ের সমাবেশ থাকে মেলায়। এছাড়া বইমেলায় অনেক লেখকের সাথে পাঠকদের সাক্ষাৎ ঘটে। বর্তমানকালে বইমেলা বা পুস্তক প্রদর্শনীগুলোর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এবং সাফল্য গ্রন্থ প্রকাশনার জগতে এনেছে অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য। একুশে বইমেলা একদিকে বাঙালির বই কেনা, পাঠাভ্যাস গঠন ও পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের এক মিলনতীর্থ, অপরদিকে এটি বাঙালির সংগ্রামী চেতনা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের এক তাৎপর্যপূর্ণ অনুষঙ্গ।

১. খ. আমাদের জাতীয় পতাকা আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক। এর আকৃতি আয়তক্ষেত্রের মতো। এতে সবুজের মাঝে একটি লাল বৃত্ত রয়েছে। পতাকাটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত হলো ১০ : ৬। ভবনে ব্যবহারের জন্য জাতীয় পতাকার আকার ও আয়তন হলো– ৩০৫ সেমি × ১৮৩ সেমি অর্থাৎ, ১০ ফুট × ৬ ফুট, পতাকার রঙে তাৎপর্যময় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পতাকার সবুজ বর্ণ বাংলাদেশের শ্যামল প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য। এদেশের তারুণ্য, সজীবতা ও সমৃদ্ধির ইঙ্গিত বহন করে। আর লোহিত বর্ণ-সূর্য, নবজাগরণ, বিপ্লবী চেতনা ও সাম্যের ইঙ্গিত বহন করে। সূর্যের কিরণ যেমন সব মানুষ সমানভাবে লাভ করে, সেরূপ সুবর্ণ সূর্যখচিত বাংলাদেশের জাতীয় পতাকাও সব শ্রেণির বাংলাদেশির মধ্যে সমতা বিধান করছে। প্রয়াত শিল্পী কামরুল হাসান এর নকশা তৈরি করেন। এটি বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সময়ে উত্তোলন করা হয়। ১৯৭১-এর ২রা মার্চ সর্বপ্রথম এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে উত্তোলন করা হয়। তখন ঐ পতাকার নকশা কিছুটা ভিন্ন ছিল। বাংলাদেশের মানচিত্রটি তখন পতাকার মাঝখানে ছিল। পরবর্তীকালে জাতীয় পতাকা থেকে বাংলাদেশের মানচিত্র বাদ দেওয়া হয়। আমাদের জাতীয় পতাকা আমাদের পরিচয়বাহী। দেশের সম্মান রক্ষার্থে এটি আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অনুপ্রেরণা জোগায়। লাখ লাখ মানুষের জীবন এবং বহু মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা এ পতাকা অর্জন করেছি। প্রকৃতপক্ষে এটি এক টুকরা কাপড়ের তৈরি হলেও এটি রক্তে নির্মিত আমাদের দেশের স্বাধীনতার প্রতীক। এ পতাকার মর্যাদা ও সম্মান আমরা জীবন দিয়ে রক্ষা করব।

২. ক.

১৩ই মে, ২০২...
বরাবর
সম্পাদক,
দৈনিক সমকাল,
৩৮৭, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।
বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি আপনার পত্রিকায় প্রকাশের আবেদন।
জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত 'দৈনিক সমকাল'-এ চিঠিপত্র কলামে নিম্নলিখিত পত্রটি প্রকাশ করলে বাধিত থাকব।
বিনীত
সাদিয়া
ঘিওর, মানিকগঞ্জ।

সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিকার চাই

'একটি দুর্ঘটনা, সারা জীবনের কান্না'– স্লোগানটি নির্মম বাস্তবতানির্ভর। ইদানীং সড়ক দুর্ঘটনা আমাদের দেশে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই সংঘটিত হচ্ছে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা। প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললে একটি না একটি সড়ক দুর্ঘটনার খবর চোখে পড়ে। এ ধরনের দুর্ঘটনা যেন দিন দিন বেড়েই চলছে, যার ফলে বহু পরিবার সর্বনাশের সম্মুখীন হচ্ছে। কত মা-বাবা তার সন্তান হারিয়েছে। কত সদ্যবিবাহিতাকে বিধবা-জীবন বরণ করতে হচ্ছে। কত পিতাকে যে পুত্রের লাশ বহন করতে হচ্ছে। দিন দিন মানুষের জীবন অনিরাপদ হয়ে পড়ছে। একথা সত্য যে, 'জন্মিলে মরিতে হবে।' কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুকে মেনে নেওয়া যায় না।

সাধারণত আমাদের দেশে সড়ক দুর্ঘটনা কয়েকটি কারণ হলো– ত্রুটিযুক্ত গাড়ি, অনভিজ্ঞ বা মাদকাসক্ত ড্রাইভার, ধারণ ক্ষমতার অধিক মাল বা যাত্রী বহন, ওভারটেকিং বা চালকের দায়িত্বহীনতা, ট্র্যাফিক আইন না মানার প্রবণতা ইত্যাদি। এসব সমস্যা সমাধানে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যেমন– পরিবহণ সংশ্লিষ্ট সবাইকে যানবাহন বিধি ও আইন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া, রাস্তা সংস্কার, ট্র্যাফিক ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মিডিয়াগুলোতে সড়ক দুর্ঘটনা সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রচারের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

আশা করি, উপরিউক্ত কারণগুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করলে সড়ক দুর্ঘটনা অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব হবে।

নিবেদক

সাদিয়া

২. খ.

স্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

১৫ই নভেম্বর, ২০২...

শ্রদ্ধেয় মা,

আমার ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধা গ্রহণ করবেন। আশা করি বাড়ির সকলকে নিয়ে ভালো আছেন। আমাদের পরীক্ষা দরজায় করাঘাত করছে। আমিও পরীক্ষার জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়েছি। ইংরেজি ও গণিতে আমার প্রস্তুতি কিছুটা কম ছিল। আমাদের ইংরেজি ও গণিত শিক্ষকদ্বয়ের সক্রিয় সহযোগিতা ও ঔদার্যে উক্ত বিষয়গুলোতেও আমার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। অতএব আসন্ন পরীক্ষার ব্যাপারে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। বাকি আল্লাহর অনুগ্রহ ও আপনাদের দোয়া।

পরীক্ষায় যেন আমি ভালো ফলাফল করে আপনাদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারি সেজন্য বিশেষভাবে দোয়া করবেন। আমি পুরোপুরি সুস্থ। আশা করি আপনাদের কুশলাদি জানিয়ে পত্র দিবেন।

ইতি

আপনার স্নেহের

নিখিল

[বি. দ্র. পত্রের শেষে ডাকটিকিট সংবলিত খাম ও ঠিকানা ব্যবহার অপরিহার্য]

৩. ক. জীবনে অসম্পূর্ণতা আছে বলেই মানুষ পূর্ণতার খোঁজ করে। অভাব দূর করার জন্যই সে কর্মপ্রচেষ্টায় রত থাকে। আবার কিছু মানুষ অন্যের অভাব পূরণের মধ্য দিয়ে মহান হয়ে ওঠে।

৩. খ. পরিশ্রমের মাঝে যা পাওয়া যায় তার দাম যেমন অনেক, তার গৌরবও বেশি। যে-কোনো উন্নতির মূলে রয়েছে শ্রমবৃদ্ধি, শ্রমসাধনা। আর যা করুণার দান, ভিক্ষার দান, তা গ্রহণ করায় রয়েছে লজ্জা। এর ভেতর কোনো গৌরব নেই।

৪. ক. বিদ্যা ও ধন এ দুটো মানুষের জীবনে খুবই প্রয়োজন। কিন্তু এ বিদ্যা ও ধনের সার্থকতা নির্ভর করে মানুষের প্রয়োজন মেটানোর ওপর। প্রয়োজনের মুহূর্তে কাজে না লাগলে এ দুটোর কোনো মূল্য নেই।

গ্রন্থের সাহায্যে আমরা বিদ্যার্জন তথা জ্ঞানলাভ করে থাকি। কিন্তু অর্জিত বিদ্যার ব্যাবহারিক প্রয়োগ না শিখলে তা অর্থহীন হয়ে যায়। গ্রন্থের মধ্যে বিদ্যা লিখিত আছে। গ্রন্থ সংগ্রহ করে পাঠ করলে তা অর্জন করা যায়। কিন্তু শুধু পুথিগত বিদ্যা কোনো কাজে আসে না। তাকে ব্যাবহারিক জীবনে প্রয়োগ করতে পারলেই সার্থক হয়। পৃথিবীতে প্রচুর ধনসম্পদ রয়েছে। পরিশ্রম করলেই তা উপার্জন করা যায়। পৃথিবীতে বাঁচতে হলে ধনসম্পদের প্রয়োজন হয়। পরিশ্রম করে তা উপার্জন না করলে প্রয়োজনের সময় পাওয়া যায় না। সুদিনে অনেক বন্ধু পাওয়া গেলেও দুর্দিনে কাউকে পাওয়া যায় না। গ্রন্থাগারে প্রচুর গ্রন্থ থাকলেই চলে না। তাদের মধ্যে যেসব জ্ঞানের বিষয় আছে, সেগুলোকে ব্যাবহারিক জীবনে প্রয়োগ করতে না পারলে কোনোই প্রয়োজন মেটে না। নিজের জন্য সঞ্চিত না রেখে ধনসম্পদ পরের হাতে তুলে দিলেও প্রয়োজনের সময় ফিরে পাওয়া যায় না। যে প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিদ্যা ও ধনসম্পদ অর্জন করা হয়, তা যদি যথাসময়ে পাওয়া না যায়, তাহলে তার কোনো মূল্য নেই। যে জ্ঞান কোনো ব্যাবহারিক জীবনে প্রয়োগ করা যায় না, সে জ্ঞান দ্বারা নিজে যেমন উপকৃত হয় না; জগতেরও কোনো কল্যাণ সাধিত হয় না। তাই আমাদের উচিত, অর্জিত বিদ্যাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা এবং জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করা।

ধন মানুষের অতীব প্রয়োজনীয় জিনিস। ধন অর্জন করে কেউ যদি অপরের নিকট রেখে দেয়, তাহলে প্রয়োজনের সময় তা পাওয়া যায় না। তেমনি বিদ্যাও যদি কেবল গ্রন্থের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে তা জীবনের কোনো কাজে লাগে না।

৪. খ. জ্ঞান আহরণ করার আশা নিয়ে মানুষ বই কেনে। আর এই বই কেনার জন্য যে অর্থ-ব্যয় হয়, অর্জিত জ্ঞানের তুলনায় তা খুব নগণ্য।

বই মানুষের জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়ে মনের জগৎকে প্রসারিত করে। কূপমণ্ডূকতা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বিশ শতকের সূচনায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের দার্শনিকগণ বলেছিলেন, 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'। তাঁদের ধারণা অনুযায়ী জ্ঞানের সীমানা বাড়াতে, বুদ্ধিকে বন্ধনহীন করতে, আর মানুষের মুক্তি আনতে বই পড়ার কোনো বিকল্প নেই। সব মানুষই খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, চিকিৎসা ইত্যাদি মৌলিক প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় করে। মৌলিক চাহিদা পূরণের পর অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করার আরও অনেক উপায় আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে ভালো উপায়– বই কেনা। বই কিনে কেউ নিঃস্ব হয় না। কারণ, একটা বইয়ের অর্থমূল্য বেশি নয়। বরং একটি বই কিনতে যে অর্থের প্রয়োজন হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি অর্থ অনেকে অন্যান্য কাজে ব্যয় করে থাকে। ব্যক্তিকে আলোকিত করতে একটি বই যেভাবে ভূমিকা রাখে, তাতে বই কেনার ব্যাপারে কার্পণ্য করা বোকামি। একটা বই অনেক সময়ে মানুষের জীবনকে পর্যন্ত বদলে দিতে পারে।

বই মানুষের প্রকৃত বন্ধু। তাই নিজেকে সমৃদ্ধ করতে বই কেনার ও তা পড়ার কোনো বিকল্প নেই।

৫. ক. ২৫শে জানুয়ারি, ২০২...
বরাবর
প্রধান শিক্ষক,
পটুয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, পটুয়াখালী।
বিষয় : স্কুলে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিয়ে প্রতিবেদন।
সূত্র : প.স.বা. উ. বি, ২০২.../২/(২৮)
মহোদয়,
পটুয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠান সম্পর্কিত প্রতিবেদন তৈরির জন্য আদিষ্ট হয়ে নিচের প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করছি।

গত ২৩শে জানুয়ারি, ২০২... তারিখে পটুয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ এ্যাডভোকেট ইসলাম উদ্দীন খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মনিরুজ্জামান মনির। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবুল আহাদ। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করে স্ব স্ব ধর্মের অনুসারী শিক্ষার্থীরা। তারপর শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ওই অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ও বাংলা বিষয়ের শিক্ষক সরোজ মোস্তফা। এরপর শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে বক্তব্য দেওয়া শুরু হয়। বক্তব্য প্রদান করে বিজ্ঞান বিভাগের নবীন শিক্ষার্থী অপু ও মিতু, মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থী রিফাত ও আবিদ এবং ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের শিক্ষার্থী হাসান ও রফিক। এসময় এক আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। শিক্ষকরা খুব মন দিয়ে নবীন শিক্ষার্থীদের কথা শোনেন। বিশেষ অতিথি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করার পরামর্শ দেন। প্রধান অতিথি শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মানুষ হওয়ার দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করেন। এরপর অতিথিরা স্মারক হিসেবে শিক্ষার্থীদের হাতে ক্রেস্ট ও শুভেচ্ছা উপহার তুলে দেন। স্কুলের মাঠে নবীন শিক্ষার্থীদের মধ্যে নাস্তা পরিবেশন করা হয়।

এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পুরাতন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নবাগত শিক্ষার্থীদের একটি সেতুবন্ধ রচিত হয়। তাছাড়া শিক্ষকদের সঙ্গেও শিক্ষার্থীদের একটি উষ্ণ ভাববিনিময় হয়। ভবিষ্যতে এই স্মৃতিগুলো শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক প্রেরণা জোগাবে।

প্রতিবেদকের নাম ও ঠিকানা	:	আবিদা সুলতানা, মানবিক বিভাগ, দশম শ্রেণি
প্রতিবেদনের শিরোনাম	:	পটুয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠান
প্রতিবেদনের ধরন	:	বিশেষ প্রতিবেদন
প্রতিবেদন রচনার তারিখ ও সময়	:	২৫শে জানুয়ারি, ২০২...; রাত ৯টা।

৫. খ.

শেরপুরে বৃক্ষমেলা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব সংবাদদাতা, শেরপুর, ১৪ই জুলাই, ২০২... : ১০ই জুন থেকে শেরপুরের ফুটবল মাঠে সপ্তাহব্যাপী বৃক্ষমেলা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন স্থান থেকে আসা প্রায় ৬৫টি স্টল মেলায় অংশগ্রহণ করে। স্থানীয়ভাবে মানুষের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে এ মেলা। মেলায় ছিল মানুষের উপচে-পড়া ভিড়। শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণিসহ সব বয়স এবং সব শ্রেণি-পেশার মানুষ এ মেলায় অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন স্টল ঘুরে ঘুরে দেখেন। মেলায় প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা বিক্রি হয়।

মেলা উপলক্ষ্যে প্রতিদিন বিকালবেলা আলোচনা সভা ও সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদ্দীপনামূলক ও গণসংগীতের ব্যবস্থাও ছিল মেলায়। মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উপপরিচালক জনাব আলি ইদ্রীস সুজন। আলোচনায় অংশ নেন শেরপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. ইফতেখারুল আমীন, জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি জামিল হোসেন এবং উপজেলা কৃষি অফিসার মামুন সরোয়ার। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন শেরপুর জেলাপ্রশাসক ইয়াসিন মোল্লা।

বক্তাগণ বলেন যে, আমাদের দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা দরকার। কিন্তু রয়েছে মাত্র ১৬ শতাংশ। দেশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে ৩০ শতাংশ বনভূমি গড়ে তোলার পরিকল্পনা করে সে মোতাবেক অগ্রসর হতে হবে। বক্তাগণ প্রত্যেককে অন্তত তিনটি করে চারাগাছ লাগানোর জন্য আহ্বান জানান। তাহলে আমাদের দেশে অতিরিক্ত প্রায় ৬০ কোটি গাছ লাগানো সম্ভব হবে; যা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। মেলায় সমাপনী দিনে শ্রেষ্ঠ স্টলের পুরস্কার প্রদান করা হয়। শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করে সবুজায়ন নার্সারি।

৬. ক. **ভূমিকা :** বাঙালির আবহমান কালের ইতিহাসে এক মাইলফলক স্বাধীনতা যুদ্ধ। এক মহিমান্বিত ইতিহাস রচিত হয়েছে এই ১৯৭১ সালে। রক্ত, অশ্রু, আর অপরিসীম আত্মত্যাগের ভেতর দিয়ে একাত্তরে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীনতা। আর বীরত্বপূর্ণ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে অভ্যুদয় হয়েছে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের। মুক্তিযুদ্ধ তাই আমাদের জাতীয় জীবনে এক অহংকার, গৌরবের এক মহান বিজয়গাথা।

মুক্তিযুদ্ধের সূচনা : গণ-আন্দোলনের মুখে জেনারেল আইয়ুব খানের পদত্যাগের পর জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৬৯ সালে পুনরায় সামরিক শাসন জারি করেন। তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করেই ঘোষণা করলেন, শীঘ্রই সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে সামরিক বাহিনী ব্যারাকে ফিরে যাবে। ইয়াহিয়া খানের ঘোষণানুযায়ী ১৯৭০ সালের ১৭ই ডিসেম্বরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টিতে এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩৯০টি আসনের মধ্যে ২৯৮টি আসনে জয়ী হয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। নির্বাচনের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে ইয়াহিয়া খান

গড়িমসি শুরু করেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ভুট্টোর পরামর্শে **১৯৭১** সালের তেসরা মার্চ জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনের তারিখ ঘোষণা করেন। ইত্যবসরে জুলফিকার আলী ভুট্টো এসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলাপ-আলোচনা করে পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যান। কিন্তু ইয়াহিয়া খান হঠাৎ পহেলা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন।

অসহযোগ আন্দোলন : ইয়াহিয়া খানের পহেলা মার্চের ঘোষণায় পূর্ব পাকিস্তানের জনতা হতবাক হয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনার জন্য ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক ঐতিহাসিক জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন–

- সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে।
- অবিলম্বে সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে।
- সামরিক বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার করতে হবে।
- জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের পূর্বেই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

এ আহ্বানে সকল অফিস আদালত, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায় এবং স্বাধীনতা আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে।

আলোচনার নামে প্রহসন : **১৫ই** মার্চ ইয়াহিয়া খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকায় এসে **১৬ই** মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে বৈঠকে বসেন। দীর্ঘ দশ দিন পর্যন্ত আলোচনা চলে। এ আলোচনা ছিল প্রহসন মাত্র। এ বৈঠকের আড়ালে তারা কালক্ষেপণ করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ আনতে থাকে।

তীব্র আন্দোলন শুরু ও গণপ্রতিরোধ : আলোচনার নামে এরূপ প্রহসনের বিরুদ্ধে তীব্র গণ-আন্দোলন শুরু হলে সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান এ আন্দোলন চিরতরে স্তব্ধ করার লক্ষ্যে **২৫শে** মার্চ গভীর রাতে জনগণের ওপর সেনাবাহিনী লেলিয়ে দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে পাড়ি জমান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘুমন্ত জনগণের ওপর সেনাবাহিনীর অতর্কিত হামলায় ঢাকা শহর ভয়াল মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়।

স্বাধীনতা ঘোষণা : **১৯৭১** সালের **২৬শে** মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এ ঘোষণার সাথে সাথেই সর্বত্র সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হয়।

অস্থায়ী সরকার গঠন : **১০ই** এপ্রিল পূর্ব বাংলার নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্যরা মুজিবনগরে এক অধিবেশনে মিলিত হয়ে বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র ঘোষণা দেয় এবং **১৭ই** এপ্রিল বহুসংখ্যক দেশি-বিদেশি সাংবাদিক, গণপরিষদ সদস্য ও মুক্তিকামী জনতার উপস্থিতিতে কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরের আম্রকাননে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করে এবং মেহেরপুরকেই মুজিবনগর নাম দিয়ে বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানী ঘোষণা করা হয়।

মুক্তিবাহিনী গঠন ও চূড়ান্ত বিজয় : অস্থায়ী সরকার গঠনের পর মুক্তিবাহিনী গঠিত হয় এবং কর্নেল (অব.) আতাউল গনি ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর সেনাপতি করা হয়। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশকে **১১**টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। এদেশের অগণিত ছাত্র-জনতা, পুলিশ, ইপিআর, আনসার ও সামরিক বেসামরিক লোকদের সমন্বয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করা হয়। তারা পাকবাহিনীর মুখোমুখি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এভাবে দীর্ঘ ৯ মাসের যুদ্ধে পাকবাহিনীর অবস্থা অত্যন্ত নাজুক হয়ে পড়ে। আর কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে হানাদার বাহিনী **১৯৭১** সালের **১৬ই** ডিসেম্বর নিঃশর্তভাবে মিত্রবাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য আত্মসমর্পণ করে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও প্রাপ্তি : পাকিস্তানি শোষকদের শোষণ-বঞ্চনা ও ভেদ-বৈষম্যের অবসান, অর্থনৈতিক মুক্তি, সর্বোপরি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও বাস্তবতা হলো, স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও মুক্তিযুদ্ধের এ চেতনা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এখনো এদেশের মানুষ ঘুমায় পথের ধারে, এখনো মানুষ মরে অনাহারে, এখনো জাতীয় পতাকা পোড়ানো হয়, মসজিদের ইমামকে গুম, হত্যা করা হয়, মন্দিরের জমি-জায়গা দখল করা হয়। এখনো মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়, গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে মানুষ বঞ্চিত হয়। সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও দুঃশাসনের কবলে পড়ে দেশবাসী আজ বড়ো অসহায়। আর এসবই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থি।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন : প্রথমত বাংলাদেশের তরুণ যুবকদের সুসংগঠিত করার মধ্য দিয়ে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বাস্তবায়িত করা যেতে পারে। এরপর জনগণের কাছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে রূপরেখা তুলে ধরতে হবে। শিক্ষা-কার্যক্রমে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটসহ এর নানাবিধ ঘটনা উপস্থাপিত করা যেতে পারে। সমস্ত গণমাধ্যমে এ চেতনা বাস্তবায়নে জনমত তৈরি করতে হবে। শুধু রাষ্ট্রের দিকে চেয়ে এই মহান আদর্শকে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়, বরং সকলকে একসঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর কাদা ছোড়াছুড়ি বন্ধ করে অন্তত এই বিষয়ে একই প্ল্যাটফর্মে সমবেত হতে হবে। আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা এমনকি সমাজকাঠামোতে যে দুর্নীতির রাহুগ্রাস বর্তমান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় তার মূলোৎপাটনে এগিয়ে আসতে হবে। লক্ষ শহিদের রক্তের মর্যাদায়, শত-সহস্র মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে আমাদের পাওয়া মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তাহলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়িত হবে।

আমরা লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে পাওয়া মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করি হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা দিয়ে। প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর বুকে গড়ে উঠুক এক সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিফলিত হয় কবির এ কবিতায়–

‘স্বাধীনতা তুমি
রবি ঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান।
স্বাধীনতা তুমি

কাজী নজরুল ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা।
স্বাধীনতা তুমি
শহিদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা।'

উপসংহার : মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির ইতিহাসে এক সোনালি অধ্যায়। এ অধ্যায় বড়ো উজ্জ্বল, অত্যন্ত বেদনা ও আনন্দের। মুক্তিযুদ্ধ থেকেই বাঙালির সত্তায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনের চেতনা জন্ম নেয়। তবে স্বাধীনতার এতো দিন পরেও সার্বভৌমত্ব রক্ষা, অর্থনৈতিক মুক্তি ও সাংস্কৃতিক মুক্তির জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে। তাই ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের জন্য দলমত জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলকে নতুন করে শপথ নিতে হবে।

৬. খ. ভূমিকা : অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে এবং জনবল কাজে লাগিয়ে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ উপার্জনের প্রত্যাশায় যখন কোনো কাজ করার পরিকল্পনা করে, তখন তাকে উদ্যোগ বলে। যারা এই উদ্যোগ গ্রহণ করে তাদের বলে উদ্যোক্তা। প্রতিটি পেশাকে কেন্দ্র করে উদ্যোক্তা হওয়া সম্ভব। একজন উদ্যোক্তা আত্মনির্ভরশীল হন এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেন। কৃষিকে উদ্যোগ হিসেবে গ্রহণ করার বিষয়টি বাংলাদেশে নতুন। বিপুল জনসংখ্যা, কৃষিজমির পরিমাণ হ্রাস, বেকারত্ব– এ সবকিছুর ভিতরে একদল তরুণ কৃষিকে প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করছেন। শিক্ষিত তরুণদের কৃষিক্ষেত্রে পরিকল্পিত উদ্যোগ ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তা : কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তার মধ্যে পার্থক্য আছে। একজন কৃষক তাঁর পণ্য বাজারে বিক্রির চেয়ে পরিবারের চাহিদা মেটানোকে বেশি গুরুত্ব দেন অথবা কিছুটা বিক্রির জন্য এবং কিছুটা পরিবারের চাহিদা মেটাতে ব্যয় করেন। অন্যদিকে, একজন কৃষি উদ্যোক্তার মূল লক্ষ বাজারজাতকরণ ও মুনাফা তৈরি। তাই একজন কৃষি উদ্যোক্তাকে ব্যাবসায়িক মনোবৃত্তির হতে হয় এবং তার কাজে প্রচুর ঝুঁকি থাকে।

কৃষি উদ্যোগের ক্ষেত্রসমূহ : শস্য, প্রাণীসম্পদসহ কৃষি ও কৃষিসংশ্লিষ্ট যে-কোনো বিষয়কে কৃষি উদ্যোগের আওতায় আনা সম্ভব। তবে এক্ষেত্রে উদ্যোক্তাকে অবশ্যই মূলধন, জমির পরিমাণ, মাটির গুণাগুণ, অবকাঠামো, বালাই ব্যবস্থাপনা, লোকবল, পরিবহণ ব্যবস্থা, বাজার ও চাহিদা উৎপাদিত পণ্যের সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করতে হয়। ধান, গম, ডাল, আখ, পাট, ঘাস, শাকসবজি, ফুল, ফল, মসলা, মধু, মাশরুম, রেশম, মাছ প্রভৃতির চাষ ও উৎপাদন; গরু–ছাগল, হাঁস-মুরগি প্রভৃতি প্রাণীসম্পদের লালন-পালন; গাছের চারা, জৈব সার, বায়োগ্যাস, দুধ ও দুধজাত পণ্যের উৎপাদন ও বিপণন ইত্যাদি কৃষি উদ্যোগের আওতাভুক্ত।

কৃষি উদ্যোক্তার করণীয় : একজন কৃষি উদ্যোক্তাকে নিম্নোক্ত করণীয় সম্বন্ধে অবগত থাকা উচিত :

ক. উদ্যোক্তাকে প্রথমেই তার পণ্যের বাজার সম্বন্ধে ভালো ধারণা রাখতে হবে।

খ. প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করে অপচয় ও ব্যয় হ্রাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

গ. একজন কৃষি উদ্যোক্তাকে উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন হতে হয়। কারন, তাঁর এই উদ্ভাবনী বুদ্ধি প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে সাহায্য করবে।

ঘ. কৃষিখাতে উদ্যোক্তাকে অনেক রকমের ঝুঁকি নিতে হয়। এসব ক্ষেত্রে লাভ-ক্ষতি বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ঝুঁকি নিতে হবে এবং ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার সম্ভাব্য প্রস্তুতি রাখতে হবে।

ঙ. উদ্যোক্তা যে ক্ষেত্র নিয়ে কাজ করবেন, সে বিষয়ে যাবতীয় তথ্যের নিয়মিত খোঁজ-খবর রাখা জরুরি। উপযুক্ত খাবার, সার, কীটনাশক, আধুনিক যন্ত্রপাতিসহ প্রযুক্তি সম্বন্ধে ধারণা থাকা দরকার। সম্প্রতি স্মার্টফোন ও ইন্টারনেটের ব্যবহার উদ্যোক্তাদের সাফল্যে ভূমিকা রাখছে।

চ. একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে কয়েকজন উদ্যোক্তা একসঙ্গে কাজ করতে পারেন। এতো বড়ো ধরনের কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হয় এবং ঝুঁকি হ্রাস পায়। তবে অবশ্যই সতর্কতার সঙ্গে অংশীদার নির্বাচন করা উচিত।

ছ. পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ, শ্রমিক ও পণ্য পরিবহণ, বাজার পরিস্থিতি ও প্রতিযোগীদের কথা চিন্তা করে কাজে অগ্রসর হলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

কৃষি উদ্যোক্তাদের জন্য বাংলাদেশ সরকারের কয়েকটি উদ্যোগ : কৃষির উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন :

ক. সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকগুলো কৃষির ধরন অনুযায়ী স্বল্প সুদে বিভিন্ন অঙ্কের ঋণ প্রদান করছে।

খ. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও মৎস্যসম্পদ অধিদপ্তর উদ্যোক্তাদের যে-কোনো প্রয়োজনে পরামর্শ দিয়ে থাকে।

গ. বছরব্যাপী চাষ করার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে 'ডিজিটাল শস্য ক্যালেন্ডার' ও 'বালাইনাশক নির্দেশিকা' দেওয়া আছে, যা ঠিক সময়ে ঠিক ফসল ফলাতে সাহায্য করে। **১৬১২৩** নম্বরে ফোন করে কৃষি সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কৃষি প্রযুক্তি সম্বন্ধে জানাতে 'কৃষি প্রযুক্তি ভান্ডার' নামে একটি মোবাইল অ্যাপ তৈরি করেছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কৃষিদ্রব্যাদির বাজারদর, কৃষকপ্রাপ্ত বাজারদর, সাপ্তহিক ও পাক্ষিক ভিত্তিতে প্রেরণ করে।

উপসংহার : একজন কৃষি উদ্যোক্তা সফল হলে একদিকে যেমন দারিদ্র্য দূরীভূত হয়, অন্যদিকে জাতীয় অর্থনীতি শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা পায়। তবে কৃষি উদ্যোক্তাকে অবশ্যই সততার সঙ্গে কাজ করা উচিত। কারণ তাঁর পণ্য চূড়ান্ত বিচারে খাবারের চাহিদা মেটাবে।

৬. গ. ভূমিকা : মাদকাসক্তি আমাদের সমাজের ভয়াবহ একটি সমস্যা। কিছু পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে একজন মানুষ নিজেকে মাদকের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে। আমাদের দেশের তরুণদের মধ্যে মাদক গ্রহণের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। একটি জাতির উন্নয়নের ধারাকে গতিশীল করে তরুণসমাজ। কিন্তু মাদক তরুণসমাজের সেই অদম্য কর্মপ্রেরণাকে ধ্বংস করে দেয়। ফলে সে নিজেকে যেমন ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়, তেমনি দেশকেও মহাবিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দেয়। তাই এর প্রতিকার করা অত্যাবশ্যক।

মাদকের আবির্ভাব বা উৎস : নেশার ইতিহাস বেশ প্রাচীন। মদ, গাঁজা, আফিম, চরস বা তামাকের কথা বহু অগে থেকেই মানবসমাজে প্রচলিত ছিল। উনিশ শতকের মধ্যভাগে বেদনানাশক ওষুধ হিসেবে মাদকের ব্যবহার শুরু হয়, যাকে ইংরেজিতে ড্রাগ বলা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সৈনিকদের ব্যথার উপশম হিসেবে ড্রাগের ব্যবহার হলেও পরে হতাশা কাটাতেও তারা ড্রাগ ব্যবহার করতো। এরপর থেকেই কলম্বিয়া, বলিভিয়া, ব্রাজিল, ইকুয়েডর ইত্যাদি দেশে নেশার দ্রব্য হিসেবে ব্যাপকভাবে ড্রাগের ব্যবহার শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীব্যাপী।

মাদকদ্রব্যের প্রকারভেদ : সমাজে নানা ধরনের মাদকদ্রব্যের উদ্ভাবন ও ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন– হেরোইন, প্যাথেড্রিন, এলএসডি, মারিজুয়ানা, কোকেন, হাসিস প্রভৃতি আধুনিককালের মাদকদ্রব্য; তবে এর মধ্যে হেরোইন ও কোকেন বেশ দামি। আমাদের দেশের যুবসমাজ সচরাচর যে মাদকদ্রব্যগুলো ব্যবহার করে সেগুলো হলো– সিডাকসিন, ইনকটিন, প্যাথেড্রিন, ফেনসিডিল, ডেক্সপোটেন, গাঁজা ইত্যাদি। তবে এ সবকিছুর ব্যবহারকে ছাড়িয়ে গেছে অত্যাধুনিক এক মাদক যার নাম ইয়াবা।

মাদকদ্রব্যের ব্যবহার : দেশে মাদকের ব্যবহার বহু বিচিত্র। মানুষ নিজেকে অপ্রকৃতিস্থ করতে মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে। মাদকের ব্যবহার করে সে কল্পনার জগতে বিচরণ করে। এক্ষেত্রে মাদক ব্যবহারকারীরা নানা ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করে। যেমন– ধূমপান, ইনহেল বা শ্বাসের মাধ্যমে, জিহ্বার নিচে গ্রহণের মাধ্যমে, সরাসরি সেবনের মাধ্যমে, স্কিন পপিং ও মেইন লাইনিংয়ের মাধ্যমে। তবে যেভাবেই গ্রহণ করুন না কেন তাদের উদ্দেশ্য একটাই। আর তা হলো নেশায় উন্মত্ত হওয়া। প্রথমে কৌতূহলের বশে অনেকেই নেশাদ্রব্য গ্রহণ করে। কিন্তু ধীরে ধীরে তাতে অভ্যস্ত হয়ে ভয়াবহ এক সর্বনাশের পথে এগিয়ে যায় তারা।

মাদকাসক্তির কারণ : এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, মাদকাসক্তির অন্যতম কারণ ব্যক্তিজীবনের হতাশা। মানুষ যখন জীবন সম্পর্কে অনেক বেশি হতাশ হয়ে পড়ে, তখন সে মাদকদ্রব্যের আশ্রয় নেয়। হতাশাগ্রস্ত সাধারণ তরুণদের মধ্যে মাদক গ্রহণের হারও অনেক বেশি। তাছাড়া অসৎ সঙ্গে লিপ্ত হয়েও অনেকেই মাদকের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। যেসব পরিবারে পারিবারিক অশান্তি অনেক বেশি, সে পরিবারের ছেলেমেয়েদের জীবন বিশৃঙ্খল হতে থাকে। তারা এই বিশৃঙ্খলা থেকে ধীরে ধীরে মাদকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আমরা প্রতিদিনের পত্রপত্রিকায় এ ধরনের অনেক ঘটনাই লক্ষ করি। বেশির ভাগ মাদকসেবী দেখা যায় যারা বন্ধুবান্ধব বা সহপাঠীর সংস্পর্শে মাদকে আসক্ত হয়, তবে পারিবারিক অশান্তিই মাদকাসক্তির বিশেষ কারণ হিসেবে দেখা যায়।

মাদক চোরাচালান : সাধারণত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মাদক চোরাচালান হয়। সীমান্তে স্থল বা জলপথে এবং আকাশপথে বিশ্বব্যাপী এক বৃহৎ মাদক চোরাচালান নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে যার পেছনে রয়েছে বিরাট এক সিন্ডিকেট। কিছুকাল আগেও মায়ানমার, থাইল্যান্ড ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম নিয়ে গড়ে ওঠে আন্তর্জাতিক মাদক চোরাচালানের 'স্বর্গভূমি'। তবে ভিয়েতনামে সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে এই নেটওয়ার্ক ভেঙে যায়। এর কিছুদিন পরেই চোরাচালানকারীরা ইরান, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান নিয়ে গড়ে তোলে ড্রাগ পাচারের নতুন ভিত্তিভূমি, যার নাম 'গোল্ডেন ক্রিসেন্ট'।

বাংলাদেশে মাদকের আগ্রাসন : বাংলাদেশে মাদকের ব্যবহার আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অবৈধভাবে দেশে প্রবেশ করা এই মাদক আমাদের যুবসমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। মায়ানমার থেকে অবাধে এদেশে প্রবেশ করছে ইয়াবা, যাতে আসক্ত হয়ে পড়ছে বহু তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতি। দর্শনার 'কেরু এন্ড কোম্পানি' এদেশের একমাত্র লাইসেন্সধারী মদ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান; কিন্তু তার বাইরে বহু বিদেশি কোম্পানির মদ অবৈধভাবে অবাধে বাজারে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া গাঁজা ও আফিমের মতো মাদকদ্রব্যও অবাধে ক্রয়-বিক্রয় করা হচ্ছে।

মাদকাসক্তির ভয়াবহতা : মাদকাসক্তিকে অপ্রতিরোধ্য রোগ এইডসের সঙ্গে তুলনা করা যায়। মাদকাসক্তি মানুষকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। ইয়াবা ও হেরোইনের মতো মাদকদ্রব্য মানুষের শরীরের সমস্ত রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। এর আসক্তিতে মানুষ এক অস্বাভাবিক জীবনযাপন করে। নেশায় আক্রান্ত ব্যক্তির সুস্থ জীবনে ফিরে আসাও খুব সহজ হয় না। শরীরে মাদক গ্রহণ বন্ধ করা মাত্রই 'উইথড্রয়াল সিমটম' শুরু হয়। তখন মাদক না পেলে শুরু হয় টার্কি পিরিয়ড; হাত পা কাঁপতে থাকে; অসম্ভব শারীরিক যন্ত্রণা শুরু হয় এবং একপর্যায়ে তা হৃৎপিণ্ডে আঘাত করে। তখন সুচিকিৎসা না পেলে খুব অল্প সময়ে মাদকাসক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

মাদকাসক্তি প্রতিরোধ : বিশ্বজুড়ে যে মাদকবিষ ছড়িয়ে পড়ছে তার থাবা থেকে মানুষকে বাঁচাতে হবে। এ নিয়ে বিশেষজ্ঞরা ভাবছেন। সমাজসেবীরা উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। দেশে দেশে নানা সংস্থা ও সংগঠন মাদকবিরোধী আন্দোলন শুরু করেছে। আমাদের দেশেও মাদকবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছে। বেতার, টিভি, সংবাদপত্র ইত্যাদি গণমাধ্যম মাদকবিরোধী জনমত গঠনে সক্রিয় হয়েছে। মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়েছে। এসব তৎপরতার লক্ষ্য হচ্ছে :

১. মাদকাসক্তদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ভেষজ ও মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ,
২. সুস্থ বিনোদনমূলক কার্যক্রমের সঙ্গে তরুণদের সম্পৃক্ত করে নেশার হাতছানি থেকে তাদের দূরে রাখা,
৩. ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে মাদকাসক্তির মর্মান্তিক পরিণতি সম্পর্কে সকলকে সচেতন করা,
৪. মাদক ব্যবসা ও চোরাচালানের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলা,
৫. বেকার যুবকদের জন্যে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

উপসংহার : মাদকাসক্তি একটি সামাজিক সমস্যা। এ সমস্যায় তরুণরাই বেশি আসক্ত। একটি দেশের গতিশীলতাকে অব্যাহত রাখে তরুণসমাজ। তারাই যদি মাদকের কবলে পড়ে নিজেদের জীবনকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়, তবে দেশের সার্বিক অগ্রগতি চরমভাবে বিনষ্ট হবে। তাই তরুণসমাজকে মাদক সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং এর কারবারিদের সর্বাগ্রে বয়কট করতে হবে। আমাদের প্রত্যাশা বাংলাদেশ মাদকমুক্ত হয়ে সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হোক।

রাজশাহী বোর্ড–২০২৪

সেট : ক

বাংলা দ্বিতীয় পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 1 0 2

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময় : ৩০ মিনিট — পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি কালো কালির বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. বাংলা ভাষার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে কোনটির?
ক সংস্কৃত খ অহমিয়া
গ ওড়িয়া ঘ মৈথিলি

২. বাগ্‌যন্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে সচল ও সক্রিয় প্রত্যঙ্গ কোনটি?
ক ওষ্ঠ খ মূর্ধা গ জিভ ঘ তালু

৩. পার্শ্বিক ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ কোনটি?
ক ব খ ড় গ হ ঘ ল

৪. যেসব শব্দাংশ পদের সঙ্গে যুক্ত হলে বক্তব্য জোরালো হয় তাকে কী বলে?
ক নির্দেশক খ বলক
গ বিভক্তি ঘ বচন

৫. 'নিমখুন' শব্দের 'নিম' উপসর্গ কী অর্থে ব্যবহৃত হয়?
ক প্রায় খ তুল্য
গ অর্ধেক ঘ অল্প

৬. 'ভাব' অর্থে প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে কোন শব্দে?
ক বাঘা খ জ্যাঠামি
গ কানাই ঘ বাহাদুরি

৭. উপমিত কর্মধারয় সমাস কোনটি?
ক মনমাঝি খ চন্দ্রমুখ
গ ঘরজামাই ঘ কাজলকালো

৮. নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধির উদাহরণ কোনটি?
ক একাদশ খ গবাক্ষ
গ কুলটা ঘ নাবিক

৯. বিবৃত স্বরধ্বনি কোনটি?
ক এ খ ও
গ অ ঘ আ

১০. ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্বের উদাহরণ কোনটি?
ক চুপচাপ খ ঝমঝম
গ ঝিকিমিকি ঘ সুরে সুরে

১১. নিত্য নারীবাচক শব্দের উদাহরণ কোনটি?
ক সুন্দরী খ বেগম
গ বিধবা ঘ শিক্ষিত

১২. 'চশমা' কোন ভাষার শব্দ?
ক তুর্কি খ আরবি
গ ফারসি ঘ পর্তুগিজ

১৩. বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি?
ক সাত খ এগারো
গ ত্রিশ ঘ সাঁইত্রিশ

১৪. 'প্রাচী' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?
ক প্রতীচী খ প্রতীচ্য
গ প্রাচ্য ঘ পাশ্চাত্য

১৫. 'হাতি' শব্দের সঠিক প্রতিশব্দ কোনটি?
ক কর খ হয় গ দ্বিপ ঘ মার্তণ্ড

১৬. 'ঠোঁট কাটা' বাগ্‌ধারাটি অর্থ কী?
ক নির্লজ্জ খ সংকীর্ণমনা
গ কাণ্ডজ্ঞানহীন ঘ বেহায়া

১৭. বাক্যের মধ্যকার একাধিক পদকে সংযুক্ত করতে কোন যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হয়?
ক ড্যাশ খ হাইফেন
গ কোলন ঘ সেমিকোলন

১৮. কর্মবাচ্যের উদাহরণ কোনটি?
ক চিঠিটা পড়া হয়েছে। খ শরতে শিউলি ফোটে।
গ আমার যাওয়া হলো না। ঘ এবার বাঁশিটি বাজাও।

১৯. অর্থের সংগতি রাখার জন্য বাক্যে ব্যবহৃত কোন পদের পরিবর্তন প্রয়োজন?
ক বিশেষ্য খ বিশেষণ
গ সর্বনাম ঘ অব্যয়

২০. 'রাজীব বাংলা ব্যাকরণে ভালো'–বাক্যে 'ব্যাকরণে' কোন কারক?
ক কর্তা খ কর্ম
গ করণ ঘ অধিকরণ

২১. গঠন-বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাংলা বাক্যকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
ক দুই খ তিন
গ চার ঘ পাঁচ

২২. বিধেয় ক্রিয়ার বিশেষ্য অংশকে কী বলে?
ক বর্গ খ পূরক
গ প্রসারক ঘ উদ্দেশ্য

২৩. 'সে লিখছে আর হাসছে।'–বাক্যে 'লিখছে আর হাসছে' কোন বর্গ?
ক বিশেষ্যবর্গ খ বিশেষণবর্গ
গ ক্রিয়াবর্গ ঘ ক্রিয়াবিশেষণ-বর্গ

২৪. ক্রিয়া-বিশেষ্যের উদাহরণ কোনটি?
ক ভোজন খ ধৈর্য
গ মিছিল ঘ দয়া

২৫. সাপেক্ষ সর্বনামের উদাহরণ কোনটি?
ক এরা খ পরস্পর
গ যে-সে ঘ নিজেরা নিজেরা

২৬. 'বিধেয় বিশেষণ' রয়েছে কোন বাক্যে?
ক খুব ভালো খরব। খ আধা কেজি চাল।
গ এই পুকুরের পানি ঘোলা। ঘ গাড়িটা বেশ জোরে চলছে।

২৭. যৌগিক ক্রিয়ার উদাহরণ কোনটি?
ক লজ্জা পাওয়া খ হেসে ওঠা
গ সাঁতারকাটা ঘ কথা দেওয়া

২৮. পদাণু ক্রিয়াবিশেষণ রয়েছে কোন বাক্যে?
ক টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। খ যথাসময়ে সে হাজির হয়।
গ তিনি বেড়াতে যাননি। ঘ মরি তো মরব।

২৯. কোনোকিছুর সামান্য অংশ বা অল্প পরিমাণ বোঝাতে কোন নির্দেশক ব্যবহৃত হয়?
ক -টা খ -খানা
গ -খানি ঘ -টুকু

৩০. 'সকলের মঙ্গল হোক।'–বাক্যটি বর্তমান কালের কোন রূপ?
ক সাধারণ বর্তমান খ ঘটমান বর্তমান
গ পুরাঘটিত বর্তমান ঘ অনুজ্ঞা বর্তমান

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

রাজশাহী বোর্ড–২০২৪

বাংলা দ্বিতীয় পত্র (রচনামূলক প্রশ্ন)

সেট : ০৩ **বিষয় কোড : | 1 | 0 | 2 |**

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। উত্তর প্রাসঙ্গিক ও যথাযথ হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

১। যে-কোনো একটি বিষয়ে অনুচ্ছেদ লেখো : ১০

(ক) বইমেলা

(খ) স্বাধীনতা দিবস।

২। (ক) মনে করো, তুমি জিতু/জিম। তোমার বন্ধু রফিককে নিয়মিত পাঠাগারে বই পড়ার উপকারিতা বর্ণনা করে একটি পত্র লেখো। ১০

অথবা,

(খ) মনে করো, তুমি তুহিন। মহাসড়কের পাশে তোমার বাড়ি। সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিকারের দাবি জানিয়ে যে-কোনো জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি পত্র লেখো।

৩। (ক) সারাংশ লেখো : ১০

অভ্যাস ভয়ানক জিনিস– একে হঠাৎ স্বভাব থেকে তুলে ফেলা কঠিন; মানুষ হবার সাধনাতেও তোমাকে ধীর ও সহিষ্ণু হতে হবে। সত্যবাদী হতে চাও? তাহলে ঠিক করো সপ্তাহে অন্তত একদিন তুমি মিথ্যা বলবে না। ছয় মাস ধরে এমনি করে নিজে সত্য কথা বলতে অভ্যাস করো। তারপর এক শুভ দিনে আর একবার প্রতিজ্ঞা করো, সপ্তাহে তুমি দুই দিন মিথ্যা বলবে না। এক বছর পরে দেখবে সত্য কথা বলা তোমার কাছে অনেকটা সহজ হয়ে পড়েছে। সাধনা করতে করতে এমন একদিন আসবে তখন ইচ্ছা করলেও মিথ্যা বলতে পারবে না। নিজেকে মানুষ করার চেষ্টায় পাপ ও প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রামে তুমি হঠাৎ জয়ী হতে কখনো ইচ্ছা কোরো না। তাহলে সব পণ্ড হবে।

অথবা,

(খ) সারমর্ম লেখো :

এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান;
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে
চলে যেতে হবে আমাদের।
চলে যাব– তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি–
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

৪। যে-কোনো একটি ভাব-সম্প্রসারণ করো : ১০

(ক) প্রাণ থাকলেই প্রাণী হয়, কিন্তু মন না থাকলে মানুষ হয় না।

(খ) দুর্জন বিদ্বান হইলেও পরিত্যাজ্য।

৫। যে-কোনো একটি বিষয়ে প্রতিবেদন রচনা করো :

(ক) মনে করো, তুমি কবিতা/কবির। তুমি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার একজন স্থানীয় প্রতিনিধি। বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ উপযোগী একটি প্রতিবেদন রচনা করো। ১০

(খ) মনে করো, তুমি শাকিল/শাকিলা। তুমি উত্তর পলাশবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী। তোমার বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'নবীনবরণ' অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিয়ে যে-কোনো জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের উপযোগী একটি প্রতিবেদন তৈরি করো।

৬। যে-কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করো : ২০

(ক) সময়ানুবর্তিতা

(খ) কৃষিকাজে বিজ্ঞান

(গ) মাদকাসক্তি ও এর প্রতিকার।

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	ক	২	গ	৩	ঘ	৪	খ	৫	ক	৬	ঘ	৭	খ	৮	ক	৯	ঘ	১০	খ	১১	গ	১২	গ	১৩	ক	১৪	ক	১৫	গ
	১৬	ঘ	১৭	খ	১৮	ক	১৯	গ	২০	ঘ	২১	খ	২২	খ	২৩	গ	২৪	ক	২৫	গ	২৬	গ	২৭	খ	২৮	ঘ	২৯	ঘ	৩০	ঘ

রচনামূলক

১. ক. বইমেলা হলো লেখক, প্রকাশক ও পাঠকের মিলনমেলা। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা-আন্দোলনে সালাম, বরকত, রফিক, শফিউর প্রমুখ শহিদ হন। তাদের সেই স্মৃতিকে অম্লান রাখতেই ১৯৭২ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি মুক্তধারার প্রকাশক চিত্তরঞ্জন সাহা ঢাকার বর্ধমান হাউজ প্রাঙ্গণে ৩২টি বই সাজিয়ে বইমেলার সূচনা করেন। সেই থেকে প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে আয়োজন করা হয় একুশে বইমেলা এবং এর নামকরণ করা হয় 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় এ মেলা। মাসব্যাপী একুশে বইমেলা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হয় অসংখ্য বই। মেলা প্রাঙ্গণে প্রবেশের প্রধান তোরণটি সাজানো হয় অত্যন্ত চমৎকারভাবে। মেলার ভেতরে বটবৃক্ষের বেদিমূলে তৈরি করা হয় নজরুল মঞ্চ। চারদিকে চক্রাকারে থাকে প্রয়াত জ্ঞানীগুণী মনীষীদের ছবি এবং সাজানো থাকে বিখ্যাত ব্যক্তিদের অমর বাণী। মেলায় প্রবেশ করতেই চোখে পড়ে স্টল এবং স্টলে সাজানো বই। বইমেলায় সাধারণত সৃজনশীল বইয়ের সমাবেশ ঘটে। বিভিন্ন রুচির পাঠক তাদের পছন্দমতো বই সংগ্রহ করে বইমেলা থেকে। শিশু-কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ সবারই রুচিসম্মত বইয়ের সমাবেশ থাকে মেলায়। এছাড়া বইমেলায় অনেক লেখকের সাথে পাঠকদের সাক্ষাৎ ঘটে। বর্তমানকালে বইমেলা বা পুস্তক প্রদর্শনীগুলোর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এবং সাফল্য গ্রন্থ প্রকাশনার জগতে এনেছে অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য। একুশে বইমেলা একদিকে বাঙালির বই কেনা, পাঠাভ্যাস গঠন ও পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের এক মিলনতীর্থ, অপরদিকে এটি বাঙালির সংগ্রামী চেতনা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের এক তাৎপর্যপূর্ণ অনুষঙ্গ।

১. খ. ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস। এটা আমাদের জাতীয় জীবনে একটি স্মরণীয় ও ঐতিহাসিক দিন। বাঙালি জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা ১৯৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রাম। ৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ জয়লাভ সত্ত্বেও স্বৈরাচার পাকিস্তান সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় এদেশের জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অন্যদিকে পাক-সরকার জনগণের রায়কে উপেক্ষা করে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতের অন্ধকারে পাকহানাদার বাহিনী কামান, গুলি, ট্যাংক নিয়ে ঘুমন্ত, নিরস্ত্র, নিরীহ বাঙালির ওপর আক্রমণ চালায়। এরই প্রেক্ষিতে ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। দীর্ঘ নয় মাস রক্তাক্ত যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ত্রিশ লক্ষ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। ১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। তারপর থেকে প্রতিবছর এ দিনটি যথাযথ মর্যাদার সাথে পালিত হয়ে আসছে। দিবসটি উদ্‌যাপনের জন্য বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সব ভবনে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ওড়ানো হয়। ভোরবেলা গণজমায়েত হয় বিভিন্ন প্রাঙ্গণে, শহিদদের আত্মার শান্তি কামনা করে প্রার্থনা করা হয়, জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং রেডিও-টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। এভাবে সমগ্র দেশে রাষ্ট্রীয় মর্যাদার সাথে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। আমাদের জাতীয় জীবনে দিবসটি অত্যন্ত গৌরবের ও মর্যাদার।

২. ক.

১০ই জানুয়ারি, ২০২...
মতিহার, রাজশাহী।

প্রিয় রফিক,

প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিয়ো। আশা করি ভালো আছো। আমিও ভালো আছি ইনশাআল্লাহ। আজ আমি তোমাকে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে পত্র লিখতে বসেছি। আর সেটি হলো পাঠাগারে বই পড়ার উপকারিতা।

পাঠাগারে বই পড়ার উপকারিতা অত্যন্ত অপরিসীম। কারণ পাঠাগারে বিভিন্ন ধরনের বই থাকে। আর বই হলো জ্ঞানের আলোকবর্তিকা। জ্ঞানের আলোতে আলোকিত হওয়ার জন্য বই পড়ার কোনো বিকল্প নেই। বই পড়ার মাধ্যমে মানুষের মেধা ও মননশীলতার সুষ্ঠু বিকাশ সাধিত হয়। এমনকি বই পড়ার মাধ্যমে স্বশিক্ষিত হওয়া যায়। পাঠাগারে বই পড়ে আমরা যতটা সহজে জ্ঞানার্জন করতে পারি তা অন্য কোনোভাবে সম্ভব নয়। এজন্য আমি নিয়মিত পাঠাগারে গিয়ে বই পড়া শুরু করেছি। তুমিও আর দেরি না করে পাঠাগারে বই পড়া শুরু করে দাও। পাঠাগারে বই পড়ার মাধ্যমে তোমার সৃজনশীল মেধা বিকশিত হোক এ প্রত্যাশাই কামনা করছি।

তোমার বাবা-মাসহ পরিবারের সবাইকে আমার সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মতো এখানেই পত্রের সমাপ্তি টানছি।

ইতি
তোমার বন্ধু
জিতু

[বি. দ্র. পত্রের শেষে ডাকটিকিট সংবলিত খাম ও ঠিকানা ব্যবহার অপরিহার্য]

২. খ. ১৩ই মে, ২০২...

বরাবর

সম্পাদক,

দৈনিক সমকাল,

৩৮৭, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।

বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি আপনার পত্রিকায় প্রকাশের আবেদন।

জনাব,

আপনার বহুল প্রচারিত 'দৈনিক সমকাল'-এ চিঠিপত্র কলামে নিম্নলিখিত পত্রটি প্রকাশ করলে বাধিত থাকব।

বিনীত

তুহিন

ঘিওর, মানিকগঞ্জ।

সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিকার চাই

'একটি দুর্ঘটনা, সারা জীবনের কান্না'– স্লোগানটি নির্মম বাস্তবতানির্ভর। ইদানীং সড়ক দুর্ঘটনা আমাদের দেশে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই সংঘটিত হচ্ছে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা। প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললে একটি না একটি সড়ক দুর্ঘটনার খবর চোখে পড়ে। এ ধরনের দুর্ঘটনা যেন দিন দিন বেড়েই চলছে, যার ফলে বহু পরিবার সর্বনাশের সম্মুখীন হচ্ছে। কত মা-বাবা তার সন্তান হারিয়েছে। কত সদ্যবিবাহিতাকে বিধবা-জীবন বরণ করতে হচ্ছে। কত পিতাকে যে পুত্রের লাশ বহন করতে হচ্ছে। দিন দিন মানুষের জীবন অনিরাপদ হয়ে পড়ছে। একথা সত্য যে, 'জন্মিলে মরিতে হবে।' কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুকে মেনে নেওয়া যায় না।

সাধারণত আমাদের দেশে সড়ক দুর্ঘটনা কয়েকটি কারণ হলো– ত্রুটিযুক্ত গাড়ি, অনভিজ্ঞ বা মাদকাসক্ত ড্রাইভার, ধারণ ক্ষমতার অধিক মাল বা যাত্রী বহন, ওভারটেকিং বা চালকের দায়িত্বহীনতা, ট্র্যাফিক আইন না মানার প্রবণতা ইত্যাদি। এসব সমস্যা সমাধানে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যেমন– পরিবহণ সংশ্লিষ্ট সবাইকে যানবাহন বিধি ও আইন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া, রাস্তা সংস্কার, ট্র্যাফিক ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মিডিয়াগুলোতে সড়ক দুর্ঘটনা সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রচারের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

আশা করি, উপরিউক্ত কারণগুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করলে সড়ক দুর্ঘটনা অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব হবে।

নিবেদক

তুহিন

৩. ক. অভ্যাসের দাস না হয়ে ধীরতা ও সহিষ্ণুতার সাধনায় ব্রতী হওয়া উচিত। এটাই মনুষ্যত্ব অর্জনের পথ। মিথ্যা বলার প্রবণতা দূর করে সত্য বলার অভ্যাস গঠনের জন্য চাই সাধনা। সাধনার মাধ্যমেই মানুষ পাপ ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সফল হতে পারে।

৩. খ. এ পৃথিবীর সব পুরাতন জঞ্জাল আর জীর্ণতা দূর করে নতুন আগন্তুককে স্থান করে দিতে হবে। তাদের জন্য বিশ্বকে বসবাসের উপযোগী করে দিতে হবে। অতীতের সব ব্যর্থতা ও ধ্বংসস্তূপ পেছনে ফেলে গড়তে হবে অনাগত সুন্দর দিনগুলো।

৪. ক. যার বিবেক ও বুদ্ধি আছে সে-ই মানুষ, পশুদের তা নেই। মানুষ নামের যোগ্য হতে হলে তাকে হতে হবে উদার মনের অধিকারী।

আল্লাহ তায়ালার অপূর্ব সৃষ্টি এ পৃথিবী। অতি যত্নে, মমতায় তিনি সৃষ্টি করেছেন এ বিশ্ব। এ সৃষ্টি বৈচিত্র্যে তার নৈপুণ্যের অন্ত নেই। বিশ্বজগতে যাদের প্রাণ আছে তারাই প্রাণী নামে বিবেচিত। জন্মের দিক দিয়ে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। জন্মের প্রাথমিক স্তরে অন্যান্য প্রাণীর মতোই তার বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে প্রাকৃতিক নিয়মে। এ বৃদ্ধি ও বিকাশ লাভের জন্য মানুষকে কোনো চেষ্টা যত্ন, সাধনা বা ত্যাগ স্বীকার করতে হয় না। কিন্তু মানুষের মধ্যকার মন নামক বিশেষ সত্তাটির জন্যই তাকে অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করতে হয়। মানুষ ছাড়া অন্য জীবের মধ্যে যা নেই তা হচ্ছে মনের অনুভূতি। এ অনুভূতি উদ্ভূত মানবিক চেতনা। এ মানবিক চেতনা অন্য প্রাণীর না থাকায় মানুষের যে মহৎ গুণাবলি অর্জনের সুযোগ ঘটে তা অন্য প্রাণীর পক্ষে সম্ভব হয় না। মানুষ তার মন দিয়ে সাধনা করে জীবনের বিচিত্র বিকাশ ঘটায়। মনের কার্যকলাপ থেকে সভ্যতা সংস্কৃতি, জ্ঞান বিজ্ঞানের ঘটেছে বিকাশ। মানুষের যা কিছু গুণাবলি তার ভিত্তি তার মন। মনের দ্বারাই সে ভালোমন্দ, দোষ, গুণ, ন্যায় অন্যায় বিবেচনা করতে পারে। এ মন থেকেই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, যার শারীরিক গঠন মানুষের মতো তিনিই মানুষ। এজন্য তাকে অনেক সাধনা করতে হয়। সুন্দর মনের অভাবে মানুষের প্রাণ থাকলেও সে মানুষে পরিণত হয় না। তার অসুন্দর, অমানবীয় ও পশুর মতো আচরণ তাকে প্রকৃত মানুষ হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তাই মানুষের প্রাণে মনুষ্যত্ব সৃষ্টি করার জন্য অনেক পড়াশোনা এবং সাধনার প্রয়োজন হয়।

আমাদের সমাজে অনেক মানুষও পশুর ন্যায় কাজ করে বেড়াচ্ছে। কারণ তাদের প্রাণে যথার্থ মনুষ্যত্বের উদ্ভব ঘটেনি। এজন্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বলেছেন, মনের মানুষই মানুষ।

৪. খ. দুর্জন মানে দুষ্ট প্রকৃতির লোক। এ ধরনের মানুষ যত বিদ্বানই হোক না কেন তার সাহচর্যে একটি পবিত্র চরিত্র সহজেই কলুষিত হয়। তাই বিদ্বান দুর্জনের সাহচর্য ত্যাগ করা উচিত।

বিদ্যাশিক্ষা মানবজীবনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, সবচেয়ে মূল্যবান বিষয়। বিদ্বান মানুষ তাই সকলের দ্বারা সম্মানিত, সকলের নিকট পূজনীয়। বলা হয়ে থাকে, বিদ্বানের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্র। জ্ঞানীর নিদ্রা মূর্খের ইবাদতের চেয়েও মূল্যবান। কথাটি হাদিসেই এসেছে। তাই জ্ঞানী বা বিদ্বান মানুষের মূল্য সম্পর্কে সংশয় থাকার কোনো অবকাশই নেই। বস্তুত বিদ্বান মানুষ আলোকিত, আলোকপ্রাপ্ত। পতঙ্গ যেমন আলোর কাছে ভিড় করে তেমনি সমাজের মানুষের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকেন বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ। তাদের সঙ্গ ও সাহচর্য সবাইকে পরিতৃপ্ত করে। ধর্মীয় উপদেশ এবং জ্ঞানীদের নীতিকথায় সকলকে বিদ্বানের সান্নিধ্য লাভের জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। তবে জ্ঞানী মানুষ পেলেই তার কাছে সভক্তিতে ছুটে যেতে হবে এমন নয়। বিদ্বান ব্যক্তি যদি সচ্চরিত্র ও সুন্দর মানবীয় গুণের অধিকারী না হয় তাহলে সে মূর্খের চেয়েও বিপজ্জনক। কারণ মূর্খ মানুষকে কেউ অনুসরণ বা অনুকরণ করে না। তাদের কথাও কেউ মানতে চায় না। কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তির কথা মানুষ অন্ধের মতো অনুসরণ করে, তার জীবনাচরণকে অন্যরা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। তাই বিদ্বান ব্যক্তি যদি দুর্জন বা অসৎ হয় তাহলে তার দ্বারা সাধারণ মানুষের নৈতিক স্খলন ঘটার আশঙ্কা খুব বেশি। তাই বিদ্বান ব্যক্তি চরিত্রবান কিনা, তা না দেখে তার প্রতি ঝুঁকে পড়া উচিত হবে না। বিদ্যাশিক্ষার পাশাপাশি নৈতিকতা ও মূল্যবোধ যদি মানবজীবনে গড়ে না ওঠে তাহলে সে বিদ্যার কোনো মূল্য নেই। এ ধরনের মানুষ জ্ঞানপাপী বলে চিহ্নিত হয়ে থাকে। আর জ্ঞানপাপীকে এড়িয়ে চলাতেই সকলের মঙ্গল।

দুর্জন ব্যক্তি বিদ্বান হলেও সে সদা পরিত্যাজ্য। তার সাহচর্যে এলে ক্ষতির আশঙ্কাই বেশি। তাই তার সাহচর্য ত্যাগ করা উচিত।

৫. ক.

শেরপুরে বৃক্ষমেলা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব সংবাদদাতা, শেরপুর, ১৪ই জুলাই, ২০২... : ১০ই জুন থেকে শেরপুরের ফুটবল মাঠে সপ্তাহব্যাপী বৃক্ষমেলা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন স্থান থেকে আসা প্রায় ৬৫টি স্টল মেলায় অংশগ্রহণ করে। স্থানীয়ভাবে মানুষের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে এ মেলা। মেলায় ছিল মানুষের উপচে-পড়া ভিড়। শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণিসহ সব বয়স এবং সব শ্রেণি-পেশার মানুষ এ মেলায় অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন স্টল ঘুরে ঘুরে দেখেন। মেলায় প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা বিক্রি হয়।

মেলা উপলক্ষ্যে প্রতিদিন বিকালবেলা আলোচনা সভা ও সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদ্দীপনামূলক ও গণসংগীতের ব্যবস্থাও ছিল মেলায়। মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উপপরিচালক জনাব আলি ইদ্রীস সুজন। আলোচনায় অংশ নেন শেরপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. ইফতেখারুল আমীন, জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি জামিল হোসেন এবং উপজেলা কৃষি অফিসার মামুন সরোয়ার। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন শেরপুর জেলাপ্রশাসক ইয়াসিন মোল্লা।

বক্তাগণ বলেন যে, আমাদের দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা দরকার। কিন্তু রয়েছে মাত্র ১৬ শতাংশ। দেশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে ৩০ শতাংশ বনভূমি গড়ে তোলার পরিকল্পনা করে সে মোতাবেক অগ্রসর হতে হবে। বক্তাগণ প্রত্যেককে অন্তত তিনটি করে চারাগাছ লাগানোর জন্য আহ্বান জানান। তাহলে আমাদের দেশে অতিরিক্ত প্রায় ৬০ কোটি গাছ লাগানো সম্ভব হবে; যা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। মেলায় সমাপনী দিনে শ্রেষ্ঠ স্টলের পুরস্কার প্রদান করা হয়। শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করে সবুজায়ন নার্সারি।

৫. খ.

বরাবর
সম্পাদক,
দৈনিক ইনকিলাব,
২/১, আর. কে. মিশন রোড, ঢাকা।

বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।

জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত 'দৈনিক ইনকিলাব' পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশ করলে কৃতার্থ হব।
বিনীত
শাকিল

উত্তর পলাশবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠান

গত ২৩শে জানুয়ারি, ২০২... তারিখে উত্তর পলাশবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ এ্যাডভোকেট ইসলাম উদ্দীন খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মনিরুজ্জামান মনির। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবুল আহাদ। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করে স্ব স্ব ধর্মের অনুসারী শিক্ষার্থীরা। তারপর শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ওই অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ও বাংলা বিষয়ের শিক্ষক সরোজ মোস্তফা। এরপর শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে বক্তব্য দেওয়া শুরু হয়। বক্তব্য প্রদান করে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী অপু ও মিতু, মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থী রিফাত ও আবিদ এবং ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের নবীন শিক্ষার্থী হাসান ও রফিক। এসময় এক আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। শিক্ষকরা খুব মন দিয়ে নবীন শিক্ষার্থীদের কথা শোনেন। বিশেষ অতিথি নবীন শিক্ষার্থীদের পরামর্শ দেন। প্রধান অতিথি শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মানুষ হওয়ার দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করেন। এরপর অতিথিরা স্মারক হিসেবে শিক্ষার্থীদের হাতে ক্রেস্ট ও শুভেচ্ছা উপহার তুলে দেন। স্কুলের মাঠে নবীন শিক্ষার্থীদের মধ্যে নাস্তা পরিবেশন করা হয়।

এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পুরাতন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নবাগত শিক্ষার্থীদের একটি সেতুবন্ধ রচিত হয়। তাছাড়া শিক্ষকদের সঙ্গেও শিক্ষার্থীদের একটি উষ্ণ ভাববিনিময় হয়। ভবিষ্যতে এই স্মৃতিগুলো শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক প্রেরণা জোগাবে।

প্রতিবেদকের নাম ও ঠিকানা	:	শাকিল মাহমুদ, মানবিক বিভাগ, দশম শ্রেণি
প্রতিবেদনের শিরোনাম	:	উত্তর পলাশবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠান
প্রতিবেদনের ধরন	:	বিশেষ প্রতিবেদন
প্রতিবেদন রচনার তারিখ ও সময়	:	২৫শে জানুয়ারি, ২০২...; রাত ৯টা।

৬. ক. ভূমিকা : জীবনে শৃঙ্খলাবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষ দৈনন্দিন জীবনে নিয়মের অনুবর্তী হয়ে যে কাজ সম্পাদন করা হয় তাই শৃঙ্খলা। আর শৃঙ্খলাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ এবং তা চর্চার মধ্য দিয়েই জন্ম হয় শৃঙ্খলাবোধের। এটি জীবনের সবকিছুকেই সার্থক করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক জীবনে শৃঙ্খলাবোধ শান্তিময় স্বাভাবিক জীবন বয়ে আনতে সহায়তা করে।

শৃঙ্খলা কী : সাধারণত নিয়ম-কানুনের প্রতি আন্তরিক আনুগত্য এবং তার অনুসরণ করাই শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলা এবং শৃঙ্খলাবোধ শুধু রাষ্ট্রীয় কিছু বিধিনিষেধকে গ্রহণ বা বর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পারিবারিক ও সামাজিক জীবন এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রেই অলিখিত কিছু রীতি আছে, যা মানুষকে মেনে চলতে হয়। জগতের সকল কাজের সাথেই শৃঙ্খলা জড়িত, এমনকি বিশ্বজগতের বিস্তৃত প্রকৃতির মধ্যেও শৃঙ্খলার বিষয়টি স্পষ্ট। ঘরে, বাইরে, রাষ্ট্রে যেখানেই শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম হয়েছে সেখানেই বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

প্রকৃতির রাজত্বে শৃঙ্খলা : শৃঙ্খলাবোধ মানবজীবনের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। বিশ্বপ্রকৃতির সকল ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বিদ্যমান। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ তারা সবকিছুই চলছে নিয়মের মধ্য দিয়ে। এভাবে নিয়মকে অনুসরণ করছে অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্র। পাহাড় বেয়ে ঝরনা নামে, ঝরনা মিলিত হয় নদীতে আর নদী ছোটে সমুদ্রের পানে। নদীর জলে জোয়ার আসে, আসে ভাটাও। বর্ষা আসে, শীত আসে, আসে বসন্ত। পৃথিবী আঁধার করা অমাবস্যা কালো পর্দা টেনে দেয় জগৎ সংসারে। পৃথিবীর সবকিছুকে যেন আড়াল করে দেয়। আবার পূর্ণিমা আসে। কোমল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে গোটা জগৎ। এ সবই নিয়মশৃঙ্খলাকে মান্য করেই ঘটছে। এর ব্যতিক্রম ঘটলেই ছন্দপতন ঘটবে পৃথিবীর। মানুষও স্বাভাবিক জীবন হারিয়ে ফেলবে। শ্বাপদসংকুল গভীর অরণ্যে প্রাণিজগতেও আছে শৃঙ্খলা। তাদের আহার, বিহার, বাসস্থান সবকিছুতে যদি শৃঙ্খলা না থাকত তাহলে বনের প্রাণীরা নেমে আসত হাট-বাজারে, পাখিরা গান গাইত অন্য কোনো স্থানে।

ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলাবোধ : ছাত্রজীবনে মানুষ যা কিছু শেখে, যা কিছু অর্জন করে এর প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে ছাত্রজীবন। ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলাবোধ থাকলে জীবনে সফল হওয়া যায়। শৃঙ্খলাবোধ মানুষকে সুনিয়মে চালিত করে বলে ছাত্রজীবনে এর চর্চা থাকলে কোনো ছাত্রের জীবনেই অনিয়ম ও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ করে না। কিন্তু যে ছাত্র নিয়ম পালন করে না তার পক্ষে যথাসময়ে যথা কাজ করা অসম্ভব। ফলে পিছিয়ে যেতে যেতে ছাত্রের মনে এক ধরনের নেতিবাচক ধারণার জন্ম হয়। সে উদ্যম হারিয়ে নিজের জীবনকে অর্থহীন করে তোলে, এমনকি বিপথগামী হওয়াও তার পক্ষে সহজ। শৃঙ্খলা নেই এমন ছাত্র ছাত্রমহলে এবং শিক্ষকমহলে সমাদৃত হয় না। অন্যদিকে শৃঙ্খলাবোধে উজ্জীবিত ছাত্র শিক্ষকের স্নেহ আনুকূল্য লাভ করে জীবনকে উন্নত করার সুযোগ পায়। তাই ছাত্রজীবনেই শৃঙ্খলাবোধে জাগ্রত হওয়া অত্যাবশ্যক।

সমাজ ও জাতীয় জীবনে শৃঙ্খলা : মানুষের সামাজিক সংঘবদ্ধ জীবনে শৃঙ্খলার প্রয়োজন। একটি সমাজে শৃঙ্খলা না থাকলে এর সুন্দর কাঠামোটি ভেঙে যায়। সমাজজীবনে নিয়ম শৃঙ্খলার অভাব ঘটলে একটি উচ্ছৃঙ্খল গোত্রের আবির্ভাব হতে পারে। এর ফলে সমাজে অত্যাচার, লুণ্ঠন এবং অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি পায়। যেখানে নিয়ম শৃঙ্খলা নেই, সেখানে যে কেউ স্বেচ্ছাচারী হতে পারে। ফলে অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্গের মানুষের ওপর ক্ষমতাবানদের ক্ষমতা চর্চার সুযোগ ঘটে। আর এ কারণেই সাধারণ মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। তাই সমাজজীবনে শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। এভাবে জাতীয় জীবনেও রয়েছে শৃঙ্খলাবোধের প্রয়োজনীয়তা। রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের মধ্যে নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে। তা না হলে রাষ্ট্র অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত হয়। আর অকার্যকর রাষ্ট্র মানেই অরাজকতা এবং সীমাহীন দুর্নীতি। শৃঙ্খলাপূর্ণ জাতি খুব দ্রুত উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হয়। শৃঙ্খলাকে সভ্য সমাজের একটি লক্ষণ বলা যেতে পারে। তাই জাতির জাতীয় অগ্রগতির প্রয়োজনে এবং সভ্য সমাজের বাসিন্দা হিসেবে আমাদের সকলেরই নিয়ম শৃঙ্খলাকে জীবনের অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।

শৃঙ্খলাবোধের গুরুত্ব : মানবজীবনকে সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে হলে চাই অনুকূল পরিবেশ। আর শৃঙ্খলা জীবনে বয়ে আনে সে অনুকূল পরিবেশ। শৃঙ্খলাবোধ জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যায় সুন্দর আগামীর দিকে। শৃঙ্খলার গুরুত্বটি অনুধাবন সহজ হয় সৈনিক জীবনের দিকে তাকালেই। বিশাল সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ করতে গিয়ে কঠোরভাবে মেনে চলে শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলা ভঙ্গ হলে যুদ্ধের মাঠে পরাজয় অবধারিত হয়ে যায়। তাই সৈনিকজীবনের উদয়াস্ত সমস্তই শৃঙ্খলাপূর্ণ। বিশ্বের উন্নত দেশগুলো প্রভূত উন্নতি করছে শৃঙ্খলাকে অবলম্বন করে। তাই ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে শৃঙ্খলার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

শৃঙ্খলাহীনতার পরিণাম : শৃঙ্খলাবোধ সবারই কাম্য। আর শৃঙ্খলাহীনতার পরিণাম অশান্তি। যে সমাজ শৃঙ্খলাবর্জিত সে সমাজের ধ্বংস অনিবার্য।। শৃঙ্খলা নেই এমন সমাজে যে কেউ আইনকে তার নিজের হাতে তুলে নিতে পারে। ফলে দুর্বল মার খায় সবলের হাতে। সীমাহীন স্বেচ্ছাচারিতা সমাজের জন্য অশান্তি ও অকল্যাণ বয়ে আনে। পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রেই শৃঙ্খলার চর্চা নেই। যে কারণে যুগ যুগ ধরে উন্নতির চেষ্টা করেও তারা উন্নতির সাক্ষাৎ পাচ্ছে না; বরং দেশের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়ছে চরমপন্থিদের বিদ্রোহ। শৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্য নেই বলেই আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কাসহ অনেক দেশের অর্ধেক শাসনভার সরকারের হাতে, অন্য অর্ধেক বিদ্রোহী চরমপন্থিদের হাতে। এ পরিস্থিতি কল্যাণ রাষ্ট্রের সভ্য জাতির লক্ষণ হতে পারে না। তাই রাষ্ট্রের উচিত নিয়ম-শৃঙ্খলা লঙ্ঘিত হলে তার উপযুক্ত তদারকি করা। আর আইন শৃঙ্খলা অমান্যকারীদের আইনের আওতায় আনতে পারলেই জাতি ভয়াল পরিণতি থেকে রক্ষা পাবে।

উপসংহার : শৃঙ্খলাবোধসম্পন্ন ব্যক্তির আচরণে সুনাগরিকের লক্ষণ প্রকাশ পায়। জীবনকে সাফল্যে ভরে দিতে শৃঙ্খলা অনুশীলন অত্যাবশ্যক। সুনাগরিকের ব্যক্তিসাফল্য বৃহৎ অর্থে জাতীয় সাফল্যের নামান্তর। তাই জাতীয় জীবনে অগ্রগতি ও উন্নতির জন্য শৃঙ্খলাবোধসম্পন্ন সুনাগরিক অত্যাবশ্যক।

৬. খ. **ভূমিকা :** সভ্যতার ক্রম পরিবর্তনে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা পালন করেছে বিজ্ঞান। বর্তমান বিশ্বে মানুষের যে অগ্রযাত্রা তা বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। বিজ্ঞান মানুষকে গতিশীল করেছে এবং সভ্যতার অগ্রযাত্রাকে করেছে ত্বরান্বিত। বর্তমানে কৃষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূত্র বিজ্ঞানই আবিষ্কার করেছে। কৃষিকাজে বিজ্ঞানের অবদান অপরিসীম।

মানবসভ্যতা ও কৃষি : মানব সভ্যতার ইতিহাস অত্যন্ত পুরোনো। আর সেই সভ্যতার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কৃষির হাত ধরেই। মানুষ শিকারের বিকল্প হিসেবে কৃষিকে বেছে নিয়ে তার জীবনকে গতিশীল ও উন্নত করেছিল। তাই এটি মানুষের আদিমতম জীবিকার একটি পেশাও বটে। সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায় যে, কৃষিতে যে দেশ যত তাড়াতাড়ি অগ্রগতি সাধন করতে পেরেছে, সে দেশ তত তাড়াতাড়ি সভ্যতার উপরের সিঁড়িকে অতিক্রম করেছে। এ থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, কৃষির উন্নতিতেই সমাজ, দেশ ও সভ্যতার ক্রমোন্নতি সম্ভব হয়।

মানবজীবনে কৃষির গুরুত্ব : কৃষি মানুষের অস্তিত্বের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। মানবজীবন ও মানবসমাজে এর গুরুত্ব অপরিসীম। জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে এটি মানুষের আদিমতম জীবিকার উপায়। দেশে দেশে কৃষিই সমাজের মেরুদণ্ড, কৃষিই সমাজের ভিত্তি। স্বভাবতই কৃষির ক্রমোন্নতিতেই সমাজের ও দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি। এই উন্নতিতে অনন্য ও অভাবনীয় ভূমিকা রেখেছে বিজ্ঞান। আজকের বিশ্বে প্রতিটি ক্ষেত্রের মতো কৃষিক্ষেত্রেও বিজ্ঞানই আজ বাড়িয়ে দিয়েছে তার সুদূরপ্রসারী কল্যাণী হাত।

কৃষিকাজে বিজ্ঞান : মানুষ খাদ্যের জন্য কৃষির ওপর নির্ভরশীল। আজ বিজ্ঞানের প্রভাবে কৃষিকাজ আদিম স্তর কাটিয়ে আধুনিক স্তরে পৌঁছেছে। পানি সেচের ব্যবস্থা, উন্নত ধরনের বীজ, বীজ বপন, ফসল কাটা ও মাড়াই, ভূমি সংরক্ষণ ইত্যাদির প্রভূত উন্নতি কৃষিবিজ্ঞানেরই আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর মেশিনের অবদান। পৃথিবীতে আজ জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু ফসলি জমির পরিমাণ সীমিত। এ সীমিত কর্ষণযোগ্য জমিতে বিজ্ঞানের সহায়তায় নতুন বীজ আবিষ্কার, নতুন পদ্ধতি প্রয়োগে মানুষ ক্ষুধার্তের অন্ন সংগ্রহের প্রয়াস চালাচ্ছে।

বিভিন্ন দেশে কৃষিকাজে বিজ্ঞান : উন্নত দেশগুলোর কৃষিব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিজ্ঞাননির্ভর। জমিতে বীজ বপন থেকে শুরু করে ঘরে ফসল তোলা পর্যন্ত সমস্ত কাজেই রয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়া। বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক কৃষিযন্ত্র, যেমন– মোয়ার (শস্য-ছেদনকারী যন্ত্র), রপার (ফসল কাটার যন্ত্র), বাইন্ডার (ফসল বাঁধার যন্ত্র), থ্রেশিং মেশিন (মাড়াইযন্ত্র), ম্যানিউর স্প্রেডার (সার বিস্তরণ যন্ত্র) ইত্যাদি উন্নত দেশগুলোর কৃষিক্ষেত্রে এনেছে বৈপ্লবিক সাফল্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের খামারে একদিনে ১০০ একর পর্যন্ত জমি চাষ হচ্ছে কেবল এক-একটি ট্রাক্টরের মাধ্যমে। সেগুলো আবার একসাথে তিন-চারটি ফসল কাটার যন্ত্রকে একত্রে কাজে লাগাতে সক্ষম। তারা বিভিন্নভাবে কৃষিকাজের এমন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করছে যার ফলে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তারা কৃষিকাজে ব্যাপকভাবে অগ্রগামী। যেমন বলা যায় জাপানের কথা। জাপানে জমির উর্বরাশক্তি বাংলাদেশের তুলনায় কম। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে তারা বাংলাদেশের তুলনায় ৬ গুণ বেশি ফসল উৎপাদন করছে। শীতপ্রধান দেশে 'শীত নিয়ন্ত্রণ' ঘর বানিয়ে শাকসবজি এবং ফলমূল সংরক্ষণ করছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে বর্তমানে শুষ্ক মরুভূমির মতো জায়গাতে সেচ, সার ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় চাষাবাদ করে সোনার ফসল ফলানো সম্ভব হচ্ছে। এভাবে বিজ্ঞান কৃষিকাজে এক যুগান্তকারী বিপ্লব সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশের কৃষিকাজে বিজ্ঞান : আমাদের দেশেও এখন কৃষিকাজে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে জমি খণ্ডবিখণ্ড হচ্ছে। এই খণ্ডবিখণ্ডতার কারণে জমি কর্ষণে ব্যাপকভাবে ট্রাক্টর ব্যবহার করা যাচ্ছে না। তবে মানুষ এখন আর চাতকের ন্যায় বৃষ্টিধারার জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে না। সেচের জন্য এখন ব্যবহার করা হয় গভীর নলকূপ এবং মেশিনচালিত পাম্প। বপনের জন্য ব্যবহার করা হয় উন্নত ধরনের বীজ। বীজ সংরক্ষণে সাহায্য নেওয়া হয় বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির। বর্তমানে রাসায়নিক সার ব্যবহার করে ফসল উৎপাদনের মাত্রা বাড়ানো হচ্ছে। আগে যে জমিতে একধরনের ফসল হতো, বিজ্ঞানের সাহায্যে এখন সেখানে তিন ধরনের ফসল হয়। ধানের চারা রোপণ, ধান কাটা ও ধান মাড়াইয়ের আধুনিক যন্ত্রপাতি বাংলাদেশে বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে আমাদের দেশের কৃষিকাজ এখনো সম্পূর্ণ যান্ত্রিক করা সম্ভব হয়নি। চাষাবাদে বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারলে আমাদের খাদ্য সমস্যা সমাধান করা যাবে এবং বিদেশেও রপ্তানি করা যাবে।

বিজ্ঞানসম্মত কৃষির গুরুত্ব : আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কৃষির বাস্তবিক গুরুত্ব অনেকখানি। তবে পুরোনো পদ্ধতির চাষাবাদে বর্তমানে আর সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। এখন প্রয়োজন অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ। উন্নত বিশ্বের মতো ছোটো জায়গায় অধিক ফসল ফলানোর কৌশল আমাদেরও আয়ত্ত করতে হবে। তবেই কৃষক ও কৃষির সমন্বিত সাফল্য ত্বরান্বিত হবে।

বৈজ্ঞানিক কৃষি ও অর্থনীতি : বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষিকাজের ফলে অর্থনীতির অগ্রগতি সাধিত হওয়া সম্ভব। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, আমরা এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি। আমরা নিজেদের উৎপাদিত ফসল বাইরেও রপ্তানি করতে সমর্থ হচ্ছি। জীবনরহস্য আবিষ্কারের ফলে পাটের সোনালি দিন আবার আমাদের মধ্যে আসতে শুরু করেছে। বহু আগে থেকেই আমরা বিভিন্ন দেশে চা রপ্তানি করে আসছি। সুতরাং সর্বাধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদের ফলে আমাদের পক্ষে এ সাফল্যকে আরও ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

উপসংহার : কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞানের জাদুর ছোঁয়ায় অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। কেননা বিজ্ঞানকে আমরা যত কাজে লাগাতে পারব, ততই আমাদের কৃষিতে অপার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। তাই সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায় থেকেই বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদে কৃষককে উৎসাহিত করা আবশ্যক এবং সহযোগিতার হাতকে প্রসারিত করা একান্ত কর্তব্য।

৬. গ. **ভূমিকা :** মাদকাসক্তি আমাদের সমাজের ভয়াবহ একটি সমস্যা। কিছু পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে একজন মানুষ নিজেকে মাদকের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে। আমাদের দেশের তরুণদের মধ্যে মাদক গ্রহণের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। একটি জাতির উন্নয়নের ধারাকে গতিশীল করে তরুণসমাজ। কিন্তু মাদক তরুণসমাজের সেই অদম্য কর্মপ্রেরণাকে ধ্বংস করে দেয়। ফলে সে নিজেকে যেমন ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়, তেমনি দেশকেও মহাবিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দেয়। তাই এর প্রতিকার করা অত্যাবশ্যক।

মাদকের আবির্ভাব বা উৎস : নেশার ইতিহাস বেশ প্রাচীন। মদ, গাঁজা, আফিম, চরস বা তামাকের কথা বহু অগে থেকেই মানবসমাজে প্রচলিত ছিল। উনিশ শতকের মধ্যভাগে বেদনানাশক ওষুধ হিসেবে মাদকের ব্যবহার শুরু হয়, যাকে ইংরেজিতে ড্রাগ বলা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সৈনিকদের ব্যথার উপশম হিসেবে ড্রাগের ব্যবহার হলেও পরে হতাশা কাটাতেও তারা ড্রাগ ব্যবহার করতো। এরপর থেকেই কলম্বিয়া, বলিভিয়া, ব্রাজিল, ইকুয়েডর ইত্যাদি দেশে নেশার দ্রব্য হিসেবে ব্যাপকভাবে ড্রাগের ব্যবহার শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীব্যাপী।

মাদকদ্রব্যের প্রকারভেদ : সমাজে নানা ধরনের মাদকদ্রব্যের উদ্ভাবন ও ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন– হেরোইন, প্যাথেড্রিন, এলএসডি, মারিজুয়ানা, কোকেন, হাসিস প্রভৃতি আধুনিককালের মাদকদ্রব্য; তবে এর মধ্যে হেরোইন ও কোকেন বেশ দামি। আমাদের দেশের যুবসমাজ সচরাচর যে মাদকদ্রব্যগুলো ব্যবহার করে সেগুলো হলো– সিডাকসিন, ইনকটিন, প্যাথেড্রিন, ফেনসিডিল, ডেক্সপোটেন, গাঁজা ইত্যাদি। তবে এ সবকিছুর ব্যবহারকে ছাড়িয়ে গেছে অত্যাধুনিক এক মাদক যার নাম ইয়াবা।

মাদকদ্রব্যের ব্যবহার : দেশে মাদকের ব্যবহার বহু বিচিত্র। মানুষ নিজেকে অপ্রকৃতিস্থ করতে মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে। মাদকের ব্যবহার করে সে কল্পনার জগতে বিচরণ করে। এক্ষেত্রে মাদক ব্যবহারকারীরা নানা ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করে। যেমন– ধূমপান, ইনহেল বা শ্বাসের মাধ্যমে, জিহ্বার নিচে গ্রহণের মাধ্যমে, সরাসরি সেবনের মাধ্যমে, স্কিন পপিং ও মেইন লাইনিংয়ের মাধ্যমে। তবে যেভাবেই গ্রহণ করুন না কেন তাদের উদ্দেশ্য একটাই। আর তা হলো নেশায় উন্মত্ত হওয়া। প্রথমে কৌতূহলের বশে অনেকেই নেশাদ্রব্য গ্রহণ করে। কিন্তু ধীরে ধীরে তাতে অভ্যস্ত হয়ে ভয়াবহ এক সর্বনাশের পথে এগিয়ে যায় তারা।

মাদকাসক্তির কারণ : এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, মাদকাসক্তির অন্যতম কারণ ব্যক্তিজীবনের হতাশা। মানুষ যখন জীবন সম্পর্কে অনেক বেশি হতাশ হয়ে পড়ে, তখন সে মাদকদ্রব্যের আশ্রয় নেয়। হতাশাগ্রস্ত সাধারণ তরুণদের মধ্যে মাদক গ্রহণের হারও অনেক বেশি। তাছাড়া অসৎ সঙ্গে লিপ্ত হয়েও অনেকেই মাদকের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। যেসব পরিবারে পারিবারিক অশান্তি অনেক বেশি, সে পরিবারের ছেলেমেয়েদের জীবন বিশৃঙ্খল হতে থাকে। তারা এই বিশৃঙ্খলা থেকে ধীরে ধীরে মাদকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আমরা প্রতিদিনের পত্রপত্রিকায় এ ধরনের অনেক ঘটনাই লক্ষ করি। বেশির ভাগ মাদকসেবী দেখা যায় যারা বন্ধুবান্ধব বা সহপাঠীর সংস্পর্শে মাদকে আসক্ত হয়, তবে পারিবারিক অশান্তিই মাদকাসক্তির বিশেষ কারণ হিসেবে দেখা যায়।

মাদক চোরাচালান : সাধারণত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মাদক চোরাচালান হয়। সীমান্তে স্থল বা জলপথে এবং আকাশপথে বিশ্বব্যাপী এক বৃহৎ মাদক চোরাচালান নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে যার পেছনে রয়েছে বিরাট এক সিন্ডিকেট। কিছুকাল আগেও মায়ানমার, থাইল্যান্ড ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম নিয়ে গড়ে ওঠে আন্তর্জাতিক মাদক চোরাচালানের 'স্বর্গভূমি'। তবে ভিয়েতনামে সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে এই নেটওয়ার্ক ভেঙে যায়। এর কিছুদিন পরেই চোরাচালানকারীরা ইরান, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান নিয়ে গড়ে তোলে ড্রাগ পাচারের নতুন ভিত্তিভূমি, যার নাম 'গোল্ডেন ক্রিসেন্ট'।

বাংলাদেশে মাদকের আগ্রাসন : বাংলাদেশে মাদকের ব্যবহার আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অবৈধভাবে দেশে প্রবেশ করা এই মাদক আমাদের যুবসমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। মায়ানমার থেকে অবাধে এদেশে প্রবেশ করছে ইয়াবা, যাতে আসক্ত হয়ে পড়ছে বহু তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতি। দর্শনার 'কেরু এন্ড কোম্পানি' এদেশের একমাত্র লাইসেন্সধারী মদ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান; কিন্তু তার বাইরে বহু বিদেশি কোম্পানির মদ অবৈধভাবে অবাধে বাজারে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া গাঁজা ও আফিমের মতো মাদকদ্রব্যও অবাধে ক্রয়-বিক্রয় করা হচ্ছে।

মাদকাসক্তির ভয়াবহতা : মাদকাসক্তিকে অপ্রতিরোধ্য রোগ এইডসের সঙ্গে তুলনা করা যায়। মাদকাসক্তি মানুষকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। ইয়াবা ও হেরোইনের মতো মাদকদ্রব্য মানুষের শরীরের সমস্ত রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। এর আসক্তিতে মানুষ এক অস্বাভাবিক জীবনযাপন করে। নেশায় আক্রান্ত ব্যক্তির সুস্থ জীবনে ফিরে আসাও খুব সহজ হয় না। শরীরে মাদক গ্রহণ বন্ধ করা মাত্রই 'উইথড্রয়াল সিমটম' শুরু হয়। তখন মাদক না পেলে শুরু হয় টার্কি পিরিয়ড; হাত পা কাঁপতে থাকে; অসম্ভব শারীরিক যন্ত্রণা শুরু হয় এবং একপর্যায়ে তা হৃৎপিন্ডে আঘাত করে। তখন সুচিকিৎসা না পেলে খুব অল্প সময়ে মাদকাসক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

মাদকাসক্তি প্রতিরোধ : বিশ্বজুড়ে যে মাদকবিষ ছড়িয়ে পড়ছে তার থাবা থেকে মানুষকে বাঁচাতে হবে। এ নিয়ে বিশেষজ্ঞরা ভাবছেন। সমাজসেবীরা উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। দেশে দেশে নানা সংস্থা ও সংগঠন মাদকবিরোধী আন্দোলন শুরু করেছে। আমাদের দেশেও মাদকবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছে। বেতার, টিভি, সংবাদপত্র ইত্যাদি গণমাধ্যম মাদকবিরোধী জনমত গঠনে সক্রিয় হয়েছে। মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়েছে। এসব তৎপরতার লক্ষ্য হচ্ছে :

১. মাদকাসক্তদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ভেষজ ও মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ,
২. সুস্থ বিনোদনমূলক কার্যক্রমের সঙ্গে তরুণদের সম্পৃক্ত করে নেশার হাতছানি থেকে তাদের দূরে রাখা,
৩. ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে মাদকাসক্তির মর্মান্তিক পরিণতি সম্পর্কে সকলকে সচেতন করা,
৪. মাদক ব্যবসা ও চোরাচালানের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলা,
৫. বেকার যুবকদের জন্যে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

উপসংহার : মাদকাসক্তি একটি সামাজিক সমস্যা। এ সমস্যায় তরুণরাই বেশি আসক্ত। একটি দেশের গতিশীলতাকে অব্যাহত রাখে তরুণসমাজ। তারাই যদি মাদকের কবলে পড়ে নিজেদের জীবনকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়, তবে দেশের সার্বিক অগ্রগতি চরমভাবে বিনষ্ট হবে। তাই তরুণসমাজকে মাদক সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং এর কারবারিদের সর্বাগ্রে বয়কট করতে হবে। আমাদের প্রত্যাশা বাংলাদেশ মাদকমুক্ত হয়ে সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হোক।

কুমিল্লা বোর্ড–২০২৪

সেট : খ

বাংলা দ্বিতীয় পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) **বিষয় কোড : 1 0 2**

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময় : ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. বাক্যের মধ্যে কোনটির ভূমিকা বদলে গিয়ে একই বক্তব্যের প্রকাশভঙ্গি আলাদা হয়ে যায়?
ক ক্রিয়া খ কর্তা গ কর্ম ঘ ভাব

২. 'শামীম বাংলা ব্যাকরণে ভালো' নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকের উদাহরণ?
ক সম্বন্ধ কারক খ অপাদান কারক
গ করণ কারক ঘ অধিকরণ কারক

৩. গঠনগত দিক থেকে বাক্য কত প্রকার?
ক দুই খ তিন গ চার ঘ পাঁচ

৪. কোন শ্রেণির বাক্য সাপেক্ষ যোজক দ্বারা যুক্ত হয়?
ক বিধেয় খ সরল
গ জটিল ঘ যৌগিক

৫. বক্তার কথা উপস্থাপনের ধরনকে কী বলে?
ক বাচ্য খ কারক
গ উক্তি ঘ বচন

৬. 'সুসময়ের বন্ধু' কথাটি নিচের কোন বাগ্‌ধারাকে সমর্থন করে?
ক মণিকাঞ্চন যোগ খ মানিকজোড়
গ অমাবস্যার চাঁদ ঘ দুধের মাছি

৭. 'আ' ধ্বনি উচ্চারণের সময় ঠোঁটের উন্মুক্তি কেমন?
ক বিবৃত খ অর্ধ-বিবৃত
গ অর্ধ-সংবৃত ঘ সংবৃত

৮. বাংলা লিপি কোন লিপির বিবর্তিত রূপ?
ক বাংলা খ কুটিল
গ ব্রাহ্মী ঘ মণিপুরি

৯. কোনটি বাগ্‌যন্ত্রের সবচেয়ে সচল ও সক্রিয় প্রত্যঙ্গ?
ক দন্তমূল খ ফুসফুস
গ শ্বাসনালি ঘ জিভ

১০. কোনটি ভাষার ক্ষুদ্রতম উপাদান?
ক ধ্বনি খ শব্দ
গ বর্ণ ঘ বাক্য

১১. চলিতরীতির নতুন নাম প্রমিতরীতি হয়–
ক বিশ শতকের সূচনায় খ বিশ শতকের মাঝামাঝি
গ বিশ শতকের শেষে ঘ একুশ শতকের সূচনায়

১২. কোন বর্ণগুচ্ছটি অঘোষ ব্যঞ্জন?
ক ন, র, ল খ জ, ঝ, ড়
গ গ, ঘ, হ ঘ স, শ, ছ

১৩. 'পদ্ম' শব্দের সঠিক উচ্চারণ কোনটি?
ক পদ্য খ পদদোঁ
গ পোদ্‌দো ঘ পোদ্‌দ

১৪. কোনটি স্বচ্ছ যুক্ত বর্ণের উদাহরণ?
ক ঙ্ক খ হ্ম গ ঞ্জ ঘ ক্ষ

১৫. যেসব শব্দাংশ পদের সঙ্গে যুক্ত হলে বক্তব্য জোরালো হয় তাদের কী বলে?
ক নির্দেশক খ বলক
গ বিভক্তি ঘ বচন

১৬. নিচের কোনটি উপমান কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ?
ক কাজলকালো খ চন্দ্রমুখ
গ মনমাঝি ঘ পদ্মআঁখি

১৭. নিচের কোন শব্দটিতে 'আগত' অর্থে প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে?
ক ঢাকাই খ দখিনা গ কানাই ঘ ডাক্তারি

১৮. বিভক্তিহীন পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব কোনটি?
ক পথে পথে খ মজার মজার
গ হঠাৎ হঠাৎ ঘ কথায় কথায়

১৯. নিচের কোনটি ভগ্নাংশ পূরণবাচক সংখ্যা শব্দের উদাহরণ?
ক দ্বি খ তৃতীয় গ তেসরা ঘ তেহাই

২০. শব্দ, বর্গ ও অধীন বাক্যকে আলাদা করতে কোন বিরামচিহ্ন বসে?
ক কমা খ সেমিকোলন
গ কোলন ঘ হাইফেন

২১. নিচের কোনটি পর্তুগিজ শব্দ?
ক কারখানা খ আদালত
গ রেস্তোরাঁ ঘ আলমারি

২২. নিচের কোন বাক্যে সাধারণ অনুসর্গের প্রয়োগ রয়েছে?
ক জিনিসের দাম বেড়েছে কারণ চাহিদা বেশি।
খ যদি রোদ ওঠে, তবে রওনা দেব।
গ বসার সময় নেই তাই যেতে হচ্ছে।
ঘ কার কাছে গেলে জানা যাবে?

২৩. 'অপরাজেয় বাংলা' কোন শ্রেণির বিশেষ্য?
ক স্থাননাম খ সৃষ্টিনাম
গ কালনাম ঘ ব্যক্তিনাম

২৪. পরস্পর নির্ভরশীল দুটি সর্বনামকে কী বলে?
ক পারস্পরিক সর্বনাম খ সাপেক্ষ সর্বনাম
গ সকলবাচক সর্বনাম ঘ অন্যবাচক সর্বনাম

২৫. কোন কিছুর সামান্য বা অল্প পরিমাণ বোঝাতে নিচের কোন নির্দেশকটি বসে?
ক টুকু খ টো গ টে ঘ টি

২৬. গঠন বিবেচনায় ক্রিয়াবিশেষণকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
ক দুই খ তিন গ চার ঘ পাঁচ

২৭. 'সমুদ্র' শব্দের প্রতিশব্দ কোনটি?
ক পাদপ খ শৈল
গ উদক ঘ পয়োধি

২৮. বাক্যের মধ্যকার একাধিক পদকে সংযুক্ত করতে কোন যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হয়?
ক কমা খ হাইফেন গ ড্যাস ঘ কোলন

২৯. বিধেয় ক্রিয়ার বিশেষ্য অংশকে কী বলা হয়?
ক উদ্দেশ্য খ বিধেয়
গ পূরক ঘ প্রসারক

৩০. অতীতে প্রায়ই ঘটতো এমন বোঝালে কোন অতীত কাল হয়?
ক সাধারণ অতীত খ ঘটমান অতীত
গ পুরাঘটিত অতীত ঘ নিত্যবৃত্ত অতীত

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

কুমিল্লা বোর্ড–২০২৪

বাংলা দ্বিতীয় পত্র (রচনামূলক প্রশ্ন)

সেট : ০৩ বিষয় কোড : | 1 | 0 | 2 |

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। উত্তর প্রাসঙ্গিক ও যথাযথ হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

১। যে-কোনো একটি বিষয়ে অনুচ্ছেদ লেখো : ১০

(ক) বইমেলা

(খ) জাতীয় পতাকা।

২। (ক) মনে করো, তুমি স্বাগত/সিঁথি, শেরপুর জেলার বাসিন্দা। 'সড়ক দুর্ঘটনা' প্রতিকারের দাবি জানিয়ে পত্রিকায় প্রকাশ উপযোগী একখানা পত্র লেখো। ১০

অথবা,

(খ) মনে করো, তুমি সুমাইয়া/সালমান, আয়নাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক' হিসেবে নিয়োগ পেতে চাও। এ নিয়োগ প্রাপ্তির জন্য একখানা আবেদনপত্র লেখো।

৩। (ক) সারাংশ লেখো : ১০

মানুষের মূল্য কোথায়? চরিত্র, মনুষ্যত্ব, জ্ঞান ও কর্মে। বস্তুত চরিত্রবলেই মানুষের যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তা বুঝতে হবে। চরিত্র ছাড়া মানুষের গৌরব করার আর কিছুই নেই। মানুষের শ্রদ্ধা যদি মানুষের প্রাপ্য হয়, সে শুধু চরিত্রের জন্য। অন্য কোনো কারণে মানুষের মাথা মানুষের সামনে নত হবার দরকার নেই। জগতে যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের গৌরবের মূলে এই চরিত্রশক্তি। তুমি চরিত্রবান লোক–এ কথার অর্থ এই নয় যে, তুমি লম্পট নও। তুমি সত্যবাদী, বিনয়ী এবং জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করো। তুমি পরদুঃখকাতর, ন্যায়বান এবং মানুষের ন্যায় স্বাধীনতাপ্রিয়– চরিত্রবান মানে এই।

অথবা,

(খ) সারমর্ম লেখো :

আসিতেছে শুভদিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ!
হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙিল যাহারা পাহাড়,
পাহাড়-কাটা সে পথের দু'পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি;
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরি গান,
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান!

৪। যে-কোনো একটি ভাব-সম্প্রসারণ করো : ১০

(ক) দুর্জন বিদ্বান হইলেও পরিত্যাজ্য।

(খ) ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়;
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

৫। (ক) মনে করো, তুমি অরণ্য/সাদিকা, আনন্দ আলো উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী। তোমার বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ উৎসব উদ্‌যাপন সংক্রান্ত একটি সংবাদ প্রতিবেদন প্রণয়ন করো। ১০

অথবা,

(খ) মনে করো, তুমি রাশিক/অনন্যা, একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার জামালপুর জেলা প্রতিনিধি। তোমার জেলার নতুন কুঁড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপন সম্পর্কে একটি সংবাদ প্রতিবেদন তৈরি করো।

৬। যে-কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করো : ২০

(ক) কৃষি উদ্যোক্তা

(খ) বাংলাদেশের উৎসব

(গ) বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	ক	২	ঘ	৩	খ	৪	গ	৫	গ	৬	ঘ	৭	ক	৮	খ	৯	ঘ	১০	ক	১১	ঘ	১২	ঘ	১৩	খ	১৪	গ	১৫	খ
	১৬	ক	১৭	খ	১৮	গ	১৯	ঘ	২০	ক	২১	ঘ	২২	ঘ	২৩	খ	২৪	খ	২৫	ক	২৬	ক	২৭	ঘ	২৮	খ	২৯	গ	৩০	ঘ

রচনামূলক

১. ক. বইমেলা হলো লেখক, প্রকাশক ও পাঠকের মিলনমেলা। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা-আন্দোলনে সালাম, বরকত, রফিক, শফিউর প্রমুখ শহিদ হন। তাদের সেই স্মৃতিকে অম্লান রাখতেই ১৯৭২ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি মুক্তধারার প্রকাশক চিত্তরঞ্জন সাহা ঢাকার বর্ধমান হাউজ প্রাঙ্গণে ৩২টি বই সাজিয়ে বইমেলার সূচনা করেন। সেই থেকে প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে আয়োজন করা হয় একুশে বইমেলা এবং এর নামকরণ করা হয় 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় এ মেলা। মাসব্যাপী একুশে বইমেলা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হয় অসংখ্য বই। মেলা প্রাঙ্গণে প্রবেশের প্রধান তোরণটি সাজানো হয় অত্যন্ত চমৎকারভাবে। মেলার ভেতরে বটবৃক্ষের বেদিমূলে তৈরি করা হয় নজরুল মঞ্চ। চারদিকে চক্রাকারে থাকে প্রয়াত জ্ঞানীগুণী মনীষীদের ছবি এবং সাজানো থাকে বিখ্যাত ব্যক্তিদের অমর বাণী। মেলায় প্রবেশ করতেই চোখে পড়ে স্টল এবং স্টলে সাজানো বই। বইমেলায় সাধারণত সৃজনশীল বইয়ের সমাবেশ ঘটে। বিভিন্ন রুচির পাঠক তাদের পছন্দমতো বই সংগ্রহ করে বইমেলা থেকে। শিশু-কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ সবারই রুচিসম্মত বইয়ের সমাবেশ থাকে মেলায়। এছাড়া বইমেলায় অনেক লেখকের সাথে পাঠকদের সাক্ষাৎ ঘটে। বর্তমানকালে বইমেলা বা পুস্তক প্রদর্শনীগুলোর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এবং সাফল্য গ্রন্থ প্রকাশনার জগতে এনেছে অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য। একুশে বইমেলা একদিকে বাঙালির বই কেনা, পাঠাভ্যাস গঠন ও পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের এক মিলনতীর্থ, অপরদিকে এটি বাঙালির সংগ্রামী চেতনা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের এক তাৎপর্যপূর্ণ অনুষঙ্গ।

১. খ. আমাদের জাতীয় পতাকা আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক। এর আকৃতি আয়তক্ষেত্রের মতো। এতে সবুজের মাঝে একটি লাল বৃত্ত রয়েছে। পতাকাটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত হলো ১০ : ৬। ভবনে ব্যবহারের জন্য জাতীয় পতাকার আকার ও আয়তন হলো– ৩০৫ সেমি × ১৮৩ সেমি অর্থাৎ, ১০ ফুট × ৬ ফুট, পতাকার রঙে তাৎপর্যময় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পতাকার সবুজ বর্ণ বাংলাদেশের শ্যামল প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য। এদেশের তারুণ্য, সজীবতা ও সমৃদ্ধির ইঙ্গিত বহন করে। আর লোহিত বর্ণ-সূর্য, নবজাগরণ, বিপ্লবী চেতনা ও সাম্যের ইঙ্গিত বহন করে। সূর্যের কিরণ যেমন সব মানুষ সমানভাবে লাভ করে, সেরূপ সুবর্ণ সূর্যখচিত বাংলাদেশের জাতীয় পতাকাও সব শ্রেণির বাংলাদেশির মধ্যে সমতা বিধান করছে। প্রয়াত শিল্পী কামরুল হাসান এর নকশা তৈরি করেন। এটি বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সময়ে উত্তোলন করা হয়। ১৯৭১-এর ২রা মার্চ সর্বপ্রথম এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে উত্তোলন করা হয়। তখন ঐ পতাকার নকশা কিছুটা ভিন্ন ছিল। বাংলাদেশের মানচিত্রটি তখন পতাকার মাঝখানে ছিল। পরবর্তীকালে জাতীয় পতাকা থেকে বাংলাদেশের মানচিত্র বাদ দেওয়া হয়। আমাদের জাতীয় পতাকা আমাদের পরিচয়বাহী। দেশের সম্মান রক্ষার্থে এটি আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অনুপ্রেরণা জোগায়। লাখ লাখ মানুষের জীবন এবং বহু মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা এ পতাকা অর্জন করেছি। প্রকৃতপক্ষে এটি এক টুকরা কাপড়ের তৈরি হলেও এটি রক্তে নির্মিত আমাদের দেশের স্বাধীনতার প্রতীক। এ পতাকার মর্যাদা ও সম্মান আমরা জীবন দিয়ে রক্ষা করব।

২. ক.

১৩ই মে, ২০২...
বরাবর
সম্পাদক,
দৈনিক সমকাল,
৩৮৭, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।
বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি আপনার পত্রিকায় প্রকাশের আবেদন।
জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত 'দৈনিক সমকাল'-এ চিঠিপত্র কলামে নিম্নলিখিত পত্রটি প্রকাশ করলে বাধিত থাকব।
বিনীত
স্বাগত
ঘিওর, মানিকগঞ্জ।

সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিকার চাই

'একটি দুর্ঘটনা, সারা জীবনের কান্না'– স্লোগানটি নির্মম বাস্তবতানির্ভর। ইদানীং সড়ক দুর্ঘটনা আমাদের দেশে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই সংঘটিত হচ্ছে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা। প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললে একটি না একটি সড়ক দুর্ঘটনার খবর চোখে পড়ে। এ ধরনের দুর্ঘটনা যেন দিন দিন বেড়েই চলছে, যার ফলে বহু পরিবার সর্বনাশের সম্মুখীন হচ্ছে। কত মা-বাবা তার সন্তান হারিয়েছে। কত সদ্যবিবাহিতাকে বিধবা-জীবন বরণ করতে হচ্ছে। কত পিতাকে যে পুত্রের লাশ বহন করতে হচ্ছে। দিন দিন মানুষের জীবন অনিরাপদ হয়ে পড়ছে। একথা সত্য যে, 'জন্মিলে মরিতে হবে।' কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুকে মেনে নেওয়া যায় না।

সাধারণত আমাদের দেশে সড়ক দুর্ঘটনা কয়েকটি কারণ হলো– ত্রুটিযুক্ত গাড়ি, অনভিজ্ঞ বা মাদকাসক্ত ড্রাইভার, ধারণ ক্ষমতার অধিক মাল বা যাত্রী বহন, ওভারটেকিং বা চালকের দায়িত্বহীনতা, ট্র্যাফিক আইন না মানার প্রবণতা ইত্যাদি। এসব সমস্যা সমাধানে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যেমন– পরিবহণ সংশ্লিষ্ট সবাইকে যানবাহন বিধি ও আইন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া, রাস্তা সংস্কার, ট্র্যাফিক ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মিডিয়াগুলোতে সড়ক দুর্ঘটনা সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রচারের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

আশা করি, উপরিউক্ত কারণগুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করলে সড়ক দুর্ঘটনা অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব হবে।

নিবেদক
স্বাগত

২. খ.

২৪শে জুলাই, ২০...
বরাবর
প্রধান শিক্ষক
আয়নাপুর উচ্চ বিদ্যালয়

বিষয় : সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য আবেদন।

মহোদয়,
সবিনয় নিবেদন এই যে, গত ১৬ই জুন, ২০২... তারিখে দৈনিক 'বাংলাদেশ প্রতিদিন' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, অত্র বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে লোক নিয়োগ করা হবে। আমি উক্ত পদের একজন প্রার্থী হিসেবে আবেদন করছি। নিম্নে আমার শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ প্রয়োজনীয় জীবনবৃত্তান্ত উল্লেখ করা হলো :

১. নাম : সালমান মুক্তাদির
২. পিতার নাম : মো. শামসুদ্দিন আহমেদ
৩. মাতার নাম : বেগম হাফিজা খাতুন
৪. স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা : মুন্সীবাড়ি, গ্রাম : ডুমুরখালি, পোস্ট : ঝিকরগাছা, জেলা : যশোর।
৫. জন্মতারিখ : ২৮শে মে, ১৯৯৮
৬. জাতীয়তা : বাংলাদেশি
৭. ধর্ম : ইসলাম
৮. শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণ :

পরীক্ষার নাম	পাসের বছর	বিভাগ	জিপিএ/শ্রেণি	বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়
এসএসসি	২০১৪	বিজ্ঞান	জিপিএ-৫	যশোর বোর্ড
এইচএসসি	২০১৬	বিজ্ঞান	জিপিএ-৫	যশোর বোর্ড
স্নাতক	২০১৯	মানবিক	দ্বিতীয়	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

অতএব, উপর্যুক্ত তথ্যাবলির আলোকে অনুগ্রহপূর্বক আমাকে অত্র বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য বিবেচনা করলে বাধিত হব।

বিনীত নিবেদক
সালমান মুক্তাদির

সংযুক্তি :

১. সনদপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি– তিন কপি
২. নাগরিকত্ব ও চারিত্রিক সনদ– দুই কপি
৩. সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজের ছবি– তিন কপি।

৩. ক. মানুষের প্রকৃত মূল্য তার চরিত্রে। চরিত্রবলে সে সবকিছু জয় করে। পৃথিবীর সকল পুরুষই তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। চরিত্র মানে শুধু নৈতিকতা নয়। চরিত্র মানে বিনয়, জ্ঞান, সত্যবাদিতা, সরলতা, আতিথেয়তা ও স্বাধীনপ্রিয়তা।

৩. খ. শ্রমজীবী মানুষের কঠোর শ্রম ও অপরিসীম ত্যাগে গড়ে উঠেছে মানবসভ্যতা। তারাই সত্যিকারের মহৎ মানুষ। কিন্তু বাস্তবজীবনে এরা বঞ্চিত, শোষিত ও উপেক্ষিত। এখন দিন এসেছে। শ্রমজীবী মানুষেরাই একদিন নবজাগরণের মধ্য দিয়ে বিশ্বে পালাবদলের সূচনা করবে।

৪. ক. দুর্জন মানে দুষ্ট প্রকৃতির লোক। এ ধরনের মানুষ যত বিদ্বানই হোক না কেন তার সাহচর্যে একটি পবিত্র চরিত্র সহজেই কলুষিত হয়। তাই বিদ্বান দুর্জনের সাহচর্য ত্যাগ করা উচিত।

বিদ্যাশিক্ষা মানবজীবনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, সবচেয়ে মূল্যবান বিষয়। বিদ্বান মানুষ তাই সকলের দ্বারা সম্মানিত, সকলের নিকট পূজনীয়। বলা হয়ে থাকে, বিদ্বানের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্র। জ্ঞানীর নিদ্রা মূর্খের ইবাদতের চেয়েও মূল্যবান। কথাটি হাদিসেই এসেছে। তাই জ্ঞানী বা বিদ্বান মানুষের মূল্য সম্পর্কে সংশয় থাকার কোনো অবকাশই নেই। বস্তুত বিদ্বান মানুষ আলোকিত,

আলোকপ্রাপ্ত। পতঙ্গ যেমন আলোর কাছে ভিড় করে তেমনি সমাজের মানুষের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকেন বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ। তাদের সঙ্গ ও সাহচর্য সবাইকে পরিতৃপ্ত করে। ধর্মীয় উপদেশ এবং জ্ঞানীদের নীতিকথায় সকলকে বিদ্বানের সান্নিধ্য লাভের জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। তবে জ্ঞানী মানুষ পেলেই তার কাছে সভক্তিতে ছুটে যেতে হবে এমন নয়। বিদ্বান ব্যক্তি যদি সচ্চরিত্র ও সুন্দর মানবীয় গুণের অধিকারী না হয় তাহলে সে মূর্খের চেয়েও বিপজ্জনক। কারণ মূর্খ মানুষকে কেউ অনুসরণ বা অনুকরণ করে না। তাদের কথাও কেউ মানতে চায় না। কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তির কথা মানুষ অন্ধের মতো অনুসরণ করে, তার জীবনাচরণকে অন্যরা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। তাই বিদ্বান ব্যক্তি যদি দুর্জন বা অসৎ হয় তাহলে তার দ্বারা সাধারণ মানুষের নৈতিক স্খলন ঘটার আশঙ্কা খুব বেশি। তাই বিদ্বান ব্যক্তি চরিত্রবান কিনা, তা না দেখে তার প্রতি ঝুঁকে পড়া উচিত হবে না। বিদ্যাশিক্ষার পাশাপাশি নৈতিকতা ও মূল্যবোধ যদি মানবজীবনে গড়ে না ওঠে তাহলে সে বিদ্যার কোনো মূল্য নেই। এ ধরনের মানুষ জ্ঞানপাপী বলে চিহ্নিত হয়ে থাকে। আর জ্ঞানপাপীকে এড়িয়ে চলাতেই সকলের মঙ্গল।

দুর্জন ব্যক্তি বিদ্বান হলেও সে সদা পরিত্যাজ্য। তার সাহচর্যে এলে ক্ষতির আশঙ্কাই বেশি। তাই তার সাহচর্য ত্যাগ করা উচিত।

৪. খ. ক্ষুধার্ত মানুষের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ক্ষুন্নিবৃত্তি। সব কিছুর মধ্যেই সে ক্ষুধা নিবৃত্তির কথা ভাবে। তখন কোনো কিছু সুন্দর কি অসুন্দর, তা তাকে ভাবায় না।

প্রত্যেক মানুষের বেঁচে থাকার জন্য কতগুলো মৌলিক চাহিদা রয়েছে। খাদ্য হলো এর মধ্যে প্রধান মৌলিক চাহিদা। খাদ্য ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। মানুষের শরীরে তৈরি হওয়া এই খাদ্যের চাহিদারই অপর নাম ক্ষুধা। ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য মানুষ সব কিছু করতে পারে। মানুষ যে দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে, তার পেছনে এই ক্ষুন্নিবৃত্তিই মূল চালিকাশক্তি। ক্ষুধা নিবৃত্ত হওয়ার পরেই মানুষ অন্যান্য মৌলিক চাহিদার কথা ভাবে। বাসস্থানের কথা ভাবে, পোশাকের কথা ভাবে, স্বাস্থ্যের কথা ভাবে। সুন্দর-অসুন্দরের কথা ভাবে একেবারে শেষ পর্যায়ে। তাই ক্ষুধা যখন মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, তখন সৌন্দর্যের মূল্য তার কাছে থাকে না। একজন সুখী মানুষের কাছে পৃথিবীকে সুন্দর মনে হতে পারে। কিন্তু ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে তা নাও হতে পারে। অতীতে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। হাজার হাজার মানুষ না খেয়ে মারা যেত। সামান্য দুটো রুটির জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষকে সারাদিন পরিশ্রম করতে হতো। সেই দুর্ভিক্ষে একজন শ্রমজীবীর কাছে পূর্ণিমার চাঁদ বড়োজোর একখানা ঝলসানো রুটির মতো মনে হবে, সেটাই স্বাভাবিক।

ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে পৃথিবীর সৌন্দর্য কোনো তাৎপর্য বহন করে না। ক্ষুধা নিবারণের জন্য তার সবচেয়ে আগে দরকার খাদ্য। গদ্যের কাঠিন্যটুকু সে ভালো উপলব্ধি করতে পারে; কাব্যের সুধা তার কাছে অর্থহীন।

৫. ক.

আনন্দ আলো উচ্চ বিদ্যালয়ে বৃক্ষমেলা অনুষ্ঠিত

অরণ্য, শেরপুর, ১৪ই জুলাই, ২০২... : ১০ই জুন থেকে শেরপুরের আনন্দ আলো উচ্চ বিদ্যালয়ে সপ্তাহব্যাপী বৃক্ষমেলা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন স্থান থেকে আসা প্রায় ৬৫টি স্টল মেলায় অংশগ্রহণ করে। স্থানীয়ভাবে মানুষের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে এ মেলা। মেলায় ছিল মানুষের উপচে-পড়া ভিড়। শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণিসহ সব বয়স এবং সব শ্রেণি-পেশার মানুষ এ মেলায় অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন স্টল ঘুরে ঘুরে দেখেন। মেলায় প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা বিক্রি হয়।

মেলা উপলক্ষ্যে প্রতিদিন বিকালবেলা আলোচনা সভা ও সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদ্দীপনামূলক ও গণসংগীতের ব্যবস্থাও ছিল মেলায়। মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উপপরিচালক জনাব আলি ইদ্রীস সুজন। আলোচনায় অংশ নেন শেরপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. ইফতেখারুল আমীন, জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি জামিল হোসেন এবং উপজেলা কৃষি অফিসার মামুন সরোয়ার। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন শেরপুর জেলাপ্রশাসক ইয়াসিন মোল্লা।

বক্তাগণ বলেন যে, আমাদের দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা দরকার। কিন্তু রয়েছে মাত্র ১৬ শতাংশ। দেশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে ৩০ শতাংশ বনভূমি গড়ে তোলার পরিকল্পনা করে সে মোতাবেক অগ্রসর হতে হবে। বক্তাগণ প্রত্যেককে অন্তত তিনটি করে চারাগাছ লাগানোর জন্য আহ্বান জানান। তাহলে আমাদের দেশে অতিরিক্ত প্রায় ৬০ কোটি গাছ লাগানো সম্ভব হবে; যা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। মেলায় সমাপনী দিনে শ্রেষ্ঠ স্টলের পুরস্কার প্রদান করা হয়। শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করে সবুজায়ন নার্সারি।

৫. খ.

নতুন কুঁড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে 'শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপন

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে নতুন কুঁড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০২... দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (বাংলা) জনাব জসিম উদ্দিন।

সকাল ৭টায় প্রভাতফেরির মাধ্যমে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ভোর থেকেই বিদ্যালয়ের আশপাশের ছাত্রছাত্রীরা খালি পায়ে প্রশাসনিক ভবনের সামনে সমবেত হয়। তাদের সঙ্গে শিক্ষকবৃন্দ যোগদান করেন। বিদ্যালয় মাঠের দক্ষিণ প্রান্তে শহিদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের খালি পায়ে শোভাযাত্রা শুরু হয়। সবার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয় একুশে ফেব্রুয়ারির অমর গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি।' এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হয় শোভাযাত্রা। অবশেষে সকাল ৮টায় শহিদ মিনারের পাদদেশে সকলে উপনীত হলে প্রধান শিক্ষক প্রথম পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে অমর শহিদদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ ফুলের তোড়া শহিদ মিনারে অর্পণ করে শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

শহিদ দিবস ও মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে পরবর্তী কর্মসূচি ছিল কবিতা আবৃত্তি ও সংগীতানুষ্ঠান। শহিদ মিনারের বেদিমূলে সবুজ ঘাসের গালিচার উপর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথমে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত কবিগণের নির্বাচিত কবিতা আবৃত্তি করে। পরে স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনানো হয়। আবৃত্তিশেষে শুরু হয় সংগীতানুষ্ঠান। দেশাত্মবোধক গানই ছিল এ পর্যায়ের মূল আকর্ষণ।

বিকেলে আয়োজন করা হয়েছিল আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সভাপতিত্বে আলোচনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি মুহম্মদ সামাদ। বিদ্যালয়ের দুজন শিক্ষার্থী মাতৃভাষা দিবসের ওপর আলোচনা করে। আলোচনার শেষে ছিল পুরস্কার বিতরণ পর্ব। শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত কবিতা ও রচনা প্রতিযোগিতা এবং সংগীত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং প্রধান অতিথি। নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

প্রতিবেদকের নাম : রাশিক আহমেদ
প্রতিবেদনের শিরোনাম : নতুন কুঁড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে 'শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপন।
প্রতিবেদনের প্রক্রিয়া : বিশেষ প্রতিবেদন
প্রতিবেদনের সময় : দুপুর ১২টা
প্রতিবেদনের তারিখ : ২৩/০২/২০২...

৬. ক. **ভূমিকা :** অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে এবং জনবল কাজে লাগিয়ে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ উপার্জনের প্রত্যাশায় যখন কোনো কাজ করার পরিকল্পনা করে, তখন তাকে উদ্যোগ বলে। যারা এই উদ্যোগ গ্রহণ করে তাদের বলে উদ্যোক্তা। প্রতিটি পেশাকে কেন্দ্র করে উদ্যোক্তা হওয়া সম্ভব। একজন উদ্যোক্তা আত্মনির্ভরশীল হন এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেন। কৃষিকে উদ্যোগ হিসেবে গ্রহণ করার বিষয়টি বাংলাদেশে নতুন। বিপুল জনসংখ্যা, কৃষিজমির পরিমাণ হ্রাস, বেকারত্ব– এ সবকিছুর ভিতরে একদল তরুণ কৃষিকে প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করছেন। শিক্ষিত তরুণদের কৃষিক্ষেত্রে পরিকল্পিত উদ্যোগ ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তা : কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তার মধ্যে পার্থক্য আছে। একজন কৃষক তাঁর পণ্য বাজারে বিক্রির চেয়ে পরিবারের চাহিদা মেটানোকে বেশি গুরুত্ব দেন অথবা কিছুটা বিক্রির জন্য এবং কিছুটা পরিবারের চাহিদা মেটাতে ব্যয় করেন। অন্যদিকে, একজন কৃষি উদ্যোক্তার মূল লক্ষ বাজারজাতকরণ ও মুনাফা তৈরি। তাই একজন কৃষি উদ্যোক্তাকে ব্যাবসায়িক মনোবৃত্তির হতে হয় এবং তার কাজে প্রচুর ঝুঁকি থাকে।

কৃষি উদ্যোগের ক্ষেত্রসমূহ : শস্য, প্রাণীসম্পদসহ কৃষি ও কৃষিসংশ্লিষ্ট যে-কোনো বিষয়কে কৃষি উদ্যোগের আওতায় আনা সম্ভব। তবে এক্ষেত্রে উদ্যোক্তাকে অবশ্যই মূলধন, জমির পরিমাণ, মাটির গুণাগুণ, অবকাঠামো, বালাই ব্যবস্থাপনা, লোকবল, পরিবহণ ব্যবস্থা, বাজার ও চাহিদা উৎপাদিত পণ্যের সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করতে হয়। ধান, গম, ডাল, আখ, পাট, ঘাস, শাকসবজি, ফুল, ফল, মসলা, মধু, মাশরুম, রেশম, মাছ প্রভৃতির চাষ ও উৎপাদন; গরু–ছাগল, হাঁস-মুরগি প্রভৃতি প্রাণীসম্পদের লালন-পালন; গাছের চারা, জৈব সার, বায়োগ্যাস, দুধ ও দুধজাত পণ্যের উৎপাদন ও বিপণন ইত্যাদি কৃষি উদ্যোগের আওতাভুক্ত।

কৃষি উদ্যোক্তার করণীয় : একজন কৃষি উদ্যোক্তাকে নিম্নোক্ত করণীয় সম্বন্ধে অবগত থাকা উচিত :

ক. উদ্যোক্তাকে প্রথমেই তার পণ্যের বাজার সম্বন্ধে ভালো ধারণা রাখতে হবে।

খ. প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করে অপচয় ও ব্যয় হ্রাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

গ. একজন কৃষি উদ্যোক্তাকে উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন হতে হয়। কারন, তাঁর এই উদ্ভাবনী বুদ্ধি প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে সাহায্য করবে।

ঘ. কৃষিখাতে উদ্যোক্তাকে অনেক রকমের ঝুঁকি নিতে হয়। এসব ক্ষেত্রে লাভ-ক্ষতি বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ঝুঁকি নিতে হবে এবং ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার সম্ভাব্য প্রস্তুতি রাখতে হবে।

ঙ. উদ্যোক্তা যে ক্ষেত্র নিয়ে কাজ করবেন, সে বিষয়ে যাবতীয় তথ্যের নিয়মিত খোঁজ-খবর রাখা জরুরি। উপযুক্ত খাবার, সার, কীটনাশক, আধুনিক যন্ত্রপাতিসহ প্রযুক্তি সম্বন্ধে ধারণা থাকা দরকার। সম্প্রতি স্মার্টফোন ও ইন্টারনেটের ব্যবহার উদ্যোক্তাদের সাফল্যে ভূমিকা রাখছে।

চ. একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে কয়েকজন উদ্যোক্তা একসঙ্গে কাজ করতে পারেন। এতো বড়ো ধরনের কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হয় এবং ঝুঁকি হ্রাস পায়। তবে অবশ্যই সতর্কতার সঙ্গে অংশীদার নির্বাচন করা উচিত।

ছ. পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ, শ্রমিক ও পণ্য পরিবহণ, বাজার পরিস্থিতি ও প্রতিযোগীদের কথা চিন্তা করে কাজে অগ্রসর হলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

কৃষি উদ্যোক্তাদের জন্য বাংলাদেশ সরকারের কয়েকটি উদ্যোগ : কৃষির উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন :

ক. সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকগুলো কৃষির ধরন অনুযায়ী স্বল্প সুদে বিভিন্ন অঙ্কের ঋণ প্রদান করছে।

খ. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও মৎস্যসম্পদ অধিদপ্তর উদ্যোক্তাদের যে-কোনো প্রয়োজনে পরামর্শ দিয়ে থাকে।

গ. বছরব্যাপী চাষ করার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে 'ডিজিটাল শস্য ক্যালেন্ডার' ও 'বালাইনাশক নির্দেশিকা' দেওয়া আছে, যা ঠিক সময়ে ঠিক ফসল ফলাতে সাহায্য করে। ১৬১২৩ নম্বরে ফোন করে কৃষি সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কৃষি প্রযুক্তি সম্বন্ধে জানাতে 'কৃষি প্রযুক্তি ভান্ডার' নামে একটি মোবাইল অ্যাপ তৈরি করেছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কৃষিদ্রব্যাদির বাজারদর, কৃষকপ্রাপ্ত বাজারদর, সাপ্তহিক ও পাক্ষিক ভিত্তিতে প্রেরণ করে।

উপসংহার : একজন কৃষি উদ্যোক্তা সফল হলে একদিকে যেমন দারিদ্র্য দূরীভূত হয়, অন্যদিকে জাতীয় অর্থনীতি শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা পায়। তবে কৃষি উদ্যোক্তাকে অবশ্যই সততার সঙ্গে কাজ করা উচিত। কারণ তাঁর পণ্য চূড়ান্ত বিচারে খাবারের চাহিদা মেটাবে।

৬. খ. ভূমিকা : গ্রামবাংলার উৎসব মানুষের প্রাণের স্পন্দন। বহুকাল আগে থেকেই আমাদের সমাজে নানা উপলক্ষ্যে উৎসব পালিত হয়ে আসছে। উৎসব আনন্দ-বিনোদনের মাধ্যম। বাঙালির জাতীয় জীবনে সামাজিক উৎসবের প্রভাব অনস্বীকার্য। এটি মানুষের মনকে প্রফুল্ল করে। মানসিক বিকাশে ও আনন্দদানে সামাজিক উৎসব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন সামাজিক উৎসব বাঙালি জাতির চেতনায় মিশে আছে।

উৎসব : সহজ কথায় 'উৎসব' কথাটির অর্থ হলো আনন্দ বা জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান। এটি হলো মানুষের আনন্দ প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। মূলত উৎসব বলতে এমন অনুষ্ঠানকে বোঝায়, যা অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হয়।

উৎসবের ধরন : উৎসবকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়। যেমন– ব্যক্তিগত উৎসব, পারিবারিক উৎসব, সামাজিক উৎসব, ধর্মীয় উৎসব, রাজনৈতিক উৎসব, সাংস্কৃতিক উৎসব, জাতীয় উৎসব, স্মরণোৎসব প্রভৃতি। বিভিন্ন দিবস বা উপলক্ষ্যকে সামনে রেখে মানুষ এসব উৎসব পালন করে থাকে।

সামাজিক উৎসব : বাংলাদেশের প্রধান সামাজিক উৎসব হলো পহেলা বৈশাখ। এরূপ সামাজিক উৎসব বাঙালি জাতির ঐতিহ্যের ধারক। ঐতিহ্যগতভাবে সামাজিক উৎসবে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ অংশ নেয়। বাংলা বছরের প্রথম দিন পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপনে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষ উৎসবে মেতে ওঠে। পহেলা বৈশাখের সাথে মেলার সম্পর্ক সুনিবিড়। এ লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে বৈশাখী মেলা বসে। এ মেলায় আয়োজিত ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প প্রদর্শনী, নাচ, গান, লাঠি খেলা, পুতুলনাচ, সার্কাস প্রভৃতি দর্শকদের আনন্দ দেয়। পহেলা বৈশাখকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রীরা বর্ণাঢ্য বৈশাখী মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন করে। পহেলা বৈশাখের সাথে আরও দুটি অনুষ্ঠান সম্পৃক্ত। একটি হলো পুণ্যাহ এবং আরেকটি হলো হালখাতা। পুণ্যাহ প্রাচীন জমিদারদের খাজনা আদায়ের অনুষ্ঠান। তাই জমিদারি প্রথা না থাকায় এখন এ অনুষ্ঠান বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর হালখাতা অনুষ্ঠান এখনো প্রচলিত আছে। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। পহেলা বৈশাখের হালখাতা অনুষ্ঠানে ব্যবসায়ীরা পুরাতন বছরের হিসেবের খাতা বাদ দিয়ে নতুন বছরের হিসেবের খাতা খোলে। দোকানপাট রঙিন কাগজ দিয়ে অত্যন্ত সুন্দর করে সাজানো হয়। আর ক্রেতাদের মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করা হয় ও বকেয়া টাকা তোলা হয় এ দিনে। এছাড়াও ইংরেজি মাসের প্রথম দিন ইংরেজি নববর্ষ পালন করা হয় উৎসবমুখর পরিবেশে। নবান্ন উৎসব, বসন্তবরণ উৎসব, বর্ষবরণ উৎসব, উপজাতিদের বৈসাবিসহ বিভিন্ন উৎসব আমাদের সংস্কৃতির একটি অংশ। বিয়ে একটি প্রাচীন সামাজিক প্রথা। বিয়েকে কেন্দ্র করে দুটি পরিবারের মধ্যে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এছাড়া পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন সকলের সম্মিলনে একটি প্রাণময় উৎসব হলো বিয়ের অনুষ্ঠান, যা অন্যতম একটি সামাজিক উৎসব।

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক উৎসব : মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের কিছু বিষয় বা ঘটনা নিয়েও বিভিন্ন উৎসব পালন করার রীতি আমাদের সমাজে প্রচলিত রয়েছে। আবার পারিবারিক বিভিন্ন উৎসব; যেমন– বিবাহ, সুন্নতে খাতনা, সন্তানের অন্নপ্রাশন, হিন্দুদের শ্রাদ্ধ, নবান্ন প্রভৃতি উৎসব পারিবারিক পরিবেশে অত্যন্ত জৌলুস করে পালন করা হয়। অনেক পরিবারে অনেকে জাঁকজমকপূর্ণভাবে জন্মদিন পালন করে থাকে। আবার পরিবারের কারও বিয়ে উপলক্ষ্যে সেই বাড়ি বা এলাকা উৎসবমুখর হয়ে ওঠে।

ধর্মীয় উৎসব : বাংলাদেশের প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আবার নিজস্ব বিভিন্ন উৎসব রয়েছে। এদেশের প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায় মুসলমান। মুসলমানদের প্রধান দুটি উৎসব হলো ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা। দীর্ঘ একমাস সিয়াম সাধনার পর মুসলমানরা ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপন করে। আর ঈদুল আজহায় পশু কোরবানি করা হয়। এছাড়াও মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা মহররম, হিজরি নববর্ষ, ঈদ-ই-মিলাদুন্নবি (স), শবে বরাত, শবে কদর প্রভৃতি উৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করে থাকে। হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হলো দুর্গাপূজা। এছাড়াও রয়েছে দোলযাত্রা, জন্মাষ্টমী, চৈত্রসংক্রান্তি, হোলি প্রভৃতি উৎসব। এসব উৎসব অনুষ্ঠানে হিন্দুদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বয়ে চলে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড়ো ধর্মীয় উৎসব বৌদ্ধ পূর্ণিমা। খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড়ো উৎসব যিশুখ্রিষ্টের জন্মদিন বা বড়োদিন। এছাড়া ইস্টার সানডেতেও খ্রিষ্টানরা উৎসব পালন করে থাকে।

সাংস্কৃতিক উৎসব : বাঙালির রয়েছে নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপলক্ষ্যকে সামনে রেখে যে সংস্কৃতির চর্চা করে তা বোঝা যায় বাংলাদেশের পালিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উৎসব দেখে। পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে বইমেলা, বিজ্ঞান মেলা, রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী প্রভৃতি বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সাংস্কৃতিক উৎসব। এছাড়া আলোচনা সভা, জ্ঞানচর্চামূলক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি প্রভৃতিও সংস্কৃতিকে দৃঢ় করে। সংস্কৃতিমনা লোকেরা এসব উৎসব থেকে জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করে। তাছাড়া জাতীয় চিত্রকলা প্রদর্শনী, আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, এশীয় চিত্রকলা প্রদর্শনী, লালন উৎসব, পিঠা উৎসব, ঘুড়ি উৎসব প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নতুন মাত্রা যোগ করে। সাংস্কৃতিক এসব উৎসব গ্রামবাংলার সংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করে দেশকে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারে।

জাতীয় উৎসব : বাংলাদেশের প্রধান জাতীয় উৎসব হলো **২৬শে** মার্চ স্বাধীনতা দিবস ও **১৬ই** ডিসেম্বর বিজয় দিবস। এ দিবস অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে এদেশের মানুষ পালন করে। দল-মত নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষ এসব দিবস উদ্‌যাপনে অংশ নেয়। বাঙালি জাতির জীবনে এসব দিবস পরিণত হয়েছে জাতীয় উৎসবে। এসব উৎসব উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সভা, সমাবেশ, সেমিনার, মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়ে থাকে। তাছাড়াও বিভিন্ন স্থানে মেলা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বিভিন্ন প্রদর্শনীর আয়োজন থাকে। **২১শে** ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায়। দিবসটি বাঙালি জাতির জন্য এক শোকবিধুর দিবস। দিবসটি উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে মাসব্যাপী বইমেলার আয়োজন করা হয়। এ বইমেলা আমাদের জন্য একটি জাতীয় উৎসব। জাতীয় উৎসবগুলো সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়।

উৎসবের অসাম্প্রদায়িক চেতনা : এদেশের সামাজিক উৎসব সম্প্রদায়নিরপেক্ষ চেতনার স্মারক। সুখী ও সমৃদ্ধ দেশগঠনের পূর্বশর্ত হলো অসাম্প্রদায়িক চেতনায় সমাজ গঠন। আর এসব উৎসব মানুষকে সম্প্রদায়নিরপেক্ষ চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। সমাজে বসবাসকারী মানুষ একে অপরের সাথে মিলেমিশে বাস করে। ঈদ উৎসবে মুসলমানরা অন্য ধর্মের বন্ধুবান্ধবদের আমন্ত্রণ জানায়। হিন্দুদের দুর্গাপূজা, সরস্বতী পূজা প্রভৃতি বড়ো বড়ো উৎসবে হিন্দুরা অন্য ধর্মাবলম্বীদের আমন্ত্রণ জানায়। খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধরাও তাদের উৎসবে সবাইকে দাওয়াত করে। এভাবে প্রতিটি ধর্মের লোকেরা পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। আর ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে গড়ে ওঠে ভ্রাতৃত্ববোধ।

উপসংহার : বাংলাদেশে বহু সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান হয়। যে-কোনো উৎসবই আবহমান বাঙালি-সংস্কৃতি ধারণ করে। উৎসবের মধ্যেই আমরা খুঁজে পাই বাঙালি জাতির স্বাধীন সত্তা। তাই জাতীয় জীবনে সামাজিক উৎসবসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৬. গ. **ভূমিকা :** প্রকৃতির রূপ বড়োই বিচিত্র। প্রকৃতি মানুষের জন্য সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করে। আবার এ প্রকৃতিই মানুষের জীবনে দুর্যোগ বয়ে আনে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, খরা, মহামারি ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়, অগণিত মানুষের প্রাণহানি ঘটে এবং সম্পদ বিনষ্ট হয়। মানুষ এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করতে সক্ষম নয়। তবে আগে থেকে সতর্কতা অবলম্বন করলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনতে পারে। নানা কারণে বাংলাদেশে বন্যাসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সৃষ্টি হয়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ কী : দুর্যোগ বলতে আমরা বুঝি, যা মানুষের স্বাভাবিক জীবনকে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করে এবং জানমালের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। আর প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলতে বোঝায় প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক উপাদানের চরম অস্বাভাবিক অবস্থা, যাতে মানবসমাজ বিপর্যস্ত ও দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাই প্রকৃতির অস্বাভাবিক আচরণ বা অবস্থা। বাংলাদেশে হয় এমন প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো–

ঝড় : পৃথিবীর অন্য দেশের মতো বাংলাদেশেও তীব্র বাতাস ও বজ্র বিদ্যুৎসহ ভারী বৃষ্টিপাত ঝড়ের সাধারণ চিত্র। এসময় সমুদ্র থাকে উত্তাল।

ঘূর্ণিঝড় : ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের তীব্রতা হয় অনেক বেশি। কখনো কখনো ঘণ্টায় ২৫০ কিলোমিটার বেগে বয়ে যায়। সমুদ্রে সৃষ্টি হয় জলোচ্ছ্বাসের। প্রতিবছরই এপ্রিল থেকে মে এবং অক্টোবর থেকে নভেম্বরে বাংলাদেশে ছোটো বড়ো ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। প্রবল শক্তিসম্পন্ন এ ঝড়ে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয় চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী, খুলনা, বরিশাল ও পটুয়াখালির উপকূলীয় অঞ্চল এবং সমুদ্রতীরবর্তী দ্বীপসমূহ। ১৯৭০ সালে মেঘনা মোহনায় প্রবল ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে প্রায় তিন লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়, গবাদিপশু ও ফসলেরও ক্ষতি হয় প্রচুর। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে দেড় লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়, প্রায় ছয় শত কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট হয়। ২০০৮ সালে বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে আঘাত হানে শক্তিসম্পন্ন ঘূর্ণিঝড় 'সিডর'। এর ফলে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। বিশ্বের একমাত্র ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

টর্নেডো : বাংলাদেশে টর্নেডো আঘাত হানে সাধারণত এপ্রিল মাসে, যখন তাপমাত্রা সর্বোচ্চ থাকে। এটি স্বল্পকালীন দুর্যোগ, আঘাতও হানে স্বল্প এলাকা জুড়ে। কিন্তু যেখানে আঘাত হানে সেখানে মাত্র দশ-বিশ মিনিটের মধ্যেই ঐ এলাকা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়ে যায়।

কালবৈশাখী ঝড় : কালবৈশাখী সাধারণত এপ্রিল-মে মৌসুমে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বয়ে যায়। এর গতিবেগ সাধারণত ৪০–৬০ কিলোমিটার হয়ে থাকে। ব্যাপ্তিকালও স্বল্প, কখনো কখনো এক ঘণ্টা স্থায়ী হয়। কালবৈশাখী সাধারণত আঘাত হানে শেষ বিকেলের দিকে। মাঝে মাঝে এ ঝড়ের সাথে শিলাবৃষ্টিও হয়।

বন্যা : বাংলাদেশে প্রায় প্রতিবছরই বন্যা হয়। বন্যায় এদেশের এক বিস্তৃর্ণ ভূ-ভাগ প্লাবিত হয়। ঋতুগত কারণে প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে নদ-নদীর পানি বেড়ে যায় এবং নদীর বাঁধ ভেঙে বন্যার সৃষ্টি হয়। এছাড়াও পাহাড়ি ঢল, জলোচ্ছ্বাস ও জোয়ারের কারণে বাংলাদেশে বন্যা দেখা দেয়। বন্যায় প্রাণহানি কম হলেও সম্পদ ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। অনেক গবাদিপশু মারা যায়। বন্যাপরবর্তী সময়ে খাদ্যাভাব এবং নানারকম রোগব্যাধি দেখা দেয়। গৃহহীন হয়ে পড়ে অনেক লোক। বাংলাদেশে ১৯৫৫, ১৯৭৪, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪ ও ২০০৭ সালে সৃষ্ট বন্যায় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। ১৯৭৪ সালে বন্যার পরপরই দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং তাতে প্রায় ত্রিশ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালের বন্যায় মৃতের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যায়। ২০১৮, ২০১৯ সালেও এদেশের কোথাও কোথাও ব্যাপক বন্যা হয়।

নদীভাঙন : বাংলাদেশে প্রতিবছর নদীভাঙনের ফলে বসতভিটা ও ফসলি জমি নদীর বুকে বিলীন হয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ লোক সহায় সম্বলহীন হয়ে গ্রাম থেকে শহরে আশ্রয় নেয়।

ভূমিধস : ভূমিধস পাহাড়ি এলাকায় সংঘটিত হয়। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি প্রভৃতি পাহাড়ি এলাকায় বর্ষা মৌসুমে মাঝে মাঝে পাহাড় ধসে পড়ে। পাহাড়ের কোলঘেঁষে গড়ে ওঠা অনেক ঘরবাড়ি চাপা পড়ে, ঘটে প্রাণহানি। নির্বিচারে ও অনিয়মতান্ত্রিকভাবে পাহাড় কাটার কারণেও ভূমিধস হয়। ভূমিধসের কারণে পাহাড়ি এলাকায় সড়ক যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

ভূমিকম্প : ভূমিকম্প একটি ভয়াবহ ও মারাত্মক প্রাকৃতিক বিপর্যয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশে ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে রয়েছে। বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চল ও আসাম এলাকায় ১৮৯৭ সালে ৮.৭ মাত্রার ভূমিকম্পে প্রায় দেড় হাজার মানুষ মারা যায়। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, এ ধরনের ভূকম্প একই এলাকায় একশ থেকে একশ ত্রিশ বছর পর আবার আঘাত হানতে পারে। এছাড়া প্রতি বছর ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী প্রভৃতি এলাকায় এক বা একাধিক মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

আর্সেনিক দূষণ : ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতিতে বাংলাদেশের মানুষের স্বাস্থ্য মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল বিশেষ করে কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও নারায়ণগঞ্জ জেলার অধিবাসীরা মারাত্মক আর্সেনিক দূষণের শিকার।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতিকার : প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পূর্ণভাবেই প্রাকৃতিক। এ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব নয়। তবে নিম্নোক্তভাবে গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে এর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানো যায় :

১. এদেশের বন্যা সমস্যা মোকাবিলার জন্য উপকূলীয় অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বনায়ন করা এবং নদীর পানি বহন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য নদী খনন করা যেতে পারে।

২. ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস মোকাবিলায় আবহাওয়ার পূর্বাভাসের মাধ্যমে জনগণকে সতর্ক করতে হবে। উপকূলীয় অঞ্চল থেকে লোকজনকে দ্রুত সরিয়ে নিতে হবে নিরাপদ স্থানে। প্রয়োজনে আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে।

৩. ভূমিকম্প হলে তাৎক্ষণিকভাবে কোথায় আশ্রয় নিতে হবে সে সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে হবে। ধ্বংসযজ্ঞ হলে দ্রুত উদ্ধার তৎপরতা চালানোর জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকবল ও আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করতে হবে।

উপসংহার : প্রাকৃতিক দুর্যোগের কাছে মানুষ অসহায়। তবু অদৃষ্টবাদী হয়ে বসে না থেকে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে বন্যার মতো দুর্যোগ মোকাবিলা করা যায়। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করার জন্য রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা যেমন থাকা জরুরি তেমনি ব্যাপক জনসচেতনতারও প্রয়োজন।

যশোর বোর্ড–২০২৪

সেট : ঘ

বাংলা দ্বিতীয় পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 1 0 2

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময় : ৩০ মিনিট | পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. 'চাঁদ' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?
ক) প্রভা খ) শিখা
গ) ইন্দু ঘ) পাথার

২. বাক্যের মধ্যে একাধিক শব্দ দিয়ে গঠিত বাক্যাংশকে কী বলে?
ক) যোজক খ) বর্গ
গ) পদ ঘ) গুচ্ছ

৩. নিচের কোনটি প্রযোজক ক্রিয়ার শর্ত অসমাপিকা ক্রিয়াবিভক্তি?
ক) -আনো (করানো) খ) -ইয়ে (করিয়ে)
গ) -আতে (করাতে) ঘ) -আলে (করালে)

৪. নিচের কোনটি আত্মবাচক সর্বনাম?
ক) কেউ খ) স্বয়ং
গ) উনি ঘ) নিজেরা নিজেরা

৫. সাধারণত গৌণ কর্মে–
ক) 'কে' বিভক্তি হয় খ) 'তে' বিভক্তি হয়
গ) 'এ' বিভক্তি হয় ঘ) 'দ্বারা' বিভক্তি হয়

৬. বিধেয় ক্রিয়ার বিশেষ্য অংশকে কী বলে?
ক) প্রসারক খ) পূরক গ) বর্গ ঘ) গুচ্ছ

৭. কোনটি কারণ যোজকের উদাহরণ?
ক) লাল বা নীল কলমটি আনো।
খ) তাকে আসতে বললাম, তবু এলো না।
গ) বসার সময় নেই, তাই যেতে হচ্ছে।
ঘ) যত পড়ছি, ততই নতুন করে জানছি।

৮. 'লক্ষ্যার্থ'–শব্দের কোন ধরনের অর্থ প্রকাশ করে?
ক) মুখ্য খ) গৌণ গ) প্রত্যক্ষ ঘ) পরোক্ষ

৯. বাক্যের বিধেয় অংশে ক্রিয়া থাকা না থাকা বিবেচনায় বাক্যকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
ক) ৫ ভাগে খ) ৪ ভাগে গ) ৩ ভাগে ঘ) ২ ভাগে

১০. সরল বাক্যে অনেক সময়ে কোনটি অনুপস্থিত থাকে?
ক) বিশেষণ খ) বিশেষ্য গ) সর্বনাম ঘ) ক্রিয়া

১১. বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ কত সালে প্রকাশিত হয়?
ক) ১৮৩৩ সালে খ) ১৯৩৩ সালে
গ) ১৯৫৩ সালে ঘ) ১৯৫৬ সালে

১২. নিচের কোনটি নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জন সন্ধির উদাহরণ?
ক) নিঃ + রোগ = নীরোগ খ) পুরঃ + কার = পুরস্কার
গ) মনো + যোগ = মনোযোগ ঘ) এক + দশ = একাদশ

১৩. মৌলিক স্বরধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময়ে বায়ু–
ক) শুধু মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে।
খ) শুধু নাক দিয়ে বেরিয়ে আসে।
গ) নাক ও মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে।
ঘ) আল জিহ্বায় বাধা পেয়ে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে।

১৪. ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্বের মাঝখানে স্বরধ্বনির আগমন ঘটেছে কোনটিতে?
ক) থকথকে খ) টসটস
গ) কুটকুট ঘ) পাটপট

১৫. 'প্রাচ্য' শব্দের বিপরীত শব্দ হলো–
ক) প্রতীচ্য খ) দুষ্প্রাচ্য গ) প্রতীচী ঘ) সচেষ্ট

১৬. 'আদালত' কোন ভাষার শব্দ?
ক) আরবি খ) ফারসি
গ) ফরাসি ঘ) ওলন্দাজ

১৭. 'পরাবাস্তব' শব্দটিতে 'পরা' উপসর্গটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক) বিপরীত খ) সম্পূর্ণ গ) অতিশয় ঘ) অর্ধেক

১৮. নিচের কোনটি ভাষা পরিবার নয়?
ক) আফ্রিকীয় খ) দ্রাবিড়ীয়
গ) এশীয় ঘ) সেমীয়-হেমীয়

১৯. দন্ত্যমূলীয় ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ কোনটি?
ক) র-ধ্বনি খ) ট-ধ্বনি
গ) ঝ-ধ্বনি ঘ) খ-ধ্বনি

২০. অবজ্ঞা অর্থে কোন শব্দটি ব্যবহার হয়েছে?
ক) কানাই খ) গেঁয়ো
গ) বেতো ঘ) চোরা

২১. গঠন বিবেচনায় ক্রিয়াবিশেষণকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
ক) ৫ ভাগে খ) ৪ ভাগে
গ) ৩ ভাগে ঘ) ২ ভাগে

২২. শব্দের শেষে ই-কার ও উ-কার থাকলে কোন বিভক্তি হয়?
ক) এ খ) য় গ) তে ঘ) য়ে

২৩. 'পাথুরে মূর্তি' এখানে 'পাথুরে' কোন প্রকারের বিশেষণ?
ক) উপাদানবাচক খ) অবস্থাবাচক
গ) বর্ণবাচক ঘ) পরিমাণবাচক

২৪. 'চতুর্ভুজ' শব্দটি কোন সমাসের উদাহরণ?
ক) বহুব্রীহি সমাস খ) তৎপুরুষ সমাস
গ) দ্বন্দ্ব সমাস ঘ) কর্মধারয় সমাস

২৫. 'এখনও' পদের 'ও' হলো–
ক) নির্দেশক খ) বিভক্তি গ) বচন ঘ) বলক

২৬. 'শৃগাল' শব্দের সঠিক উচ্চারণ রূপ কোনটি?
ক) শ্রিগাল খ) সৃগাল গ) স্রিগাল্ ঘ) শৃগাল

২৭. অনুজ্ঞা ভবিষ্যৎ কালের উদাহরণ কোনটি?
ক) তাড়াতাড়ি কাজটি কোরো। খ) আমরা রংপুরে যাব।
গ) এমন ঘটনা ঘটতেই থাকবে। ঘ) আমরা করতে থাকবো।

২৮. সিদ্ধান্ত আবেগ কোনটি?
ক) বাহ, চমৎকার লিখেছ। খ) আহ, কী চমৎকার দৃশ্য।
গ) বেশ, তবে যাওয়াই যাক। ঘ) আহা! বেচারার এত কষ্ট।

২৯. সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া যুক্ত হয়ে যে ক্রিয়া গঠন করে তাকে কী বলে?
ক) সরল ক্রিয়া খ) নামক্রিয়া
গ) সংযোগ ক্রিয়া ঘ) যৌগিক ক্রিয়া

৩০. বাংলা কাব্যরীতি কয় ভাগে বিভক্ত?
ক) ২ ভাগে খ) ৩ ভাগে গ) ৪ ভাগে ঘ) ৫ ভাগে

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

যশোর বোর্ড–২০২৪

বাংলা দ্বিতীয় পত্র (রচনামূলক প্রশ্ন)

সেট : ০৩ **বিষয় কোড : 1 0 2**

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। উত্তর প্রাসঙ্গিক ও যথাযথ হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

১। যে-কোনো একটি বিষয়ে অনুচ্ছেদ লেখো : ১০

(ক) কম্পিউটার

(খ) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

২। (ক) মনে করো, তুমি পলাশ। সড়ক দুর্ঘটনা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় এর প্রতিকারের দাবি জানিয়ে পত্রিকায় প্রকাশের উপযোগী একটি চিঠি লেখো। ১০

অথবা,

(খ) মনে করো, তুমি রিয়াদ। তুমি অনন্তপুর গ্রামে বাস করো। তোমার এলাকায় পাঠাগার স্থাপনের জন্য চেয়ারম্যান বরাবর একটি আবেদনপত্র লেখো।

৩। (ক) সারাংশ লেখো : ১০

মাতৃস্নেহের তুলনা নাই; কিন্তু অতি স্নেহ অনেক সময় অমঙ্গল আনয়ন করে। যে স্নেহের উত্তাপে সন্তানের পরিপুষ্টি, তাহারই আধিক্যে সে অসহায় হইয়া পড়ে। মাতৃস্নেহের মমতার প্রাবল্যে মানুষ আপনাকে হারাইয়া আসল শক্তির মর্যাদা বুঝিতে পারে না। নিয়ত মাতৃস্নেহের অন্তরালে অবস্থান করিয়া আত্মশক্তির সন্ধান সে পায় না–দুর্বল, অসহায় পক্ষিশাবকের মতো চিরদিন স্নেহাতিশয্যে আপনাকে সে একান্ত নির্ভরশীল মনে করে। ক্রমে জননীর পরম সম্পদ সন্তান অলস, ভীরু, দুর্বল ও পরনির্ভরশীল হইয়া মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ হইতে দূরে সরিয়া যায়। অন্ধ মাতৃস্নেহ সে কথা বোঝে না–দুর্বলের প্রতি সে স্থিরলক্ষ্য, অসহায় সন্তানের প্রতি মমতার অন্ত নাই–অলসকে সে প্রাণপাত করিয়া সেবা করে–ভীরুতার দুর্দশার কল্পনা করিয়া বিপদের আক্রমণ হইতে ভীরুকে রক্ষা করিতে ব্যস্ত হয়।

অথবা,

(খ) সারমর্ম লেখো :

শৈশবে সদুপদেশ যাহার না রোচে,
জীবনে তাহার কভু মূর্খতা না ঘোচে।
চৈত্র মাসে চাষ দিয়া না বোনে বৈশাখে,
কবে সেই হৈমন্তিক ধান্য পেয়ে থাকে?
সময় ছাড়িয়া দিয়া করে পণ্ডশ্রম,
ফল চাহে, –সেও অতি নির্বোধ, অধম।
খেয়া-তরী চলে গেলে বসে এসে তীরে,
কিসে পার হবে, তরি না আসিলে ফিরে?

৪। যে-কোনো একটি বিষয়ে ভাব-সম্প্রসারণ করো : ১০

(ক) বার্ধক্য তাহাই–যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃত্যুকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে।

(খ) গ্রন্থগত বিদ্যা আর পর হস্তে ধন,
নহে বিদ্যা নহে ধন হলে প্রয়োজন।

৫। (ক) মনে করো, তুমি আফিফ। একটি দৈনিক পত্রিকার রাজশাহী প্রতিনিধি। তোমার এলাকায় বৃক্ষরোপণ বিষয়ক একটি সংবাদ প্রতিবেদন তৈরি করো। ১০

অথবা,

(খ) মনে করো, তুমি সুমন। তুমি একটি দৈনিক পত্রিকার কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি। তোমার বিদ্যালয়ের নবীনবরণ ও বিদায়-সংবর্ধনা অনুষ্ঠান সম্পর্কে সংবাদ প্রতিবেদন তৈরি করো।

৬। যে-কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করো : ২০

(ক) কৃষিকাজে বিজ্ঞান

(খ) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

(গ) সময়ানুবর্তিতা।

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	গ	২	খ	৩	ঘ	৪	খ	৫	ক	৬	খ	৭	গ	৮	খ	৯	ঘ	১০	ঘ	১১	ক	১২	ঘ	১৩	ক	১৪	ঘ	১৫	ক
	১৬	ক	১৭	গ	১৮	গ	১৯	ক	২০	ঘ	২১	ঘ	২২	গ	২৩	ক	২৪	ক	২৫	ঘ	২৬	গ	২৭	ক	২৮	গ	২৯	ঘ	৩০	ক

রচনামূলক

১. ক. কম্পিউটার ইংরেজি ভাষার শব্দ। এটি ল্যাটিন শব্দ কমপুটেয়ার (Computare) থেকে উৎপত্তি হয়েছে; যার ইংরেজি অর্থ কম্পিউট (Compute) বা গণনা করা। সে হিসেবে কম্পিউটারের অর্থ গণনাকারী যন্ত্র। কিন্তু বর্তমানে কম্পিউটার শুধু গণনাকারী যন্ত্র নয়। এটি বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। কম্পিউটার একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র যা মানুষের দেওয়া তথ্য যুক্তিসঙ্গত নির্দেশের ভিত্তিতে অতি দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে গণনার কাজ করে তার সঠিক ফলাফল প্রদান করতে পারে। কম্পিউটারের ব্যাপক ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে– মুদ্রণ করা, লেখাপড়া করা, তথ্য সংরক্ষণ করা, খেলা করা, গান শোনা, সিনেমা দেখা, টেলিফোন করা, দেশ-বিদেশের সাথে তথ্য আদান-প্রদান করা ইত্যাদি। ব্যাপক ব্যবহারের ফলে আধুনিক জীবনে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যন্ত্র এটি। বৈদ্যুতিক কম্পিউটারগুলো দুধরনের হয়ে থাকে। যথা : ১. এনালগ, ২. ডিজিটাল। এনালগ কম্পিউটার ফিজিক্যাল গুণাবলি নিয়ন্ত্রণ করে এবং ডিজিটাল কম্পিউটারগুলো সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে। মূলত কম্পিউটার মানুষের মস্তিষ্কের বিকল্প হিসেবে মানবকল্যাণে অনেক কাজ করে চলছে এবং মানুষের শক্তি ও সময়ের অপচয় রোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। সংসার খরচের হিসাব বা বাচ্চাদের গেম থেকে শুরু করে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করে এটি। তাই কম্পিউটার আমাদের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে জাতীয় জীবনে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। মানুষ ক্রমেই কম্পিউটার নির্ভর হয়ে পড়ছে।

১. খ. একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির জাতীয় জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ একটি দিন। অমর একুশে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। আর এ স্বীকৃতির মাধ্যমে বাঙালি এখন বিশ্বসভায় গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার ঐতিহাসিক দিন এটি। দিবসটির রয়েছে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর ক্ষমতালিপ্সু পাকিস্তান সরকারের হীন মানসিকতার প্রকাশ ঘটে। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ "Urdu and urdu will be the only state language of Pakistan." ঘোষণা দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার ছাত্রসমাজ তীব্র প্রতিবাদ করে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাদানে আত্মপ্রত্যয়ী ছাত্রসমাজ ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবেশের উদ্দেশে যাত্রা করে ঢাকা মেডিকেল কলেজের কাছাকাছি এলে সরকারের নির্দেশে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। এতে রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার, শফিউরসহ নাম না-জানা অনেকে শহিদ হন। অবশেষে ছাত্রজনতার আন্দোলনের মুখে পাকিস্তান সরকার বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে সরকার বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর প্যারিস বৈঠকে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক শাখা ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা' দিবসরূপে ঘোষণা করে। শহিদদের আত্মত্যাগের স্মৃতিকে স্মরণ করে ইউনেস্কোর এই ঘোষণা বাঙালির আরেক বিজয়। ২০০০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সারা বিশ্বে প্রথম 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালিত হয়। আর এভাবে আমাদের মায়ের ভাষা বাংলা এখন দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্ব আসনে প্রতিষ্ঠিত।

২. ক.

১৩ই মে, ২০২...
বরাবর
সম্পাদক,
দৈনিক সমকাল,
৩৮৭, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।
বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি আপনার পত্রিকায় প্রকাশের আবেদন।
জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত 'দৈনিক সমকাল'-এ চিঠিপত্র কলামে নিম্নলিখিত পত্রটি প্রকাশ করলে বাধিত থাকব।
বিনীত
পলাশ চৌধুরী
ঘিওর, মানিকগঞ্জ।

সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিকার চাই

'একটি দুর্ঘটনা, সারা জীবনের কান্না'– স্লোগানটি নির্মম বাস্তবতানির্ভর। ইদানীং সড়ক দুর্ঘটনা আমাদের দেশে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই সংঘটিত হচ্ছে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা। প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললে একটি না একটি সড়ক দুর্ঘটনার খবর চোখে পড়ে। এ ধরনের দুর্ঘটনা যেন দিন দিন বেড়েই চলছে, যার ফলে বহু পরিবার সর্বনাশের সম্মুখীন হচ্ছে। কত মা-বাবা তার সন্তান হারিয়েছে। কত সদ্যবিবাহিতাকে বিধবা-জীবন বরণ করতে হচ্ছে। কত পিতাকে যে পুত্রের লাশ বহন করতে হচ্ছে। দিন দিন মানুষের জীবন অনিরাপদ হয়ে পড়ছে। একথা সত্য যে, 'জন্মিলে মরিতে হবে।' কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুকে মেনে নেওয়া যায় না।

সাধারণত আমাদের দেশে সড়ক দুর্ঘটনা কয়েকটি কারণ হলো– ত্রুটিযুক্ত গাড়ি, অনভিজ্ঞ বা মাদকাসক্ত ড্রাইভার, ধারণ ক্ষমতার অধিক মাল বা যাত্রী বহন, ওভারটেকিং বা চালকের দায়িত্বহীনতা, ট্র্যাফিক আইন না মানার প্রবণতা ইত্যাদি। এসব সমস্যা সমাধানে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যেমন– পরিবহণ সংশ্লিষ্ট সবাইকে যানবাহন বিধি ও আইন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া, রাস্তা সংস্কার, ট্র্যাফিক ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মিডিয়াগুলোতে সড়ক দুর্ঘটনা সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রচারের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

আশা করি, উপরিউক্ত কারণগুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করলে সড়ক দুর্ঘটনা অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব হবে।

নিবেদক
পলাশ চৌধুরী

২. খ.

৫ই জুন, ২০২...
বরাবর
চেয়ারম্যান
রায়পুরা ইউনিয়ন পরিষদ, নরসিংদী

বিষয় : পাঠাগার স্থাপনের জন্য আবেদন।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা নরসিংদী জেলার অন্তর্গত রায়পুরা ইউনিয়নের অনন্তপুর গ্রামের অধিবাসী। এ গ্রামের লোকসংখ্যা প্রায় ছয় হাজার। গ্রামে শিক্ষিতের হার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখানে একটি বড়ো গ্রাম্য বাজার ও নানা ছোটো শিল্প কারখানা, স্কুল, মাদরাসা, একটি ক্লাবঘর ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, জ্ঞানপিপাসু ছেলেমেয়েদের জ্ঞানপিপাসা মেটানোর জন্য উক্ত অঞ্চলে বা তার আশেপাশে কোনো পাঠাগার নেই। ফলে জ্ঞানার্জন তথা শিল্পসাহিত্যে সময় ব্যয় করার মতো কোনো মাধ্যম নেই। গ্রামে উঠতি বয়সি যুবক ছেলেরা নানা রকম আড্ডাবাজিতে সময় নষ্ট করে। এতে কেউ কেউ বিপথগামীও হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই গ্রামে একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ইতঃপূর্বে এ ব্যাপারে কয়েকবার আবেদন নিবেদন করেও কোনোপ্রকার সাড়া পাওয়া যায়নি।

এমতাবস্থায়, মহোদয়ের কাছে বিনীত অনুরোধ যে, এই গ্রামের বাজারে একটি পাঠাগার স্থাপন করে বাধিত করবেন।

নিবেদক
অনন্তপুর গ্রামবাসীর পক্ষে
রিয়াদ মাহবুব
রায়পুরা ইউনিয়ন পরিষদ, নরসিংদী

৩. ক. মাতৃস্নেহ অতুলনীয় এবং সন্তানের পরিপুষ্টির সহায়ক। তবে অতিরিক্ত স্নেহ কখনো কখনো সন্তানের জন্য অকল্যাণ বয়ে আনে। ফলে সে পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ হতে দূরে সরে যায়।

৩. খ. সময়ের কাজ সময়ে করতে হয়। সময়মতো কাজ না করলে তাতে কোনো লাভও হয় না। যে সময় চলে যায় তা ফিরে আসে না। কাজেই যথাসময়ে সব কাজ সম্পাদন করা উচিত। নইলে পরে অনুশোচনা করতে হয়।

৪. ক. কেবল বয়সের মাপকাঠিতে তারুণ্য বা বার্ধক্যকে বিচার করা যায় না। দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ও কর্মস্পৃহার তারতম্য মানুষকে তরুণ ও বৃদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করে।

মানুষ শৈশব, কৈশোর, তারুণ্য ও যৌবন পেরিয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয়। এ বার্ধক্য ব্যক্তির নানা ধরনের শারীরিক সক্ষমতা হ্রাস করতে পারে ঠিকই, কিন্তু সবাইকে মানসিকভাবে জরাগ্রস্ত করতে পারে না। এদের কর্মশক্তি ও মানসিক-শক্তি অনেক তরুণকে হার মানায়। পক্ষান্তরে, এমন অনেক তরুণ রয়েছে – যারা নতুনকে গ্রহণ করতে পারে না, অন্ধবিশ্বাস ও গতানুগতিক চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকে, সত্যকে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়। তারা আসলে তারুণ্যের খোলসে বার্ধক্যকে লালন করে। আর যেসব বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয়, ইতিবাচক ভাবনায় জীবনকে পরিচালিত করে, তারা প্রকৃতপক্ষে তারুণ্যের অমিতশক্তি ধারণ করে। তরুণরা সব সময়ে আলোর পথের যাত্রী। কঠিন সত্যকে মেনে নিয়ে তারা নতুন ইতিহাস রচনা করতে পারে। যুক্তির আলোয় কুসংস্কারকে বাতিল করে তারা প্রতিষ্ঠা করে নতুন সত্য। তারা ধ্বংস ও মৃত্যুকে পিছনে ফেলে সৃষ্টির আনন্দে এগিয়ে যায়। তারুণ্যের এই বোধ ও অনুভূতি যে-কোনো বয়সের মানুষের মধ্যে থাকতে পারে। প্রকৃত বৃদ্ধ তারা, যারা তারুণ্যের দুঃসাহসিক অভিযানে অংশ নিতে চায় না, সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তনকে অস্বীকার করে, নতুন সূর্যের আলোয় অস্বস্তি বোধ করে। তারা তারুণ্যের অগ্রযাত্রায় অংশ নেওয়ার পরিবর্তে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। বার্ধক্যের পরিচয় বয়সে নয়, পশ্চাদ্‌মুখী দৃষ্টিভঙ্গিতে।

৪. খ. বিদ্যা ও ধন এ দুটো মানুষের জীবনে খুবই প্রয়োজন। কিন্তু এ বিদ্যা ও ধনের সার্থকতা নির্ভর করে মানুষের প্রয়োজন মেটানোর ওপর। প্রয়োজনের মুহূর্তে কাজে না লাগলে এ দুটোর কোনো মূল্য নেই।

গ্রন্থের সাহায্যে আমরা বিদ্যার্জন তথা জ্ঞানলাভ করে থাকি। কিন্তু অর্জিত বিদ্যার ব্যাবহারিক প্রয়োগ না শিখলে তা অর্থহীন হয়ে যায়। গ্রন্থের মধ্যে বিদ্যা লিখিত আছে। গ্রন্থ সংগ্রহ করে পাঠ করলে তা অর্জন করা যায়। কিন্তু শুধু পুথিগত বিদ্যা কোনো কাজে আসে না। তাকে ব্যাবহারিক জীবনে প্রয়োগ করতে পারলেই সার্থক হয়। পৃথিবীতে প্রচুর ধনসম্পদ রয়েছে। পরিশ্রম করলেই তা উপার্জন করা যায়। পৃথিবীতে বাঁচতে হলে ধনসম্পদের প্রয়োজন হয়। পরিশ্রম করে তা উপার্জন না করলে প্রয়োজনের সময় পাওয়া যায় না। সুদিনে অনেক বন্ধু পাওয়া গেলেও দুর্দিনে কাউকে পাওয়া যায় না। গ্রন্থাগারে প্রচুর গ্রন্থ থাকলেই চলে না। তাদের মধ্যে যেসব জ্ঞানের বিষয় আছে, সেগুলোকে ব্যাবহারিক জীবনে প্রয়োগ করতে না পারলে কোনোই প্রয়োজন মেটে না। নিজের জন্য সঞ্চিত না রেখে ধনসম্পদ পরের হাতে তুলে দিলেও প্রয়োজনের সময় ফিরে পাওয়া যায় না। যে প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিদ্যা ও ধনসম্পদ অর্জন করা হয়, তা যদি যথাসময়ে পাওয়া না যায়, তাহলে তার কোনো মূল্য নেই। যে জ্ঞান কোনো ব্যাবহারিক জীবনে প্রয়োগ করা যায় না, সে জ্ঞান দ্বারা নিজে যেমন উপকৃত হয় না; জগতেরও কোনো কল্যাণ সাধিত হয় না। তাই আমাদের উচিত, অর্জিত বিদ্যাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা এবং জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করা।

ধন মানুষের অতীব প্রয়োজনীয় জিনিস। ধন অর্জন করে কেউ যদি অপরের নিকট রেখে দেয়, তাহলে প্রয়োজনের সময় তা পাওয়া যায় না। তেমনি বিদ্যাও যদি কেবল গ্রন্থের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে তা জীবনের কোনো কাজে লাগে না।

৫. ক.

রাজশাহীতে বৃক্ষমেলা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব সংবাদদাতা, রাজশাহী, ১৪ই জুলাই, ২০২... : ১০ই জুন থেকে রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল মাঠে সপ্তাহব্যাপী বৃক্ষমেলা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন স্থান থেকে আসা প্রায় ৬৫টি স্টল মেলায় অংশগ্রহণ করে। স্থানীয়ভাবে মানুষের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে এ মেলা। মেলায় ছিল মানুষের উপচে-পড়া ভিড়। শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণিসহ সব বয়স এবং সব শ্রেণি-পেশার মানুষ এ মেলায় অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন স্টল ঘুরে ঘুরে দেখেন। মেলায় প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা বিক্রি হয়।

মেলা উপলক্ষ্যে প্রতিদিন বিকালবেলা আলোচনা সভা ও সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদ্দীপনামূলক ও গণসংগীতের ব্যবস্থাও ছিল মেলায়। মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উপপরিচালক জনাব আলি ইদ্রীস সুজন। আলোচনায় অংশ নেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. ইফতেখারুল আমীন, জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি জামিল হোসেন এবং উপজেলা কৃষি অফিসার মামুন সরোয়ার। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন রাজশাহী জেলাপ্রশাসক ইয়াসিন মোল্লা।

বক্তাগণ বলেন যে, আমাদের দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা দরকার। কিন্তু রয়েছে মাত্র ১৬ শতাংশ। দেশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে ৩০ শতাংশ বনভূমি গড়ে তোলার পরিকল্পনা করে সে মোতাবেক অগ্রসর হতে হবে। বক্তাগণ প্রত্যেককে অন্তত তিনটি করে চারাগাছ লাগানোর জন্য আহ্বান জানান। তাহলে আমাদের দেশে অতিরিক্ত প্রায় ৬০ কোটি গাছ লাগানো সম্ভব হবে; যা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। মেলায় সমাপনী দিনে শ্রেষ্ঠ স্টলের পুরস্কার প্রদান করা হয়। শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করে সবুজায়ন নার্সারি।

৫. খ.

কুড়িগ্রাম জিলা স্কুলে নবীনবরণ ও বিদায়-সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

গত ২৩শে জানুয়ারি, ২০২... তারিখে কুড়িগ্রাম জিলা স্কুলে নবীনবরণ ও বিদায়-সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ এ্যাডভোকেট ইসলাম উদ্দীন খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মনিরুজ্জামান মনির। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবুল আহাদ। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করে স্ব স্ব ধর্মের অনুসারী শিক্ষার্থীরা। তারপর শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ওই অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ও বাংলা বিষয়ের শিক্ষক সরোজ মোস্তফা। এরপর শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে বক্তব্য দেওয়া শুরু হয়। বক্তব্য প্রদান করে বিজ্ঞান বিভাগের বিদায়ী শিক্ষার্থী অপু ও মিতু, মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থী রিফাত ও আবিদ এবং ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের নবীন শিক্ষার্থী হাসান ও রফিক। এসময় এক আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। অনেকে তাদের দীর্ঘদিনের ছাত্রজীবনের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে চোখ অশ্রুসজল করে ফেলে। অনেকে আবার স্কুলজীবনের মজার স্মৃতিগুলো সবার সামনে তুলে ধরে। শিক্ষকরা খুব মন দিয়ে নবীন ও বিদায়ী শিক্ষার্থীদের কথা শোনেন। বিশেষ অতিথি শিক্ষার্থীদের নির্ভীকভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পরামর্শ দেন। প্রধান অতিথি শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মানুষ হওয়ার দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের ভালো ফল প্রত্যাশা করেন। এরপর অতিথিরা স্মারক হিসেবে শিক্ষার্থীদের হাতে ক্রেস্ট ও শুভেচ্ছা উপহার তুলে দেন। স্কুলের মাঠে নবীন ও বিদায়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে নাস্তা পরিবেশন করা হয়।

এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিদায়ী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নবাগত শিক্ষার্থীদের একটি সেতুবন্ধ রচিত হয়। তাছাড়া শিক্ষকদের সঙ্গেও শিক্ষার্থীদের একটি উষ্ণ ভাববিনিময় হয়। ভবিষ্যতে এই স্মৃতিগুলো শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক প্রেরণা জোগাবে।

প্রতিবেদকের নাম ও ঠিকানা : সুমন, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি
প্রতিবেদনের শিরোনাম : কুড়িগ্রাম জিলা স্কুল নবীনবরণ ও বিদায়-সংবর্ধনা
প্রতিবেদনের ধরন : বিশেষ প্রতিবেদন
প্রতিবেদন রচনার তারিখ ও সময়: ২৫শে জানুয়ারি, ২০২...; রাত ৯টা।

৬. ক. **ভূমিকা :** সভ্যতার ক্রম পরিবর্তনে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা পালন করেছে বিজ্ঞান। বর্তমান বিশ্বে মানুষের যে অগ্রযাত্রা তা বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। বিজ্ঞান মানুষকে গতিশীল করেছে এবং সভ্যতার অগ্রযাত্রাকে করেছে ত্বরান্বিত। বর্তমানে কৃষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূত্র বিজ্ঞানই আবিষ্কার করেছে। কৃষিকাজে বিজ্ঞানের অবদান অপরিসীম।

মানবসভ্যতা ও কৃষি : মানব সভ্যতার ইতিহাস অত্যন্ত পুরোনো। আর সেই সভ্যতার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কৃষির হাত ধরেই। মানুষ শিকারের বিকল্প হিসেবে কৃষিকে বেছে নিয়ে তার জীবনকে গতিশীল ও উন্নত করেছিল। তাই এটি মানুষের আদিমতম জীবিকার একটি পেশাও বটে। সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায় যে, কৃষিতে যে দেশ যত তাড়াতাড়ি অগ্রগতি সাধন করতে পেরেছে, সে দেশ তত তাড়াতাড়ি সভ্যতার উপরের সিঁড়িকে অতিক্রম করেছে। এ থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, কৃষির উন্নতিতেই সমাজ, দেশ ও সভ্যতার ক্রমোন্নতি সম্ভব হয়।

মানবজীবনে কৃষির গুরুত্ব : কৃষি মানুষের অস্তিত্বের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। মানবজীবন ও মানবসমাজে এর গুরুত্ব অপরিসীম। জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে এটি মানুষের আদিমতম জীবিকার উপায়। দেশে দেশে কৃষিই সমাজের মেরুদণ্ড, কৃষিই সমাজের ভিত্তি। স্বভাবতই কৃষির ক্রমোন্নতিতেই সমাজের ও দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি। এই উন্নতিতে অনন্য ও অভাবনীয় ভূমিকা রেখেছে বিজ্ঞান। আজকের বিশ্বে প্রতিটি ক্ষেত্রের মতো কৃষিক্ষেত্রেও বিজ্ঞানই আজ বাড়িয়ে দিয়েছে তার সুদূরপ্রসারী কল্যাণী হাত।

কৃষিকাজে বিজ্ঞান : মানুষ খাদ্যের জন্য কৃষির ওপর নির্ভরশীল। আজ বিজ্ঞানের প্রভাবে কৃষিকাজ আদিম স্তর কাটিয়ে আধুনিক স্তরে পৌঁছেছে। পানি সেচের ব্যবস্থা, উন্নত ধরনের বীজ, বীজ বপন, ফসল কাটা ও মাড়াই, ভূমি সংরক্ষণ ইত্যাদির প্রভূত উন্নতি কৃষিবিজ্ঞানেরই আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর মেশিনের অবদান। পৃথিবীতে আজ জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু ফসলি জমির পরিমাণ সীমিত। এ সীমিত কর্ষণযোগ্য জমিতে বিজ্ঞানের সহায়তায় নতুন বীজ আবিষ্কার, নতুন পদ্ধতি প্রয়োগে মানুষ ক্ষুধার্তের অন্ন সংগ্রহের প্রয়াস চালাচ্ছে।

বিভিন্ন দেশে কৃষিকাজে বিজ্ঞান : উন্নত দেশগুলোর কৃষিব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিজ্ঞাননির্ভর। জমিতে বীজ বপন থেকে শুরু করে ঘরে ফসল তোলা পর্যন্ত সমস্ত কাজেই রয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়া। বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক কৃষিযন্ত্র, যেমন– মোয়ার (শস্য-ছেদনকারী যন্ত্র), রপার (ফসল কাটার যন্ত্র), বাইন্ডার (ফসল বাঁধার যন্ত্র), থ্রেশিং মেশিন (মাড়াইযন্ত্র), ম্যানিউর স্প্রেডার (সার বিস্তরণ যন্ত্র) ইত্যাদি উন্নত দেশগুলোর কৃষিক্ষেত্রে এনেছে বৈপ্লবিক সাফল্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের খামারে একদিনে ১০০ একর পর্যন্ত জমি চাষ হচ্ছে কেবল এক-একটি ট্রাক্টরের মাধ্যমে। সেগুলো আবার একসাথে তিন-চারটি ফসল কাটার যন্ত্রকে একত্রে কাজে লাগাতে সক্ষম। তারা বিভিন্নভাবে কৃষিকাজের এমন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করছে যার ফলে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তারা কৃষিকাজে ব্যাপকভাবে অগ্রগামী। যেমন বলা যায় জাপানের কথা। জাপানে জমির উর্বরাশক্তি বাংলাদেশের তুলনায় কম। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে তারা বাংলাদেশের তুলনায় ৬ গুণ বেশি ফসল উৎপাদন করছে। শীতপ্রধান দেশে 'শীত নিয়ন্ত্রণ' ঘর বানিয়ে শাকসবজি এবং ফলমূল সংরক্ষণ করছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে বর্তমানে শুষ্ক মরুভূমির মতো জায়গাতে সেচ, সার ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় চাষাবাদ করে সোনার ফসল ফলানো সম্ভব হচ্ছে। এভাবে বিজ্ঞান কৃষিকাজে এক যুগান্তকারী বিপ্লব সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশের কৃষিকাজে বিজ্ঞান : আমাদের দেশেও এখন কৃষিকাজে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে জমি খণ্ডবিখণ্ড হচ্ছে। এই খণ্ডবিখণ্ডতার কারণে জমি কর্ষণে ব্যাপকভাবে ট্রাক্টর ব্যবহার করা যাচ্ছে না। তবে মানুষ এখন আর চাতকের ন্যায় বৃষ্টিধারার জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে না। সেচের জন্য এখন ব্যবহার করা হয় গভীর নলকূপ এবং মেশিনচালিত পাম্প। বপনের জন্য ব্যবহার করা হয় উন্নত ধরনের বীজ। বীজ সংরক্ষণে সাহায্য নেওয়া হয় বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির। বর্তমানে রাসায়নিক সার ব্যবহার করে ফসল উৎপাদনের মাত্রা বাড়ানো হচ্ছে। আগে যে জমিতে একধরনের ফসল হতো, বিজ্ঞানের সাহায্যে এখন সেখানে তিন ধরনের ফসল হয়। ধানের চারা রোপণ, ধান কাটা ও ধান মাড়াইয়ের আধুনিক যন্ত্রপাতি বাংলাদেশে বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে আমাদের দেশের কৃষিকাজ এখনো সম্পূর্ণ যান্ত্রিক করা সম্ভব হয়নি। চাষাবাদে বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারলে আমাদের খাদ্য সমস্যা সমাধান করা যাবে এবং বিদেশেও রপ্তানি করা যাবে।

বিজ্ঞানসম্মত কৃষির গুরুত্ব : আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কৃষির বাস্তবিক গুরুত্ব অনেকখানি। তবে পুরোনো পদ্ধতির চাষাবাদে বর্তমানে আর সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। এখন প্রয়োজন অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ। উন্নত বিশ্বের মতো ছোটো জায়গায় অধিক ফসল ফলানোর কৌশল আমাদেরও আয়ত্ত করতে হবে। তবেই কৃষক ও কৃষির সমন্বিত সাফল্য ত্বরান্বিত হবে।

বৈজ্ঞানিক কৃষি ও অর্থনীতি : বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষিকাজের ফলে অর্থনীতির অগ্রগতি সাধিত হওয়া সম্ভব। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, আমরা এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি। আমরা নিজেদের উৎপাদিত ফসল বাইরেও রপ্তানি করতে সমর্থ হচ্ছি। জীবনরহস্য আবিষ্কারের ফলে পাটের সোনালি দিন আবার আমাদের মধ্যে আসতে শুরু করেছে। বহু আগে থেকেই আমরা বিভিন্ন দেশে চা রপ্তানি করে আসছি। সুতরাং সর্বাধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদের ফলে আমাদের পক্ষে এ সাফল্যকে আরও ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

উপসংহার : কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞানের জাদুর ছোঁয়ায় অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। কেননা বিজ্ঞানকে আমরা যত কাজে লাগাতে পারব, ততই আমাদের কৃষিতে অপার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। তাই সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায় থেকেই বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদে কৃষককে উৎসাহিত করা আবশ্যক এবং সহযোগিতার হাতকে প্রসারিত করা একান্ত কর্তব্য।

৬. খ. **ভূমিকা :** বাঙালির আবহমান কালের ইতিহাসে এক মাইলফলক স্বাধীনতা যুদ্ধ। এক মহিমান্বিত ইতিহাস রচিত হয়েছে এই ১৯৭১ সালে। রক্ত, অশ্রু, আর অপরিসীম আত্মত্যাগের ভেতর দিয়ে একাত্তরে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীনতা। আর বীরত্বপূর্ণ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে অভ্যুদয় হয়েছে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের। মুক্তিযুদ্ধ তাই আমাদের জাতীয় জীবনে এক অহংকার, গৌরবের এক মহান বিজয়গাথা।

মুক্তিযুদ্ধের সূচনা : গণ-আন্দোলনের মুখে জেনারেল আইয়ুব খানের পদত্যাগের পর জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৬৯ সালে পুনরায় সামরিক শাসন জারি করেন। তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করেই ঘোষণা করলেন, শীঘ্রই সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে সামরিক বাহিনী ব্যারাকে ফিরে যাবে। ইয়াহিয়া খানের ঘোষণানুযায়ী ১৯৭০ সালের ১৭ই ডিসেম্বরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টিতে এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩৯০টি আসনের মধ্যে ২৯৮টি আসনে জয়ী হয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। নির্বাচনের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে ইয়াহিয়া খান গড়িমসি শুরু করেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ভুট্টোর পরামর্শে ১৯৭১ সালের তেসরা মার্চ জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনের তারিখ ঘোষণা করেন। ইত্যবসরে জুলফিকার আলী ভুট্টো এসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলাপ-আলোচনা করে পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যান। কিন্তু ইয়াহিয়া খান হঠাৎ পহেলা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন।

অসহযোগ আন্দোলন : ইয়াহিয়া খানের পহেলা মার্চের ঘোষণায় পূর্ব পাকিস্তানের জনতা হতবাক হয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনার জন্য ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক ঐতিহাসিক জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন–

- সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে।
- অবিলম্বে সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে।
- সামরিক বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার করতে হবে।
- জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের পূর্বেই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

এ আহ্বানে সকল অফিস আদালত, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায় এবং স্বাধীনতা আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে।

আলোচনার নামে প্রহসন : ১৫ই মার্চ ইয়াহিয়া খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকায় এসে ১৬ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে বৈঠকে বসেন। দীর্ঘ দশ দিন পর্যন্ত আলোচনা চলে। এ আলোচনা ছিল প্রহসন মাত্র। এ বৈঠকের আড়ালে তারা কালক্ষেপণ করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ আনতে থাকে।

তীব্র আন্দোলন শুরু ও গণপ্রতিরোধ : আলোচনার নামে এরূপ প্রহসনের বিরুদ্ধে তীব্র গণ-আন্দোলন শুরু হলে সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান এ আন্দোলন চিরতরে স্তব্ধ করার লক্ষ্যে ২৫শে মার্চ গভীর রাতে জনগণের ওপর সেনাবাহিনী লেলিয়ে দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে পাড়ি জমান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘুমন্ত জনগণের ওপর সেনাবাহিনীর অতর্কিত হামলায় ঢাকা শহর ভয়াল মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়।

স্বাধীনতা ঘোষণা : ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এ ঘোষণার সাথে সাথেই সর্বত্র সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হয়।

অস্থায়ী সরকার গঠন : ১০ই এপ্রিল পূর্ব বাংলার নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্যরা মুজিবনগরে এক অধিবেশনে মিলিত হয়ে বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র ঘোষণা দেয় এবং ১৭ই এপ্রিল বহুসংখ্যক দেশি-বিদেশি সাংবাদিক, গণপরিষদ সদস্য ও মুক্তিকামী জনতার উপস্থিতিতে কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরের আম্রকাননে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করে এবং মেহেরপুরকেই মুজিবনগর নাম দিয়ে বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানী ঘোষণা করা হয়।

মুক্তিবাহিনী গঠন ও চূড়ান্ত বিজয় : অস্থায়ী সরকার গঠনের পর মুক্তিবাহিনী গঠিত হয় এবং কর্নেল (অব.) আতাউল গনি ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর সেনাপতি করা হয়। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। এদেশের অগণিত ছাত্র-জনতা, পুলিশ, ইপিআর, আনসার ও সামরিক বেসামরিক লোকদের সমন্বয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করা হয়। তারা পাকবাহিনীর মুখোমুখি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এভাবে দীর্ঘ ৯ মাসের যুদ্ধে পাকবাহিনীর অবস্থা অত্যন্ত নাজুক হয়ে পড়ে। আর কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর নিঃশর্তভাবে মিত্রবাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য আত্মসমর্পণ করে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও প্রাপ্তি : পাকিস্তানি শোষকদের শোষণ-বঞ্চনা ও ভেদ-বৈষম্যের অবসান, অর্থনৈতিক মুক্তি, সর্বোপরি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও বাস্তবতা হলো, স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও মুক্তিযুদ্ধের এ চেতনা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এখনো এদেশের মানুষ ঘুমায় পথের ধারে, এখনো মানুষ মরে অনাহারে, এখনো জাতীয় পতাকা পোড়ানো হয়, মসজিদের ইমামকে গুম, হত্যা করা হয়, মন্দিরের জমি-জায়গা দখল করা হয়। এখনো মানবাধিকার লজ্জিত হয়, গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে মানুষ বঞ্চিত হয়। সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও দুঃশাসনের কবলে পড়ে দেশবাসী আজ বড়ো অসহায়। আর এসবই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থি।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন : প্রথমত বাংলাদেশের তরুণ যুবকদের সুসংগঠিত করার মধ্য দিয়ে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বাস্তবায়িত করা যেতে পারে। এরপর জনগণের কাছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে রূপরেখা তুলে ধরতে হবে। শিক্ষা-কার্যক্রমে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটসহ এর নানাবিধ ঘটনা উপস্থাপিত করা যেতে পারে। সমস্ত গণমাধ্যমে এ চেতনা বাস্তবায়নে জনমত তৈরি করতে হবে। শুধু রাষ্ট্রের দিকে চেয়ে এই মহান আদর্শকে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়, বরং সকলকে একসঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর কাদা ছোড়াছুড়ি বন্ধ করে অন্তত এই বিষয়ে একই প্ল্যাটফর্মে সমবেত হতে হবে। আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা এমনকি সমাজকাঠামোতে যে দুর্নীতির রাহুগ্রাস বর্তমান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় তার মূলোৎপাটনে এগিয়ে আসতে হবে। লক্ষ শহিদের রক্তের মর্যাদায়, শত-সহস্র মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে আমাদের পাওয়া মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তাহলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়িত হবে।

আমরা লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে পাওয়া মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করি হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা দিয়ে। প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর বুকে গড়ে উঠুক এক সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিফলিত হয় কবির এ কবিতায়–

'স্বাধীনতা তুমি
রবি ঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান।
স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজরুল ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা।
স্বাধীনতা তুমি
শহিদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা।'

উপসংহার : মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির ইতিহাসে এক সোনালি অধ্যায়। এ অধ্যায় বড়ো উজ্জ্বল, অত্যন্ত বেদনা ও আনন্দের। মুক্তিযুদ্ধ থেকেই বাঙালির সত্তায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনের চেতনা জন্ম নেয়। তবে স্বাধীনতার এতো দিন পরেও সার্বভৌমত্ব রক্ষা, অর্থনৈতিক মুক্তি ও সাংস্কৃতিক মুক্তির জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে। তাই ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের জন্য দলমত জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলকে নতুন করে শপথ নিতে হবে।

৬. গ. ভূমিকা : জীবনে শৃঙ্খলাবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষ দৈনন্দিন জীবনে নিয়মের অনুবর্তী হয়ে যে কাজ সম্পাদন করা হয় তাই শৃঙ্খলা। আর শৃঙ্খলাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ এবং তা চর্চার মধ্য দিয়েই জন্ম হয় শৃঙ্খলাবোধের। এটি জীবনের সবকিছুকেই সার্থক করতে সহায়ক

ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক জীবনে শৃঙ্খলাবোধ শান্তিময় স্বাভাবিক জীবন বয়ে আনতে সহায়তা করে।

শৃঙ্খলা কী : সাধারণত নিয়ম-কানুনের প্রতি আন্তরিক আনুগত্য এবং তার অনুসরণ করাই শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলা এবং শৃঙ্খলাবোধ শুধু রাষ্ট্রীয় কিছু বিধিনিষেধকে গ্রহণ বা বর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পারিবারিক ও সামাজিক জীবন এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রেই অলিখিত কিছু রীতি আছে, যা মানুষকে মেনে চলতে হয়। জগতের সকল কাজের সাথেই শৃঙ্খলা জড়িত, এমনকি বিশ্বজগতের বিস্তৃত প্রকৃতির মধ্যেও শৃঙ্খলার বিষয়টি স্পষ্ট। ঘরে, বাইরে, রাষ্ট্রে যেখানেই শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম হয়েছে সেখানেই বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

প্রকৃতির রাজত্বে শৃঙ্খলা : শৃঙ্খলাবোধ মানবজীবনের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। বিশ্বপ্রকৃতির সকল ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বিদ্যমান। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ তারা সবকিছুই চলছে নিয়মের মধ্য দিয়ে। এভাবে নিয়মকে অনুসরণ করছে অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্র। পাহাড় বেয়ে ঝরনা নামে, ঝরনা মিলিত হয় নদীতে আর নদী ছোটে সমুদ্রের পানে। নদীর জলে জোয়ার আসে, আসে ভাটাও। বর্ষা আসে, শীত আসে, আসে বসন্ত। পৃথিবী আঁধার করা অমাবস্যা কালো পর্দা টেনে দেয় জগৎ সংসারে। পৃথিবীর সবকিছুকে যেন আড়াল করে দেয়। আবার পূর্ণিমা আসে। কোমল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে গোটা জগৎ। এ সবই নিয়মশৃঙ্খলাকে মান্য করেই ঘটছে। এর ব্যতিক্রম ঘটলেই ছন্দপতন ঘটবে পৃথিবীর। মানুষও স্বাভাবিক জীবন হারিয়ে ফেলবে। শ্বাপদসংকুল গভীর অরণ্যে প্রাণিজগতেও আছে শৃঙ্খলা। তাদের আহার, বিহার, বাসস্থান সবকিছুতে যদি শৃঙ্খলা না থাকত তাহলে বনের প্রাণীরা নেমে আসত হাট-বাজারে, পাখিরা গান গাইত অন্য কোনো স্থানে।

ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলাবোধ : ছাত্রজীবনে মানুষ যা কিছু শেখে, যা কিছু অর্জন করে এর প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে ছাত্রজীবন। ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলাবোধ থাকলে জীবনে সফল হওয়া যায়। শৃঙ্খলাবোধ মানুষকে সুনিয়মে চালিত করে বলে ছাত্রজীবনে এর চর্চা থাকলে কোনো ছাত্রের জীবনেই অনিয়ম ও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ করে না। কিন্তু যে ছাত্র নিয়ম পালন করে না তার পক্ষে যথাসময়ে যথা কাজ করা অসম্ভব। ফলে পিছিয়ে যেতে যেতে ছাত্রের মনে এক ধরনের নেতিবাচক ধারণার জন্ম হয়। সে উদ্যম হারিয়ে নিজের জীবনকে অর্থহীন করে তোলে, এমনকি বিপথগামী হওয়াও তার পক্ষে সহজ। শৃঙ্খলা নেই এমন ছাত্র ছাত্রমহলে এবং শিক্ষকমহলে সমাদৃত হয় না। অন্যদিকে শৃঙ্খলাবোধে উজ্জীবিত ছাত্র শিক্ষকের স্নেহ আনুকূল্য লাভ করে জীবনকে উন্নত করার সুযোগ পায়। তাই ছাত্রজীবনেই শৃঙ্খলাবোধে জাগ্রত হওয়া অত্যাবশ্যক।

সমাজ ও জাতীয় জীবনে শৃঙ্খলা : মানুষের সামাজিক সংঘবদ্ধ জীবনে শৃঙ্খলার প্রয়োজন। একটি সমাজে শৃঙ্খলা না থাকলে এর সুন্দর কাঠামোটি ভেঙে যায়। সমাজজীবনে নিয়ম শৃঙ্খলার অভাব ঘটলে একটি উচ্ছৃঙ্খল গোত্রের আবির্ভাব হতে পারে। এর ফলে সমাজে অত্যাচার, লুণ্ঠন এবং অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি পায়। যেখানে নিয়ম শৃঙ্খলা নেই, সেখানে যে কেউ স্বেচ্ছাচারী হতে পারে। ফলে অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্গের মানুষের ওপর ক্ষমতাবানদের ক্ষমতা চর্চার সুযোগ ঘটে। আর এ কারণেই সাধারণ মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। তাই সমাজজীবনে শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। এভাবে জাতীয় জীবনেও রয়েছে শৃঙ্খলাবোধের প্রয়োজনীয়তা। রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের মধ্যে নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে। তা না হলে রাষ্ট্র অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত হয়। আর অকার্যকর রাষ্ট্র মানেই অরাজকতা এবং সীমাহীন দুর্নীতি। শৃঙ্খলাপূর্ণ জাতি খুব দ্রুত উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হয়। শৃঙ্খলাকে সভ্য সমাজের একটি লক্ষণ বলা যেতে পারে। তাই জাতির জাতীয় অগ্রগতির প্রয়োজনে এবং সভ্য সমাজের বাসিন্দা হিসেবে আমাদের সকলেরই নিয়ম শৃঙ্খলাকে জীবনের অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।

শৃঙ্খলাবোধের গুরুত্ব : মানবজীবনকে সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে হলে চাই অনুকূল পরিবেশ। আর শৃঙ্খলা জীবনে বয়ে আনে সে অনুকূল পরিবেশ। শৃঙ্খলাবোধ জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যায় সুন্দর আগামীর দিকে। শৃঙ্খলার গুরুত্বটি অনুধাবন সহজ হয় সৈনিক জীবনের দিকে তাকালেই। বিশাল সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ করতে গিয়ে কঠোরভাবে মেনে চলে শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলা ভঙ্গ হলে যুদ্ধের মাঠে পরাজয় অবধারিত হয়ে যায়। তাই সৈনিকজীবনের উদয়াস্ত সমস্তই শৃঙ্খলাপূর্ণ। বিশ্বের উন্নত দেশগুলো প্রভূত উন্নতি করছে শৃঙ্খলাকে অবলম্বন করে। তাই ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে শৃঙ্খলার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

শৃঙ্খলাহীনতার পরিণাম : শৃঙ্খলাবোধ সবারই কাম্য। আর শৃঙ্খলাহীনতার পরিণাম অশান্তি। যে সমাজ শৃঙ্খলাবর্জিত সে সমাজের ধ্বংস অনিবার্য।। শৃঙ্খলা নেই এমন সমাজে যে কেউ আইনকে তার নিজের হাতে তুলে নিতে পারে। ফলে দুর্বল মার খায় সবলের হাতে। সীমাহীন স্বেচ্ছাচারিতা সমাজের জন্য অশান্তি ও অকল্যাণ বয়ে আনে। পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রেই শৃঙ্খলার চর্চা নেই। যে কারণে যুগ যুগ ধরে উন্নতির চেষ্টা করেও তারা উন্নতির সাক্ষাৎ পাচ্ছে না; বরং দেশের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়ছে চরমপন্থিদের বিদ্রোহ। শৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্য নেই বলেই আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কাসহ অনেক দেশের অর্ধেক শাসনভার সরকারের হাতে, অন্য অর্ধেক বিদ্রোহী চরমপন্থিদের হাতে। এ পরিস্থিতি কল্যাণ রাষ্ট্রের সভ্য জাতির লক্ষণ হতে পারে না। তাই রাষ্ট্রের উচিত নিয়ম-শৃঙ্খলা লঙ্ঘিত হলে তার উপযুক্ত তদারকি করা। আর আইন শৃঙ্খলা অমান্যকারীদের আইনের আওতায় আনতে পারলেই জাতি ভয়াল পরিণতি থেকে রক্ষা পাবে।

উপসংহার : শৃঙ্খলাবোধসম্পন্ন ব্যক্তির আচরণে সুনাগরিকের লক্ষণ প্রকাশ পায়। জীবনকে সাফল্যে ভরে দিতে শৃঙ্খলা অনুশীলন অত্যাবশ্যক। সুনাগরিকের ব্যক্তিসাফল্য বৃহৎ অর্থে জাতীয় সাফল্যের নামান্তর। তাই জাতীয় জীবনে অগ্রগতি ও উন্নতির জন্য শৃঙ্খলাবোধসম্পন্ন সুনাগরিক অত্যাবশ্যক।

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০২৪

সেট : গ

বাংলা দ্বিতীয় পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) **বিষয় কোড : 1 0 2**

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময় : ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি কালো কালির বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. 'আ' এর স্বাভাবিক উচ্চারণ নেই কোনটিতে?
ⓚ আপন ⓚ আকাশ ⓖ রাত ⓘ আলো

২. অস্বচ্ছ যুক্তবর্ণ কোনটি?
ⓚ ষ্ট ⓚ হ্ম ⓖ চ্ছ ⓘ প্ট

৩. 'মৃগয়া' শব্দের দ্বারা হরিণ বোঝালে অর্থের কী ধরনের পরিবর্তন হয়?
ⓚ অর্থপ্রসার ⓚ অর্থবদল
ⓖ অর্থের উন্নতি ⓘ অর্থসংকোচ

৪. 'ঝটিকা' শব্দটির প্রতিশব্দ নয় কোনট?
ⓚ পাবক ⓚ ঝড় ⓖ টর্নেডো ⓘ তুফান

৫. 'সাক্ষর' ও 'স্বাক্ষর' শব্দ জোড়ের মধ্যে মিল কোথায়?
ⓚ উচ্চারণে ⓚ বানানে ⓖ শব্দশ্রেণিতে ⓘ অর্থে

৬. নিচের কোনটি নিপাতনের সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি?
ⓚ গবাক্ষ ⓚ একাদশ ⓖ পরিচ্ছেদ ⓘ কুলটা

৭. কর্মবাচ্যের উদাহরণ কোনটি?
ⓚ তাদের দ্বারা বাড়িটি তৈরি হয়েছে।
ⓚ আমরা কঠোর পরিশ্রম করি।
ⓖ ওখানে কেন যাওয়া হলো? ⓘ এবার বাঁশিটি বাজাও।

৮. সাপেক্ষ সর্বনাম ও সাপেক্ষ যোজক যুক্ত রয়েছে কোনটিতে?
ⓚ ভিক্ষুককে টাকা দাও।
ⓚ তুমি চেষ্টা না করায় ব্যর্থ হয়েছে।
ⓖ যেহেতু দোষ করেছো, সেহেতু শাস্তি পাবে।
ⓘ বিপদ ও দুঃখ একসঙ্গে আসে।

৯. ছেলেটি বলে উঠলো, 'বাহ! কী সুন্দর বাড়ি'–বাক্যটি পরোক্ষ উক্তিতে কী হবে?
ⓚ ছেলেটি বলল যে, বাড়িটি সুন্দর।
ⓚ ছেলেটি চিৎকার করে বলল যে, বাড়িটি সুন্দর।
ⓖ ছেলেটি আনন্দের সাথে বলল যে, বাড়িটি সুন্দর।
ⓘ ছেলেটি আনন্দের সঙ্গে বলল যে, বাড়িটি খুব সুন্দর।

১০. যৌগিক ক্রিয়ার উদাহরণ কোনটি?
ⓚ হেসে ওঠা ⓚ মার খাওয়া ⓖ মরচে ধরা ⓘ কষ্ট পাওয়া

১১. 'তাকে আসতে বললাম, তবু এলো না।'–বাক্যটি কোন যোজক নির্দেশ করে?
ⓚ সাধারণ যোজক ⓚ বিরোধ যোজক
ⓖ কারণ যোজক ⓘ সাপেক্ষ যোজক

১২. প্রযোজক ক্রিয়ার সাধারণ বর্তমান কালে বক্তা পক্ষের ক্রিয়া বিভক্তি কোনটি?
ⓚ - আ ও (করাও) ⓚ - আস (করাস)
ⓖ -আয় (করায়) ⓘ - আই (করাই)

১৩. 'একজন এসে খবরটা দেয়'–এখানে কোন প্রকার সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে?
ⓚ অনির্দিষ্ট ⓚ নির্দেশক
ⓖ সাপেক্ষ ⓘ ব্যক্তিবাচক

১৪. শব্দের শেষে ই-কার ও উ-কার থাকলে কোন বিভক্তি ব্যবহৃত হয়?
ⓚ -এ ⓚ -তে ⓖ -য় ⓘ -যে

১৫. কোন বাক্যে ঘটনা ভবিষ্যতের কিন্তু ক্রিয়ার কাল বর্তমানের?
ⓚ আগামী মাসে আমরা সিলেট যাচ্ছি।
ⓚ শিকারি পাখিটিকে এইমাত্র গুলি করল।
ⓖ সবাই যেন সভায় হাজির থাকে।
ⓘ তোমরা হয়তো ছয় দফার কথা শুনে থাকবে।

১৬. বাংলা ভাষার নিকটতম আত্মীয় ভাষা কোনটি?
ⓚ সংস্কৃত ও পালি ⓚ সংস্কৃত ও অহমিয়া
ⓖ ওড়িয়া ও পালি ⓘ অহমিয়া ও ওড়িয়া

১৭. বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ কোনটি?
ⓚ এ গ্রামার অব দি বেঙ্গাল ল্যাঙ্গুয়েজ
ⓚ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ
ⓖ গৌড়ীয় ব্যাকরণ ⓘ বাংলা ভাষার অভিধান

১৮. কোনটি স্পর্শে কণ্ঠ্যধ্বনি উচ্চারিত হয়?
ⓚ তালু ও জিভ ⓚ জিভ ও দন্ত
ⓖ কোমল তালু ও আলজিভ ⓘ ঠোঁট ও জিভ

১৯. 'নালায়েক' শব্দে 'না' উপসর্গ কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ⓚ অপূর্ণ ⓚ নেতিবাচক
ⓖ নিন্দনীয় ⓘ মন্দ

২০. 'জাত' অর্থে কোনটি সঠিক?
ⓚ চোরা ⓚ ডিঙ্গা ⓖ ঢাকাই ⓘ মেটে

২১. যেসব শব্দাংশ পদের সঙ্গে যুক্ত হলে বক্তব্য জোরালো হয়, তাকে কী বলে?
ⓚ বিভক্তি ⓚ বলক ⓖ বচন ⓘ নির্দেশক

২২. পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব কোনটি?
ⓚ ফুটফুট ⓚ খকখক ⓖ পটাপট ⓘ সুরে সুরে

২৩. 'যাতক' শব্দটির বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে?
ⓚ পালক ⓚ পালক
ⓖ হত্যাকারী ⓘ পালনকারী

২৪. 'সোনায় সোহাগা'-এর সমার্থক বাগ্‌ধারা কোনটি?
ⓚ মগের মুল্লুক ⓚ ডুমুরের ফুল
ⓖ মনিকাঞ্চন যোগ ⓘ মানিক জোড়

২৫. ভাষা ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্য কোনটি?
ⓚ শব্দের অর্থ প্রকাশ করা ⓚ ভাষাকে শ্রুতি মধুর করা
ⓖ মনের ভাব প্রকাশ করা ⓘ শব্দের অর্থ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা

২৬. লেখার সময়ে কোনো অংশ বাদ দিতে চাইলে কোন বিরামচিহ্নের ব্যবহার করা হয়?
ⓚ বিন্দু ⓚ ড্যাশ ⓖ কোলন ⓘ ত্রিবিন্দু

২৭. 'চাষিরা ধারালো কাস্তে দিয়ে ধান কাটছে'–বাক্যটিতে 'ধারালো কাস্তে দিয়ে' কোন কারক?
ⓚ করণ কারক ⓚ অপাদান কারক
ⓖ অধিকরণ কারক ⓘ কর্ম কারক

২৮. বিধেয় ক্রিয়ার বিশেষ্য অংশকে কী বলা হয়?
ⓚ উদ্দেশ্য ⓚ পূরক
ⓖ প্রসারক ⓘ বর্গ

২৯. কোন বাক্যটিতে ক্রিয়াবিশেষণ-বর্গের উদাহরণ রয়েছে?
ⓚ আমার ভাই পড়তে বসেছে।
ⓚ রহিম ও করিম বৃষ্টিতে ভিজছে।
ⓖ আমটা দেখতে ভারী সুন্দর।
ⓘ সকাল আটটার সময়ে সে রওনা হলো।

৩০. কোনটি কর্মধারয় সমাস?
ⓚ হাতে-কলমে ⓚ গোলাভরা
ⓖ পদ্মআঁখি ⓘ লাল পেড়ে

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০২৪

বাংলা দ্বিতীয় পত্র (রচনামূলক প্রশ্ন)

সেট : ০৩ **বিষয় কোড : 1 0 2**

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। উত্তর প্রাসঙ্গিক ও যথাযথ হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

১। যে-কোনো একটি বিষয়ে অনুচ্ছেদ লেখো : ১০

(ক) বৈশাখী মেলা

(খ) স্বাধীনতা দিবস।

২। (ক) মনে করো, তোমার নাম মারিয়া। তুমি শেরপুরে থাকো। ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা জানিয়ে বন্ধুকে একটি পত্র লেখো। ১০

অথবা,

(খ) মনে করো, তুমি প্রত্যয়। তোমার এলাকায় পাঠাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে উপজেলা চেয়ারম্যানের নিকট একটি আবেদনপত্র লেখো।

৩। (ক) সারাংশ লেখো : ১০

তুমি বসন্তের কোকিল, বেশ লোক। যখন ফুল ফুটে, দক্ষিণা বাতাস বহে, এ সংসার সুখের স্পর্শে শিহরিয়া উঠে, তখন তুমি আসিয়া রসিকতা আরম্ভ করো। আবার যখন দারুণ শীতে জীবলোকে থরহরি কম্প লাগে, তখন কোথায় থাককো, বাপু! যখন শ্রাবণের ধারায় আমার চালাঘরে নদী বহে, যখন বৃষ্টির চোটে কাক ছিল ভিজিয়া গোময় হয়, তখন তোমার মাজা মাজা কালো কালো দুলালি ধরনের শরীরখানি কোথায় থাকে? তুমি বসন্তের কোকিল, শীত-বর্ষার কেহ নও।

অথবা,

(খ) সারমর্ম লেখো :

আসিতেছে শুভদিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ।
হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়,
পাহাড়-কাটা সে পথের দু'পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,
তোমারে বহিরে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি;
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরি গান,
তাদেরই ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান।

৪। যে-কোনো একটি ভাব-সম্প্রসারণ করো : ১০

(ক) মানুষ বাঁচে তার কর্মের মধ্যে বয়সের মধ্যে নয়।

(খ) গ্রন্থগত বিদ্যা আর পরহস্তে ধন,
নহে বিদ্যা নহে ধন হলে প্রয়োজন।

৫। (ক) মনে করো, তুমি মিতু। তোমার বিদ্যালয়ে 'শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে একটি সংবাদ প্রতিবেদন তৈরি করো। ১০

(খ) মনে করো, তোমার নাম রাকিব। 'দৈনিক প্রথম আলো' পত্রিকার একজন প্রতিবেদক। তোমার এলাকার সড়কের দুরবস্থা জানিয়ে একটি সংবাদ প্রতিবেদন রচনা করো।

৬। যে-কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করো : ২০

(ক) সময়ানুবর্তিতা

(খ) কৃষিকাজের বিজ্ঞান

(গ) বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	ক	২	খ	৩	ঘ	৪	ক	৫	ক	৬	খ	৭	ক	৮	গ	৯	ঘ	১০	ক	১১	খ	১২	ঘ	১৩	ক	১৪	খ	১৫	ক
	১৬	ঘ	১৭	গ	১৮	গ	১৯	ক	২০	গ	২১	খ	২২	ঘ	২৩	ক	২৪	গ	২৫	গ	২৬	ঘ	২৭	ক	২৮	খ	২৯	ঘ	৩০	গ

রচনামূলক

১. ক. নববর্ষকে উৎসবমুখর করে তোলে বৈশাখী মেলা। এটি মূলত সর্বজনীন লোকজ মেলা। এ মেলা অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে হয়ে থাকে। মেলার বিচিত্র আনন্দ-অনুষ্ঠানে, কেনাবেচার বাণিজ্যিক লেনদেনে, মিলনের অমলিন খুশিতে, অবারিত অন্তর প্রীতির স্পর্শে মেলার দিনটি মুখর হয়ে ওঠে। বৈশাখী মেলার প্রথম দিনেই শুরু হয় ব্যবসায়ীদের হালখাতার শুভ মহরত। প্রতিটি বিক্রয়-প্রতিষ্ঠানেই ক্রেতাদের মিষ্টান্ন সহযোগে আপ্যায়ন করা হয়। সর্বত্রই এক মধুর প্রীতিপূর্ণ পরিবেশ। বৈশাখী মেলা একদিন থেকে এক সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী হয়ে থাকে। এ মেলায় স্থানীয় কৃষিজাত দ্রব্য, কারুপণ্য, লোকশিল্পজাত পণ্য, কুটির শিল্পজাত সামগ্রী, সর্বপ্রকার হস্তশিল্পজাত ও মৃৎশিল্পজাত সামগ্রী, রন্ধনশিল্পজাত সামগ্রী, ফার্নিচারসহ নিত্যব্যবহার্য আধুনিক সবধরনের সামগ্রী পাওয়া যায়। এছাড়া শিশু-কিশোরদের খেলনা, মহিলাদের সাজসজ্জার সামগ্রী এবং বিভিন্ন লোকজ খাদ্যদ্রব্য; যেমন– চিড়া, মুড়ি, খই, বাতাসা ইত্যাদি, বিভিন্ন প্রকার মিষ্টি প্রভৃতির বৈচিত্র্যময় সমারোহ থাকে। মেলায় বিনোদনেরও ব্যবস্থা থাকে। মেলায় অনুষ্ঠিত হয় নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকগায়ক ও লোকনর্তকদের উপস্থিতি থাকে। তাঁরা যাত্রা, পালাগান, কবিগান, জারিগান, গম্ভীরা গান, গাজির গানসহ বিভিন্ন ধরনের লোকসংগীত, বাউল-মারফতি-মুর্শিদি-ভাটিয়ালি ইত্যাদি বিভিন্ন আঞ্চলিক গান পরিবেশন করেন। চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, নাটক, পুতুলনাচ, নাগরদোলা, সার্কাস ইত্যাদি মেলার বিশেষ আকর্ষণ। এছাড়া শিশু-কিশোরদের আকর্ষণের জন্য থাকে বায়োস্কোপ। শহরাঞ্চলে নগর সংস্কৃতির আমেজে এখনো বৈশাখী মেলা বসে এবং এ মেলা বাঙালিদের কাছে এক অনাবিল মিলনমেলায় পরিণত হয়। বৈশাখী মেলা বাঙালির আনন্দঘন লোকায়ত সংস্কৃতির ধারক। এ মেলা নিছক একটি আনন্দানুষ্ঠান মাত্র নয়; এটি বাঙালির স্বকীয় ও স্বতন্ত্র সংস্কৃতির পরিচায়কও বটে।

১. খ. ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস। এটা আমাদের জাতীয় জীবনে একটি স্মরণীয় ও ঐতিহাসিক দিন। বাঙালি জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা ১৯৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রাম। ৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ জয়লাভ সত্ত্বেও স্বৈরাচার পাকিস্তান সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় এদেশের জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অন্যদিকে পাক-সরকার জনগণের রায়কে উপেক্ষা করে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতের অন্ধকারে পাকহানাদার বাহিনী কামান, গুলি, ট্যাংক নিয়ে ঘুমন্ত, নিরস্ত্র, নিরীহ বাঙালির ওপর আক্রমণ চালায়। এরই প্রেক্ষিতে ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। দীর্ঘ নয় মাস রক্তাক্ত যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ত্রিশ লক্ষ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। ১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। তারপর থেকে প্রতিবছর এ দিনটি যথাযথ মর্যাদার সাথে পালিত হয়ে আসছে। দিবসটি উদ্‌যাপনের জন্য বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সব ভবনে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ওড়ানো হয়। ভোরবেলা গণজমায়েত হয় বিভিন্ন প্রাঙ্গণে, শহিদদের আত্মার শান্তি কামনা করে প্রার্থনা করা হয়, জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং রেডিও-টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। এভাবে সমগ্র দেশে রাষ্ট্রীয় মর্যাদার সাথে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। আমাদের জাতীয় জীবনে দিবসটি অত্যন্ত গৌরবের ও মর্যাদার।

২. ক.

২৫শে মে, ২০২...
নকলা, শেরপুর।

প্রিয় রায়হান,

শুরুতেই শুভেচ্ছা নিয়ো। অনেক দিন তোমার কোনো চিঠিপত্র পাচ্ছি না। আশা করি সবাইকে নিয়ে ভালো আছ। গত 'মাঘী পূর্ণিমার' ছুটিতে আমি আর সুব্রত বগুড়া জেলায় অবস্থিত ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহাস্থানগড় দেখতে গিয়েছিলাম। মহাস্থানগড়ের প্রাচীন পুরাকীর্তি বৌদ্ধযুগের স্থাপত্য নিদর্শন ও ভাস্কর্য সম্পর্কে শুধু বইতে পড়েছি। এবার স্বচক্ষে দেখে মুগ্ধ হলাম। প্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শনের কথা চিঠিতে লিখে ঠিক তোমাকে বোঝাতে পারব কি না জানি না। তবুও ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের আনন্দঘন অভিজ্ঞতা তোমার সাথে ভাগ করে নিতেই কলম ধরলাম।

দিনটি ছিল মঙ্গলবার। সকাল বেলায় নাস্তা খেয়ে আমরা দুজন মহাস্থানগড়ের উদ্দেশে রওয়ানা দিলাম। সেখানে পৌঁছে দেখতে পেলাম রাস্তার পাশে ভগ্নপ্রায় বিরাট দ্বিতল ইমারত। সামনে বিশাল পুকুর। চারপাশে সারি সারি গাছ। পুরাতন সেই ইট-পাথরের প্রতিমূর্তি বাংলার অবলুপ্ত শৌর্যবীর্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রাস্তার দুপাশে রয়েছে পুরানো অট্টালিকা। প্রাচীন যুগের কিছু স্থাপত্য নিদর্শন এবং ইতিহাসের উত্থান-পতনের কাহিনি। এসব দেখতে দেখতে যেন অতীতে হারিয়ে গেলাম। সময় পেলে তুমিও একবার দেখতে এসো বাংলার ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহাস্থানগড়। ভালো লাগবে। তোমার লেখাপড়া কেমন চলছে? ভালো থেকো। তোমার সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করছি।

ইতি
তোমার বন্ধু
মারিয়া

[বি. দ্র. পত্রের শেষে ডাকটিকিট সংবলিত খাম ও ঠিকানা ব্যবহার অপরিহার্য]

২. খ.

৫ই জুন, ২০২...

বরাবর

চেয়ারম্যান,

রায়পুরা ইউনিয়ন পরিষদ, নরসিংদী।

বিষয় : পাঠাগার স্থাপনের জন্য আবেদন।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা নরসিংদী জেলার অন্তর্গত রায়পুরা ইউনিয়নের অনন্তপুর গ্রামের অধিবাসী। এ গ্রামের লোকসংখ্যা প্রায় ছয় হাজার। গ্রামে শিক্ষিতের হার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখানে একটি বড়ো গ্রাম্য বাজার ও নানা ছোটো শিল্প কারখানা, স্কুল, মাদরাসা, একটি ক্লাবঘর ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, জ্ঞানপিপাসু ছেলেমেয়েদের জ্ঞানপিপাসা মেটানোর জন্য উক্ত অঞ্চলে বা তার আশেপাশে কোনো পাঠাগার নেই। ফলে জ্ঞানার্জন তথা শিল্পসাহিত্যে সময় ব্যয় করার মতো কোনো মাধ্যম নেই। গ্রামে উঠতি বয়সি যুবক ছেলেরা নানা রকম আড্ডাবাজিতে সময় নষ্ট করে। এতে কেউ কেউ বিপথগামীও হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই গ্রামে একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

এমতাবস্থায়, মহোদয়ের কাছে বিনীত অনুরোধ যে, এই গ্রামের বাজারে একটি পাঠাগার স্থাপন করে বাধিত করবেন।

নিবেদক

অনন্তপুর গ্রামবাসীর পক্ষে

প্রত্যয় রায়হান

রায়পুরা ইউনিয়ন পরিষদ, নরসিংদী

৩. ক. সুবিধাবাদীদের উপস্থিতি সুসময়ে দেখা যায়। দুঃখের দিনে তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রয়োজনের সময়ে এই সুসময়ের বন্ধুরা কোনো উপকারে আসে না।

৩. খ. শ্রমজীবী মানুষের কঠোর শ্রম ও অপরিসীম ত্যাগে গড়ে উঠেছে মানবসভ্যতা। তারাই সত্যিকারের মহৎ মানুষ। কিন্তু বাস্তবজীবনে এরা বঞ্চিত, শোষিত ও উপেক্ষিত। এখন দিন এসেছে। শ্রমজীবী মানুষেরাই একদিন নবজাগরণের মধ্য দিয়ে বিশ্বে পালাবদলের সূচনা করবে।

৪. ক. এ পৃথিবীতে সুন্দর কর্মের জন্যই মানুষ মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকে। অক্ষয় হয়ে থাকে তার মহৎ কর্মগুলো।

এ কথা চিরন্তন সত্য যে, মানুষ মরণশীল। তার দেহ একদিন মাটির সাথে বিলীন হয়ে যাবে। কিন্তু এ নশ্বর পৃথিবীতে সে আপন কীর্তির মহিমায় অমরত্ব লাভ করতে পারে। মানুষ শুধু আহার-নিদ্রায়, ভোগ-বিলাসে মগ্ন থাকার জন্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে না। তার জন্মের মূলে নিশ্চয় স্রষ্টার একটা মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। নইলে মানুষকে বুদ্ধি না দিয়ে পশুর মতো করেই পৃথিবীতে পাঠানো হতো। মানুষের বুদ্ধিমত্তা আছে বলেই সে শুধু আত্মকল্যাণে জীবন কাটিয়ে দিয়ে তৃপ্ত হতে পারে না, জনকল্যাণের মাঝে নিয়োজিত রেখেই সে তার মানুষ নামের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। ফলে এই জনকল্যাণের মাপকাঠি দিয়েই মানুষের জীবনের মূল্য পরিমাপ করা হয়ে থাকে। যে স্বার্থপর লোক শুধু নিজের সুখের জন্য কাজ করে এবং তার চারপাশের যেসব অসহায় নর নারী রয়েছে; তাদের দুঃখ মোচনের জন্য কোনো কিছুই করে না। মৃত্যুর সাথে সাথেই তার স্মৃতি চিরদিনের জন্য পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যায়। তার জন্য কেউ শোক জ্ঞাপন করে না এবং তার কথা কেউ কোনো দিন মনে রাখে না। পক্ষান্তরে অন্যের জন্য যারা অকাতরে নিজেকে বিলিয়ে দেয়, মৃত্যুর পরও তার কীর্তির কথা, তার মহত্ত্বের কথা কেউ ভোলে না। সে সকলের নিকট স্মরণীয়, বরণীয় হয়ে থাকে। মানুষ তার কর্মকে প্রতিনিয়ত শ্রদ্ধা করে ।

মানুষ পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত বয়সকালের মধ্যে নয়; বরং তার সুকর্মের স্মৃতিতে যুগ যুগ বেঁচে থাকে।

৪. খ. বিদ্যা ও ধন এ দুটো মানুষের জীবনে খুবই প্রয়োজন। কিন্তু এ বিদ্যা ও ধনের সার্থকতা নির্ভর করে মানুষের প্রয়োজন মেটানোর ওপর। প্রয়োজনের মুহূর্তে কাজে না লাগলে এ দুটোর কোনো মূল্য নেই।

গ্রন্থের সাহায্যে আমরা বিদ্যার্জন তথা জ্ঞানলাভ করে থাকি। কিন্তু অর্জিত বিদ্যার ব্যাবহারিক প্রয়োগ না শিখলে তা অর্থহীন হয়ে যায়। গ্রন্থের মধ্যে বিদ্যা লিখিত আছে। গ্রন্থ সংগ্রহ করে পাঠ করলে তা অর্জন করা যায়। কিন্তু শুধু পুথিগত বিদ্যা কোনো কাজে আসে না। তাকে ব্যাবহারিক জীবনে প্রয়োগ করতে পারলেই সার্থক হয়। পৃথিবীতে প্রচুর ধনসম্পদ রয়েছে। পরিশ্রম করলেই তা উপার্জন করা যায়। পৃথিবীতে বাঁচতে হলে ধনসম্পদের প্রয়োজন হয়। পরিশ্রম করে তা উপার্জন না করলে প্রয়োজনের সময় পাওয়া যায় না। সুদিনে অনেক বন্ধু পাওয়া গেলেও দুর্দিনে কাউকে পাওয়া যায় না। গ্রন্থাগারে প্রচুর গ্রন্থ থাকলেই চলে না। তাদের মধ্যে যেসব জ্ঞানের বিষয় আছে, সেগুলোকে ব্যাবহারিক জীবনে প্রয়োগ করতে না পারলে কোনোই প্রয়োজন মেটে না। নিজের জন্য সঞ্চিত না রেখে ধনসম্পদ পরের হাতে তুলে দিলেও প্রয়োজনের সময় ফিরে পাওয়া যায় না। যে প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিদ্যা ও ধনসম্পদ অর্জন করা হয়, তা যদি যথাসময়ে পাওয়া না যায়, তাহলে তার কোনো মূল্য নেই। যে জ্ঞান কোনো ব্যাবহারিক জীবনে প্রয়োগ করা যায় না, সে জ্ঞান দ্বারা নিজে যেমন উপকৃত হয় না; জগতেরও কোনো কল্যাণ সাধিত হয় না। তাই আমাদের উচিত, অর্জিত বিদ্যাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা এবং জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করা।

ধন মানুষের অতীব প্রয়োজনীয় জিনিস। ধন অর্জন করে কেউ যদি অপরের নিকট রেখে দেয়, তাহলে প্রয়োজনের সময় তা পাওয়া যায় না। তেমনি বিদ্যাও যদি কেবল গ্রন্থের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে তা জীবনের কোনো কাজে লাগে না।

৫. ক.

২৩শে ফেব্রুয়ারি ২০২...

মাননীয়

প্রধান শিক্ষক,

সিলেট জিলা স্কুল, সিলেট।

বিষয় : 'শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রতিবেদন।

জনাব,

আপনার প্রদত্ত ২২শে ফেব্রুয়ারি, ২০২...; স্মারক নং সজস– ২২/২০২... পত্রের আদেশক্রমে বিদ্যালয়ে ' শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের একটি প্রতিবেদন আপনার সদয় অবগতির জন্য প্রদত্ত হলো।

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সিলেট জিলা স্কুলে ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০২... দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (বাংলা) জনাব জসিম উদ্দিন।

সকাল ৭টায় প্রভাতফেরির মাধ্যমে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ভোর থেকেই বিদ্যালয়ের আশপাশের ছাত্রছাত্রীরা খালি পায়ে প্রশাসনিক ভবনের সামনে সমবেত হয়। তাদের সঙ্গে শিক্ষকবৃন্দ যোগদান করেন। বিদ্যালয় মাঠের দক্ষিণ প্রান্তে শহিদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের খালি পায়ে শোভাযাত্রা শুরু হয়। সবার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয় একুশে ফেব্রুয়ারির অমর গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি।' এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হয় শোভাযাত্রা। অবশেষে সকাল ৮টায় শহিদ মিনারের পাদদেশে সকলে উপনীত হলে প্রধান শিক্ষক প্রথম পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে অমর শহিদদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ ফুলের তোড়া শহিদ মিনারে অর্পণ করে শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

শহিদ দিবস ও মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে পরবর্তী কর্মসূচি ছিল কবিতা আবৃত্তি ও সংগীতানুষ্ঠান। শহিদ মিনারের বেদিমূলে সবুজ ঘাসের গালিচার উপর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথমে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত কবিগণের নির্বাচিত কবিতা আবৃত্তি করে। পরে স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনানো হয়। আবৃত্তিশেষে শুরু হয় সংগীতানুষ্ঠান। দেশাত্মবোধক গানই ছিল এ পর্যায়ের মূল আকর্ষণ।

বিকেলে আয়োজন করা হয়েছিল আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সভাপতিত্বে আলোচনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি মুহম্মদ সামাদ। বিদ্যালয়ের দুজন শিক্ষার্থী মাতৃভাষা দিবসের ওপর আলোচনা করে। আলোচনার শেষে ছিল পুরস্কার বিতরণ পর্ব। শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত কবিতা ও রচনা প্রতিযোগিতা এবং সংগীত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং প্রধান অতিথি। নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

প্রতিবেদকের নাম	:	মিতু সরকার
প্রতিবেদনের শিরোনাম	:	'শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপন।
প্রতিবেদনের প্রক্রিয়া	:	বিশেষ প্রতিবেদন
প্রতিবেদনের সময়	:	দুপুর ১২টা
প্রতিবেদনের তারিখ	:	২৩/০২/২০২...

৫. খ.

সড়কের বেহাল দশা : যাত্রীদের দুর্ভোগ

রাকিব, চাটখিল (নোয়াখালী), ২২শে জুলাই ২০২...॥ নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি উপজেলার জয়াগ বাজার থেকে কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ উপজেলার হাসনাবাদ পর্যন্ত শহিদ মুক্তিযোদ্ধা একরামুল হক সড়কটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। প্রায় এক যুগ ধরে সড়কটির কোনো সংস্কার কাজ হয়নি। সড়কের এ বেহাল দশায় যাত্রীরা চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে সরেজমিনে দেখা গেছে, বারো কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কটির পুরোটাই বড়ো বড়ো গর্ত ও খানাখন্দে ভরা। জয়াগ বাজার থেকে মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের নগরপাড়া সেতু পর্যন্ত দুই কিলোমিটার অংশে দুই পাশের মাটি সরে গেছে। প্রতিদিন এ সড়ক দিয়ে নোয়াখালীর চাটখিল ও সোনাইমুড়ি, কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ ও লাকসাম এবং চাঁদপুরের শাহরাস্তি উপজেলার হাজার হাজার বাসিন্দা চলাচল করে। এছাড়া কমপক্ষে ত্রিশটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এ পথে যাতায়াত করে থাকে। এলাকাবাসী জানান, সড়কটির তিন কিলোমিটার সোনাইমুড়ি এবং বাকি নয় কিলোমিটার চাটখিল উপজেলায় পড়েছে। বিগত ২০২... সালের বন্যায় সড়কটির সুরকির স্তর দেবে গিয়ে বালু বের হয়ে আসে এবং সৃষ্টি হয় খানাখন্দের। এরপর প্রতি বর্ষায় বৃষ্টিপাতে পানি ও কাদায় সড়কটি একাকার হয়ে যায়, যা এখন চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। গত বুধবার একটি পিকআপ ভ্যান ভাওরকোট গ্রামের কাছে রাস্তার গর্তে পড়ে যায়। এতে চালকসহ তিন জন যাত্রী আহত হন।

চাটখিল ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ মানুষ মনে করে, সড়কটি নিয়ে এলাকাবাসীর দুর্ভোগ দীর্ঘদিনের। অথচ এর সমাধানে কর্তৃপক্ষের কোনো নজর নেই। এটি মেরামতের জন্য স্থানীয় লোকজন সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে একাধিকবার আবেদন করলেও কোনো প্রতিকার পায়নি। এলাকাবাসীর দাবি, গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কটি দ্রুত সংস্কার করে জনদুর্ভোগ কমাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যেন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

৬. ক. **ভূমিকা :** জীবনে শৃঙ্খলাবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষ দৈনন্দিন জীবনে নিয়মের অনুবর্তী হয়ে যে কাজ সম্পাদন করা হয় তাই শৃঙ্খলা। আর শৃঙ্খলাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ এবং তা চর্চার মধ্য দিয়েই জন্ম হয় শৃঙ্খলাবোধের। এটি জীবনের সবকিছুকেই সার্থক করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক জীবনে শৃঙ্খলাবোধ শান্তিময় স্বাভাবিক জীবন বয়ে আনতে সহায়তা করে।

শৃঙ্খলা কী : সাধারণত নিয়ম-কানুনের প্রতি আন্তরিক আনুগত্য এবং তার অনুসরণ করাই শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলা এবং শৃঙ্খলাবোধ শুধু রাষ্ট্রীয় কিছু বিধিনিষেধকে গ্রহণ বা বর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পারিবারিক ও সামাজিক জীবন এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রেই অলিখিত কিছু রীতি আছে, যা মানুষকে মেনে চলতে হয়। জগতের সকল কাজের সাথেই শৃঙ্খলা জড়িত, এমনকি বিশ্বজগতের বিস্তৃত প্রকৃতির মধ্যেও শৃঙ্খলার বিষয়টি স্পষ্ট। ঘরে, বাইরে, রাষ্ট্রে যেখানেই শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম হয়েছে সেখানেই বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

প্রকৃতির রাজত্বে শৃঙ্খলা : শৃঙ্খলাবোধ মানবজীবনের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। বিশ্বপ্রকৃতির সকল ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বিদ্যমান। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ তারা সবকিছুই চলছে নিয়মের মধ্য দিয়ে। এভাবে নিয়মকে অনুসরণ করছে অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্র। পাহাড় বেয়ে ঝরনা নামে, ঝরনা মিলিত হয় নদীতে আর নদী ছোটে সমুদ্রের পানে। নদীর জলে জোয়ার আসে, আসে ভাটাও। বর্ষা আসে, শীত আসে, আসে বসন্ত। পৃথিবী আঁধার করা অমাবস্যা কালো পর্দা টেনে দেয় জগৎ সংসারে। পৃথিবীর সবকিছুকে যেন আড়াল করে দেয়। আবার পূর্ণিমা আসে। কোমল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে গোটা জগৎ। এ সবই নিয়মশৃঙ্খলাকে মান্য করেই ঘটছে। এর ব্যতিক্রম ঘটলেই ছন্দপতন ঘটবে পৃথিবীর। মানুষও স্বাভাবিক জীবন হারিয়ে ফেলবে। শ্বাপদসংকুল গভীর অরণ্যে প্রাণিজগতেও আছে শৃঙ্খলা। তাদের আহার, বিহার, বাসস্থান সবকিছুতে যদি শৃঙ্খলা না থাকত তাহলে বনের প্রাণীরা নেমে আসত হাট-বাজারে, পাখিরা গান গাইত অন্য কোনো স্থানে।

ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলাবোধ : ছাত্রজীবনে মানুষ যা কিছু শেখে, যা কিছু অর্জন করে এর প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে ছাত্রজীবন। ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলাবোধ থাকলে জীবনে সফল হওয়া যায়। শৃঙ্খলাবোধ মানুষকে সুনিয়মে চালিত করে বলে ছাত্রজীবনে এর চর্চা থাকলে কোনো ছাত্রের জীবনেই অনিয়ম ও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ করে না। কিন্তু যে ছাত্র নিয়ম পালন করে না তার পক্ষে যথাসময়ে যথা কাজ করা অসম্ভব। ফলে পিছিয়ে যেতে যেতে ছাত্রের মনে এক ধরনের নেতিবাচক ধারণার জন্ম হয়। সে উদ্যম হারিয়ে নিজের জীবনকে অর্থহীন করে তোলে, এমনকি বিপথগামী হওয়াও তার পক্ষে সহজ। শৃঙ্খলা নেই এমন ছাত্র ছাত্রমহলে এবং শিক্ষকমহলে সমাদৃত হয় না। অন্যদিকে শৃঙ্খলাবোধে উজ্জীবিত ছাত্র শিক্ষকের স্নেহ আনুকূল্য লাভ করে জীবনকে উন্নত করার সুযোগ পায়। তাই ছাত্রজীবনেই শৃঙ্খলাবোধে জাগ্রত হওয়া অত্যাবশ্যক।

সমাজ ও জাতীয় জীবনে শৃঙ্খলা : মানুষের সামাজিক সংঘবদ্ধ জীবনে শৃঙ্খলার প্রয়োজন। একটি সমাজে শৃঙ্খলা না থাকলে এর সুন্দর কাঠামোটি ভেঙে যায়। সমাজজীবনে নিয়ম শৃঙ্খলার অভাব ঘটলে একটি উচ্ছৃঙ্খল গোত্রের আবির্ভাব হতে পারে। এর ফলে সমাজে অত্যাচার, লুণ্ঠন এবং অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি পায়। যেখানে নিয়ম শৃঙ্খলা নেই, সেখানে যে কেউ স্বেচ্ছাচারী হতে পারে। ফলে অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্গের মানুষের ওপর ক্ষমতাবানদের ক্ষমতা চর্চার সুযোগ ঘটে। আর এ কারণেই সাধারণ মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। তাই সমাজজীবনে শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। এভাবে জাতীয় জীবনেও রয়েছে শৃঙ্খলাবোধের প্রয়োজনীয়তা। রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের মধ্যে নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে। তা না হলে রাষ্ট্র অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত হয়। আর অকার্যকর রাষ্ট্র মানেই অরাজকতা এবং সীমাহীন দুর্নীতি। শৃঙ্খলাপূর্ণ জাতি খুব দ্রুত উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হয়। শৃঙ্খলাকে সভ্য সমাজের একটি লক্ষণ বলা যেতে পারে। তাই জাতির জাতীয় অগ্রগতির প্রয়োজনে এবং সভ্য সমাজের বাসিন্দা হিসেবে আমাদের সকলেরই নিয়ম শৃঙ্খলাকে জীবনের অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।

শৃঙ্খলাবোধের গুরুত্ব : মানবজীবনকে সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে হলে চাই অনুকূল পরিবেশ। আর শৃঙ্খলা জীবনে বয়ে আনে সে অনুকূল পরিবেশ। শৃঙ্খলাবোধ জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যায় সুন্দর আগামীর দিকে। শৃঙ্খলার গুরুত্বটি অনুধাবন সহজ হয় সৈনিক জীবনের দিকে তাকালেই। বিশাল সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ করতে গিয়ে কঠোরভাবে মেনে চলে শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলা ভঙ্গ হলে যুদ্ধের মাঠে পরাজয় অবধারিত হয়ে যায়। তাই সৈনিকজীবনের উদয়াস্ত সমস্তই শৃঙ্খলাপূর্ণ। বিশ্বের উন্নত দেশগুলো প্রভূত উন্নতি করছে শৃঙ্খলাকে অবলম্বন করে। তাই ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে শৃঙ্খলার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

শৃঙ্খলাহীনতার পরিণাম : শৃঙ্খলাবোধ সবারই কাম্য। আর শৃঙ্খলাহীনতার পরিণাম অশান্তি। যে সমাজ শৃঙ্খলাবর্জিত সে সমাজের ধ্বংস অনিবার্য।। শৃঙ্খলা নেই এমন সমাজে যে কেউ আইনকে তার নিজের হাতে তুলে নিতে পারে। ফলে দুর্বল মার খায় সবলের হাতে। সীমাহীন স্বেচ্ছাচারিতা সমাজের জন্য অশান্তি ও অকল্যাণ বয়ে আনে। পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রেই শৃঙ্খলার চর্চা নেই। যে কারণে যুগ যুগ ধরে উন্নতির চেষ্টা করেও তারা উন্নতির সাক্ষাৎ পাচ্ছে না; বরং দেশের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়ছে চরমপন্থিদের বিদ্রোহ। শৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্য নেই বলেই আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কাসহ অনেক দেশের অর্ধেক শাসনভার সরকারের হাতে, অন্য অর্ধেক বিদ্রোহী চরমপন্থিদের হাতে। এ পরিস্থিতি কল্যাণ রাষ্ট্রের সভ্য জাতির লক্ষণ হতে পারে না। তাই রাষ্ট্রের উচিত নিয়ম-শৃঙ্খলা লঙ্ঘিত হলে তার উপযুক্ত তদারকি করা। আর আইন শৃঙ্খলা অমান্যকারীদের আইনের আওতায় আনতে পারলেই জাতি ভয়াল পরিণতি থেকে রক্ষা পাবে।

উপসংহার : শৃঙ্খলাবোধসম্পন্ন ব্যক্তির আচরণে সুনাগরিকের লক্ষণ প্রকাশ পায়। জীবনকে সাফল্যে ভরে দিতে শৃঙ্খলা অনুশীলন অত্যাবশ্যক। সুনাগরিকের ব্যক্তিসাফল্য বৃহৎ অর্থে জাতীয় সাফল্যের নামান্তর। তাই জাতীয় জীবনে অগ্রগতি ও উন্নতির জন্য শৃঙ্খলাবোধসম্পন্ন সুনাগরিক অত্যাবশ্যক।

৬. খ. **ভূমিকা :** সভ্যতার ক্রম পরিবর্তনে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা পালন করেছে বিজ্ঞান। বর্তমান বিশ্বে মানুষের যে অগ্রযাত্রা তা বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। বিজ্ঞান মানুষকে গতিশীল করেছে এবং সভ্যতার অগ্রযাত্রাকে করেছে ত্বরান্বিত। বর্তমানে কৃষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূত্র বিজ্ঞানই আবিষ্কার করেছে। কৃষিকাজে বিজ্ঞানের অবদান অপরিসীম।

মানবসভ্যতা ও কৃষি : মানব সভ্যতার ইতিহাস অত্যন্ত পুরোনো। আর সেই সভ্যতার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কৃষির হাত ধরেই। মানুষ শিকারের বিকল্প হিসেবে কৃষিকে বেছে নিয়ে তার জীবনকে গতিশীল ও উন্নত করেছিল। তাই এটি মানুষের আদিমতম জীবিকার একটি পেশাও বটে। সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায় যে, কৃষিতে যে দেশ যত তাড়াতাড়ি অগ্রগতি সাধন করতে পেরেছে, সে দেশ তত তাড়াতাড়ি সভ্যতার উপরের সিঁড়িকে অতিক্রম করেছে। এ থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, কৃষির উন্নতিতেই সমাজ, দেশ ও সভ্যতার ক্রমোন্নতি সম্ভব হয়।

মানবজীবনে কৃষির গুরুত্ব : কৃষি মানুষের অস্তিত্বের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। মানবজীবন ও মানবসমাজে এর গুরুত্ব অপরিসীম। জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে এটি মানুষের আদিমতম জীবিকার উপায়। দেশে দেশে কৃষিই সমাজের মেরুদণ্ড, কৃষিই সমাজের ভিত্তি। স্বভাবতই কৃষির ক্রমোন্নতিতেই সমাজের ও দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি। এই উন্নতিতে অনন্য ও অভাবনীয় ভূমিকা রেখেছে বিজ্ঞান। আজকের বিশ্বে প্রতিটি ক্ষেত্রের মতো কৃষিক্ষেত্রেও বিজ্ঞানই আজ বাড়িয়ে দিয়েছে তার সুদূরপ্রসারী কল্যাণী হাত।

কৃষিকাজে বিজ্ঞান : মানুষ খাদ্যের জন্য কৃষির ওপর নির্ভরশীল। আজ বিজ্ঞানের প্রভাবে কৃষিকাজ আদিম স্তর কাটিয়ে আধুনিক স্তরে পৌঁছেছে। পানি সেচের ব্যবস্থা, উন্নত ধরনের বীজ, বীজ বপন, ফসল কাটা ও মাড়াই, ভূমি সংরক্ষণ ইত্যাদির প্রভূত উন্নতি কৃষিবিজ্ঞানেরই আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর মেশিনের অবদান। পৃথিবীতে আজ জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু ফসলি জমির পরিমাণ সীমিত। এ সীমিত কর্ষণযোগ্য জমিতে বিজ্ঞানের সহায়তায় নতুন বীজ আবিষ্কার, নতুন পদ্ধতি প্রয়োগে মানুষ ক্ষুধার্তের অন্ন সংগ্রহের প্রয়াস চালাচ্ছে।

বিভিন্ন দেশে কৃষিকাজে বিজ্ঞান : উন্নত দেশগুলোর কৃষিব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিজ্ঞাননির্ভর। জমিতে বীজ বপন থেকে শুরু করে ঘরে ফসল তোলা পর্যন্ত সমস্ত কাজেই রয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়া। বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক কৃষিযন্ত্র, যেমন– মোয়ার (শস্য-ছেদনকারী যন্ত্র), রপার (ফসল কাটার যন্ত্র), বাইন্ডার (ফসল বাঁধার যন্ত্র), থ্রেশিং মেশিন (মাড়াইযন্ত্র), ম্যানিউর স্প্রেডার (সার বিস্তরণ যন্ত্র) ইত্যাদি উন্নত দেশগুলোর কৃষিক্ষেত্রে এনেছে বৈপ্লবিক সাফল্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের খামারে একদিনে ১০০ একর পর্যন্ত জমি চাষ হচ্ছে কেবল এক-একটি ট্রাক্টরের মাধ্যমে। সেগুলো আবার একসাথে তিন-চারটি ফসল কাটার যন্ত্রকে একত্রে কাজে লাগাতে সক্ষম। তারা বিভিন্নভাবে কৃষিকাজের এমন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করছে যার ফলে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তারা কৃষিকাজে ব্যাপকভাবে অগ্রগামী। যেমন বলা যায় জাপানের কথা। জাপানে জমির উর্বরাশক্তি বাংলাদেশের তুলনায় কম। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে তারা বাংলাদেশের তুলনায় ৬ গুণ বেশি ফসল উৎপাদন করছে। শীতপ্রধান দেশে 'শীত নিয়ন্ত্রণ' ঘর বানিয়ে শাকসবজি এবং ফলমূল সংরক্ষণ করছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে বর্তমানে শুষ্ক মরুভূমির মতো জায়গাতে সেচ, সার ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় চাষাবাদ করে সোনার ফসল ফলানো সম্ভব হচ্ছে। এভাবে বিজ্ঞান কৃষিকাজে এক যুগান্তকারী বিপ্লব সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশের কৃষিকাজে বিজ্ঞান : আমাদের দেশেও এখন কৃষিকাজে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে জমি খণ্ডবিখণ্ড হচ্ছে। এই খণ্ডবিখণ্ডতার কারণে জমি কর্ষণে ব্যাপকভাবে ট্রাক্টর ব্যবহার করা যাচ্ছে না। তবে মানুষ এখন আর চাতকের ন্যায় বৃষ্টিধারার জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে না। সেচের জন্য এখন ব্যবহার করা হয় গভীর নলকূপ এবং মেশিনচালিত পাম্প। বপনের জন্য ব্যবহার করা হয় উন্নত ধরনের বীজ। বীজ সংরক্ষণে সাহায্য নেওয়া হয় বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির। বর্তমানে রাসায়নিক সার ব্যবহার করে ফসল উৎপাদনের মাত্রা বাড়ানো হচ্ছে। আগে যে জমিতে একধরনের ফসল হতো, বিজ্ঞানের সাহায্যে এখন সেখানে তিন ধরনের ফসল হয়। ধানের চারা রোপণ, ধান কাটা ও ধান মাড়াইয়ের আধুনিক যন্ত্রপাতি বাংলাদেশে বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে আমাদের দেশের কৃষিকাজ এখনো সম্পূর্ণ যান্ত্রিক করা সম্ভব হয়নি। চাষাবাদে বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারলে আমাদের খাদ্য সমস্যা সমাধান করা যাবে এবং বিদেশেও রপ্তানি করা যাবে।

বিজ্ঞানসম্মত কৃষির গুরুত্ব : আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কৃষির বাস্তবিক গুরুত্ব অনেকখানি। তবে পুরোনো পদ্ধতির চাষাবাদে বর্তমানে আর সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। এখন প্রয়োজন অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ। উন্নত বিশ্বের মতো ছোটো জায়গায় অধিক ফসল ফলানোর কৌশল আমাদেরও আয়ত্ত করতে হবে। তবেই কৃষক ও কৃষির সমন্বিত সাফল্য ত্বরান্বিত হবে।

বৈজ্ঞানিক কৃষি ও অর্থনীতি : বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষিকাজের ফলে অর্থনীতির অগ্রগতি সাধিত হওয়া সম্ভব। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, আমরা এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি। আমরা নিজেদের উৎপাদিত ফসল বাইরেও রপ্তানি করতে সমর্থ হচ্ছি। জীবনরহস্য আবিষ্কারের ফলে পাটের সোনালি দিন আবার আমাদের মধ্যে আসতে শুরু করেছে। বহু আগে থেকেই আমরা বিভিন্ন দেশে চা রপ্তানি করে আসছি। সুতরাং সর্বাধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদের ফলে আমাদের পক্ষে এ সাফল্যকে আরও ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

উপসংহার : কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞানের জাদুর ছোঁয়ায় অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। কেননা বিজ্ঞানকে আমরা যত কাজে লাগাতে পারব, ততই আমাদের কৃষিতে অপার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। তাই সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায় থেকেই বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদে কৃষককে উৎসাহিত করা আবশ্যক এবং সহযোগিতার হাতকে প্রসারিত করা একান্ত কর্তব্য।

৬. গ. **ভূমিকা :** প্রকৃতির রূপ বড়োই বিচিত্র। প্রকৃতি মানুষের জন্য সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করে। আবার এ প্রকৃতিই মানুষের জীবনে দুর্যোগ বয়ে আনে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, খরা, মহামারি ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়, অগণিত মানুষের প্রাণহানি ঘটে এবং সম্পদ বিনষ্ট হয়। মানুষ এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করতে সক্ষম নয়। তবে আগে থেকে সতর্কতা অবলম্বন করলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনতে পারে। নানা কারণে বাংলাদেশে বন্যাসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সৃষ্টি হয়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ কী : দুর্যোগ বলতে আমরা বুঝি, যা মানুষের স্বাভাবিক জীবনকে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করে এবং জানমালের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। আর প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলতে বোঝায় প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক উপাদানের চরম অস্বাভাবিক অবস্থা, যাতে মানবসমাজ বিপর্যস্ত ও দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাই প্রকৃতির অস্বাভাবিক আচরণ বা অবস্থা। বাংলাদেশে হয় এমন প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো–

ঝড় : পৃথিবীর অন্য দেশের মতো বাংলাদেশেও তীব্র বাতাস ও বজ্র বিদ্যুৎসহ ভারী বৃষ্টিপাত ঝড়ের সাধারণ চিত্র। এসময় সমুদ্র থাকে উত্তাল।

ঘূর্ণিঝড় : ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের তীব্রতা হয় অনেক বেশি। কখনো কখনো ঘণ্টায় ২৫০ কিলোমিটার বেগে বয়ে যায়। সমুদ্রে সৃষ্টি হয় জলোচ্ছ্বাসের। প্রতিবছরই এপ্রিল থেকে মে এবং অক্টোবর থেকে নভেম্বরে বাংলাদেশে ছোটো বড়ো ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। প্রবল শক্তিসম্পন্ন এ ঝড়ে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয় চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী, খুলনা, বরিশাল ও পটুয়াখালির উপকূলীয় অঞ্চল এবং সমুদ্রতীরবর্তী দ্বীপসমূহ। ১৯৭০ সালে মেঘনা মোহনায় প্রবল ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে প্রায় তিন লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়, গবাদিপশু ও ফসলেরও ক্ষতি হয় প্রচুর। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে দেড় লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়, প্রায় ছয় শত কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট হয়। ২০০৮ সালে বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে আঘাত হানে শক্তিসম্পন্ন ঘূর্ণিঝড় 'সিডর'। এর ফলে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। বিশ্বের একমাত্র ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

টর্নেডো : বাংলাদেশে টর্নেডো আঘাত হানে সাধারণত এপ্রিল মাসে, যখন তাপমাত্রা সর্বোচ্চ থাকে। এটি স্বল্পকালীন দুর্যোগ, আঘাতও হানে স্বল্প এলাকা জুড়ে। কিন্তু যেখানে আঘাত হানে সেখানে মাত্র দশ-বিশ মিনিটের মধ্যেই ঐ এলাকা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়ে যায়।

কালবৈশাখী ঝড় : কালবৈশাখী সাধারণত এপ্রিল-মে মৌসুমে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বয়ে যায়। এর গতিবেগ সাধারণত ৪০–৬০ কিলোমিটার হয়ে থাকে। ব্যাপ্তিকালও স্বল্প, কখনো কখনো এক ঘণ্টা স্থায়ী হয়। কালবৈশাখী সাধারণত আঘাত হানে শেষ বিকেলের দিকে। মাঝে মাঝে এ ঝড়ের সাথে শিলাবৃষ্টিও হয়।

বন্যা : বাংলাদেশে প্রায় প্রতিবছরই বন্যা হয়। বন্যায় এদেশের এক বিস্তৃর্ণ ভূ-ভাগ প্লাবিত হয়। ঋতুগত কারণে প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে নদ-নদীর পানি বেড়ে যায় এবং নদীর বাঁধ ভেঙে বন্যার সৃষ্টি হয়। এছাড়াও পাহাড়ি ঢল, জলোচ্ছ্বাস ও জোয়ারের কারণে বাংলাদেশে বন্যা দেখা দেয়। বন্যায় প্রাণহানি কম হলেও সম্পদ ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। অনেক গবাদিপশু মারা যায়। বন্যাপরবর্তী সময়ে খাদ্যাভাব এবং নানারকম রোগব্যাধি দেখা দেয়। গৃহহীন হয়ে পড়ে অনেক লোক। বাংলাদেশে ১৯৫৫, ১৯৭৪, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪ ও ২০০৭ সালে সৃষ্ট বন্যায় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। ১৯৭৪ সালে বন্যার পরপরই দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং তাতে প্রায় ত্রিশ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালের বন্যায় মৃতের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যায়। ২০১৮, ২০১৯ সালেও এদেশের কোথাও কোথাও ব্যাপক বন্যা হয়।

নদীভাঙন : বাংলাদেশে প্রতিবছর নদীভাঙনের ফলে বসতভিটা ও ফসলি জমি নদীর বুকে বিলীন হয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ লোক সহায় সম্বলহীন হয়ে গ্রাম থেকে শহরে আশ্রয় নেয়।

ভূমিধস : ভূমিধস পাহাড়ি এলাকায় সংঘটিত হয়। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি প্রভৃতি পাহাড়ি এলাকায় বর্ষা মৌসুমে মাঝে মাঝে পাহাড় ধসে পড়ে। পাহাড়ের কোলঘেঁষে গড়ে ওঠা অনেক ঘরবাড়ি চাপা পড়ে, ঘটে প্রাণহানি। নির্বিচারে ও অনিয়মতান্ত্রিকভাবে পাহাড় কাটার কারণেও ভূমিধস হয়। ভূমিধসের কারণে পাহাড়ি এলাকায় সড়ক যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

ভূমিকম্প : ভূমিকম্প একটি ভয়াবহ ও মারাত্মক প্রাকৃতিক বিপর্যয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশে ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে রয়েছে। বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চল ও আসাম এলাকায় ১৮৯৭ সালে ৮.৭ মাত্রার ভূমিকম্পে প্রায় দেড় হাজার মানুষ মারা যায়। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, এ ধরনের ভূ কম্প একই এলাকায় একশ থেকে একশ ত্রিশ বছর পর আবার আঘাত হানতে পারে। এছাড়া প্রতি বছর ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী প্রভৃতি এলাকায় এক বা একাধিক মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

আর্সেনিক দূষণ : ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতিতে বাংলাদেশের মানুষের স্বাস্থ্য মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-

পূর্বাঞ্চল বিশেষ করে কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও নারায়ণগঞ্জ জেলার অধিবাসীরা মারাত্মক আর্সেনিক দূষণের শিকার।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতিকার : প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পূর্ণভাবেই প্রাকৃতিক। এ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব নয়। তবে নিম্নোক্তভাবে গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে এর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানো যায় :

১. এদেশের বন্যা সমস্যা মোকাবিলার জন্য উপকূলীয় অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বনায়ন করা এবং নদীর পানি বহন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য নদী খনন করা যেতে পারে।

২. ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস মোকাবিলায় আবহাওয়ার পূর্বাভাসের মাধ্যমে জনগণকে সতর্ক করতে হবে। উপকূলীয় অঞ্চল থেকে লোকজনকে দ্রুত সরিয়ে নিতে হবে নিরাপদ স্থানে। প্রয়োজনে আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে।

৩. ভূমিকম্প হলে তাৎক্ষণিকভাবে কোথায় আশ্রয় নিতে হবে সে সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে হবে। ধ্বংসযজ্ঞ হলে দ্রুত উদ্ধার তৎপরতা চালানোর জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকবল ও আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করতে হবে।

উপসংহার : প্রাকৃতিক দুর্যোগের কাছে মানুষ অসহায়। তবু অদৃষ্টবাদী হয়ে বসে না থেকে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে বন্যার মতো দুর্যোগ মোকাবিলা করা যায়। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করার জন্য রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা যেমন থাকা জরুরি তেমনি ব্যাপক জনসচেতনতারও প্রয়োজন।

সিলেট বোর্ড– ২০২৪

সেট : ঘ

বাংলা দ্বিতীয় পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 1 0 2

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময় : ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি কালো কালির বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. **ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্ব শব্দের উদাহরণ কোনটি?**
ক ঝাল-টাল খ কেক-টেক
গ ঝম ঝম ঘ নরম-সরম

২. **পূরণবাচক শব্দ 'আশিতম' এর অপর নাম কী?**
ক অশীতিতম খ অষ্টাদশী
গ নবতিতম ঘ নবনবতিতম

৩. **নিচের কোন বাক্যটি ভাববাচ্যের উদাহরণ?**
ক এবার বাঁশিটি বাজাও। খ তুমি কখন এলে?
গ এবার বাঁশিটি বাজানো হোক। ঘ চিঠিটা পড়া হয়েছে।

৪. **যে কারকে ক্রিয়ার উৎস নির্দেশ করা হয় তাকে কোন কারক বলে?**
ক কর্ম খ করণ গ অধিকরণ ঘ অপাদান

৫. **কোন বাক্যটি অনুজ্ঞাবাচক?**
ক তারা তোমাদের ভোলেনি। খ তার মঙ্গল হোক।
গ দারুণ! আমরা জিতে গিয়েছি। ঘ আমরা রোজ স্কুলে যাই।

৬. **'তুমি চেষ্টা না করায় ব্যর্থ হয়েছ'–এটি কোন প্রকারের বাক্য?**
ক সরল খ যৌগিক গ জটিল ঘ খণ্ড

৭. **কোন বাক্যটি নিত্য অতীতকালের উদাহরণ?**
ক বাতিটা জ্বলে উঠল। খ খুব সকালে ঘুম থেকে উঠতাম।
গ তারা মাঠে খেলছিল। ঘ আমরা তখন বই পড়ছিলাম।

৮. **শব্দের শেষে ই-কার ও উ-কার থাকলে–এ বিভক্তির রূপভেদ হয়–**
ক – এ খ – য়ে গ – তে ঘ – র

৯. **মানী পক্ষের বহুবচন করার সময়ে নিচের কোন লগ্নক যোগ করা হয়?**
ক মালা খ সমূহ গ আবলি ঘ বর্গ

১০. **পদের লগ্নক কয় ধরনের?**
ক দুই খ তিন গ চার ঘ পাঁচ

১১. **কোন বাক্যটি বিরোধ যোজকের উদাহরণ?**
ক যদি রোদ ওঠে, তবে রওনা দেব।
খ বসার সময় নেই, তাই যেতে হচ্ছে।
গ চা না-হয় কফি খান।
ঘ তাকে আসতে বললাম, তবু এলো না।

১২. **কোন বাক্যে ক্রিয়াজাত অনুসর্গ রয়েছে?**
ক মন দিয়ে লেখাপড়া করা দরকার।
খ আজ বাংলাদেশ বনাম ভারতের খেলা।
গ মাথার উপরে নীল আকাশ।
ঘ কার কাছে গেলে জানা যাবে?

১৩. **পদাণু ক্রিয়াবিশেষণের উদাহরণ কোনটি?**
ক লোকটি ধীরে হাঁটে। খ মরি তো মরব।
গ যথাসময়ে সে হাজির হয়। ঘ টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে।

১৪. **'চলন্ত ট্রেন'। এ বাক্যের বিশেষণ পদটি কোন শ্রেণির?**
ক গুণবাচক খ উপাদানবাচক
গ অবস্থাবাচক ঘ ভাববাচক

১৫. **'সমষ্টি' বিশেষ্য বোঝাতে নিচের কোন শব্দটি ব্যবহৃত হয়?**
ক সরলতা খ ভোজন গ বৈশাখ ঘ জনতা

১৬. **নিচের কোনটি থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে?**
ক দ্রাবিড়ীয় খ পূর্ব ভারতীয় প্রাকৃত
গ সংস্কৃত ঘ কেন্তুম

১৭. **প্রত্যক্ষ উক্তিতে চিরন্তন সত্যের উদ্ধৃতি থাকলে পরোক্ষ উক্তিতে কীসের পরিবর্তন হয় না?**
ক ক্রিয়ার কালের খ সর্বনাম পদের
গ ভাববিশেষ্যের ঘ উদ্ধরণ চিহ্নের

১৮. **লেখার সময় কোনো অংশ বাদ দিতে চাইলে কোন বিরাম চিহ্নের ব্যবহার করা হয়?**
ক কোলন খ বিন্দু
গ ত্রিবিন্দু ঘ সেমিকোলন

১৯. **নিচের কোন বাক্যে 'মাথা' শব্দটি লক্ষ্যার্থে ব্যবহৃত?**
ক তিনি মাথায় আঘাত পেয়েছেন।
খ আমার খুব মাথা ব্যথা করছে।
গ সে মাথায় পাগড়ি বেঁধেছে।
ঘ রফিক সাহেব গ্রামের মাথা।

২০. **'সুযোগ সন্ধানী' অর্থ কোন বাগ্‌ধারার মধ্যে রয়েছে?**
ক তীর্থের কাক খ লেফাফা দুরস্ত
গ দুধের মাছি ঘ ননীর পুতুল

২১. **'নন্দিনী'-এর সঠিক প্রতিশব্দ কোনটি?**
ক তনয় খ তটিনী গ দুহিতা ঘ কেশরী

২২. **'ভূত'-এর বিপরীত শব্দ হলো–**
ক পেত্নী খ ভবিষ্যৎ
গ ভীতু ঘ ভৃত্য

২৩. **নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধির উদাহরণ কোনটি?**
ক কুলটা খ গবাক্ষ
গ ষষ্ঠ ঘ বৃহস্পতি

২৪. **কোন শতকের সূচনা নাগাদ চলিত রীতির নতুন নাম হয় 'প্রমিত রীতি'?**
ক আঠারো খ উনিশ গ বিশ ঘ একুশ

২৫. **বাংলা ভাষায় কোন স্বরবর্ণটির সংক্ষিপ্ত রূপ নেই?**
ক এ খ ঔ গ অ ঘ ই

২৬. **নিচের কোন শব্দটিতে অর্ধস্বরধ্বনি রয়েছে?**
ক চাই খ যাও গ বউ ঘ সেই

২৭. **কোনটি পার্শ্বিক ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ?**
ক হ খ ল গ ম ঘ র

২৮. **'অভাব' অর্থ প্রকাশ করেছে কোন উপসর্গ যুক্ত শব্দটি?**
ক প্রগতি খ পরাজয়
গ আরক্ত ঘ হাভাত

২৯. **'নৈপুণ্য' অর্থে প্রত্যয়বাচক শব্দ কোনটি?**
ক ডিঙা খ নেয়ে
গ টেকো ঘ কানাই

৩০. **পারস্পরিক ক্রিয়ায় কোনো অবস্থা তৈরি হলে কোন বহুব্রীহি হয়?**
ক ব্যতিহার খ সমানাধিকার
গ ব্যাধিকরণ ঘ অলুক

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

সিলেট বোর্ড– ২০২৪

বাংলা দ্বিতীয় পত্র (রচনামূলক প্রশ্ন)

সেট : ০৩ বিষয় কোড : 1 0 2

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। উত্তর প্রাসঙ্গিক ও যথাযথ হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

১। যে-কোনো একটি বিষয়ে অনুচ্ছেদ লেখো : ১০

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়

(খ) সুন্দরবন।

২। (ক) মনে করো, তুমি সামি/সামিয়া। তুমি শরীয়তপুর জেলার জাজিরা উপজেলার নলশিশা গ্রামের বাসিন্দা। তোমার এলাকার স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দুর্দশার কথা জানিয়ে যে-কোনো জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশের উপযোগী একটি পত্র লেখো। ১০

অথবা,

(খ) মনে করো, তুমি মাহিদ/মায়িশা। তুমি গাজীপুর জেলার বাসিন্দা। সম্প্রতি তুমি বাংলাদেশের একটি ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণ করেছো। তোমার ভ্রমণ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে কুমিল্লায় বসবাসকারী তোমার বন্ধু/বান্ধবী নাফিস/ নাফিসাকে একটি পত্র লেখো।

৩। (ক) সারাংশ লেখো : ১০

সমাজের কাজ কেবল মানুষকে টিকে থাকার সুবিধা দেওয়া নয়, মানুষকে বড়ো করে তোলা, বিকশিত জীবনের জন্য মানুষের জীবনে আগ্রহ জাগিয়ে দেওয়া। স্বল্পপ্রাণ, স্থূলবুদ্ধি ও জবরদস্তি প্রিয় মানুষে সংসার পরিপূর্ণ। তাদের কাজ নিজের জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলা নয়, অপরের সার্থকতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা। প্রেম ও সৌন্দর্যের স্পর্শ লাভ করেনি বলে এরা নিষ্ঠুর ও বিকৃতবুদ্ধি। এদের একমাত্র দেবতা অহংকার। তারই চরণে তারা নিবেদিত প্রাণ। ব্যক্তিগত অহংকার, পারিবারিক অহংকার, জাতির অহংকার ও ধর্মগত অহংকার এ সবের লাল নিশান ওড়ানোই এদের কাজ। মাঝে মাঝে মানবপ্রেমের কথাও তারা বলে। কিন্তু তাতে নেশা ধরে না, মনে হয় তা আন্তরিকতাহীন ও উপলব্ধিহীন বুলি মাত্র।

অথবা,

(খ) সারমর্ম লেখো :

তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
সাকিনা বিবির কপাল ভাঙলো,
সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর।
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাংক এলো
দানবের মতো চিৎকার করতে করতে,
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
ছাত্রাবাস, বস্তি উজাড় হলো। রিকয়েললেস রাইফেল
আর মেশিনগান খই ফোটালো যত্রতত্র।
তুমি আসবে বলে ছাই হলো গ্রামের পর গ্রাম।
তুমি আসবে বলে বিধ্বস্ত পাড়ায় প্রভুর বাস্তুভিটার
ভগ্নস্তূপে দাঁড়িয়ে একটানা আর্তনাদ করলো একটা কুকুর।
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
অবুঝ শিশু হামাগুড়ি দিলো পিতামাতার লাশের উপর।

৪। যে-কোনো একটি ভাব-সম্প্রসারণ করো : ১০

(ক) আপনি আচরি ধর্ম শিখাও অপরে।

(খ) মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয়, আড়ালে তার সূর্য হাসে,
হারা শশীর হারা হাসি, অন্ধকারেই ফিরে আসে।

৫। (ক) মনে করো, তুমি শামস্/শামা। তোমার বিদ্যালয়ের নাম আলোকদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়। তোমার বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায়-সংবর্ধনা ও নবীন শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিয়ে যে-কোনো জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি প্রতিবেদন লেখো। ১০

অথবা,

(খ) মনে করো, তুমি তাহিন/তাহিয়া। তুমি বগুড়া জেলার কাহালু উপজেলায় বাস করো। তোমার এলাকার বৃক্ষরোপণ উৎসব বিষয়ে যে-কোনো জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি প্রতিবেদন লেখো।

৬। যে-কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করো : ২০

(ক) বাংলাদেশের উৎসব।

(খ) অদম্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ।

(গ) মাদকাসক্তি ও এর প্রতিকার।

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	গ	২	ক	৩	গ	৪	ঘ	৫	খ	৬	ক	৭	খ	৮	গ	৯	ঘ	১০	গ	১১	ঘ	১২	ক	১৩	খ	১৪	গ	১৫	ঘ
	১৬	খ	১৭	ক	১৮	গ	১৯	ঘ	২০	ক	২১	গ	২২	খ	২৩	ঘ	২৪	ঘ	২৫	গ	২৬	ক	২৭	খ	২৮	ঘ	২৯	খ	৩০	ক

রচনামূলক

১. ক. উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত বহু বিদ্যাচর্চার প্রতিষ্ঠানকে বলে বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে একদিকে যেমন জ্ঞান বিতরণ করা হয়, অন্যদিকে তেমন নতুন জ্ঞান সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণিগুলোতে জ্ঞান বিতরণ করা হয় এবং যাঁরা নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করেন তাঁদের এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করা হয়। যাঁরা জ্ঞান বিতরণের সঙ্গে জড়িত তাঁরা অধ্যাপক নামে এবং যাঁরা জ্ঞান সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত তাঁরা গবেষক নামে পরিচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাশাখাগুলোকে সাধারণত মানবিক, সমাজতত্ত্ব, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কৃষি, আইন, চারুকলা, প্রযুক্তি, চিকিৎসা প্রভৃতি শৃঙ্খলা বা অনুষদে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। প্রাচীন কালে উপমহাদেশে একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল যার নাম নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। এর বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থান বাংলাদেশের সীমানার অদূরে। পৃথিবীর প্রাচীনতম যে বিশ্ববিদ্যালয়টি এখনো চালু আছে তার নাম আল কারাওয়াইন বিশ্ববিদ্যালয়। এটি মরক্কোর ফেজ শহরে অবস্থিত। বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯২১ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দেড় শতাধিক। এগুলো বিভিন্ন শ্রেণিনামে পরিচিত : স্বায়ত্তশাসিত, সরকারি, বেসরকারি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, কৃষি, প্রকৌশল, মেডিকেল, বিশেষায়িত, কেন্দ্রীয়, আন্তর্জাতিক ইত্যাদি। জ্ঞানচর্চার মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বিশ্বকে কল্যাণমূলক ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

১. খ. বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে অবস্থিত বিস্তৃত একটি ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবন নামে পরিচিত। নানা ধরনের গাছপালায় পরিপূর্ণ এই সুন্দরবনে বিচিত্র বন্যপ্রাণী বাস করে। সুন্দরবনের মোট আয়তন প্রায় চার হাজার বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ বাংলাদেশে এবং বাকি অংশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলার অংশবিশেষ নিয়ে বাংলাদেশ অংশের সুন্দরবন বিস্তৃত। প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডার হিসেবে সুন্দরবন বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখান থেকে সংগৃহীত হয় নানা ধরনের কাঠ, মধু, মোম ও মৎস্য। প্রায় চারশো নদী ও খাল এবং প্রায় দুইশো দ্বীপ রয়েছে সুন্দরবনে। সুন্দরবনে যেসব গাছ জন্মে এর মধ্যে সুন্দরী, গোলপাতা, কেওড়া, গেওয়া, গরান, বাইন, ধুন্দুল, পশুর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই বনে বাস করে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রা হরিণ, মায়া হরিণ, বন্য শূকর, বানর, বনবিড়াল, সজারু ইত্যাদি বন্যপ্রাণী। বিচিত্র প্রজাতির পাখির কলকাকলিতে সুন্দরবন মুখর থাকে। ১৯৯৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর ইউনেস্কো সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

২. ক.

২০শে অক্টোবর, ২০২...

বরাবর
সম্পাদক,
দৈনিক ইনকিলাব,
২/১, আর. কে. মিশন রোড, ঢাকা।

বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।

জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত 'দৈনিক ইনকিলাব' পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশ করলে কৃতার্থ হব।
বিনীত
সামিয়া রহমান
জাজিরা, শরীয়তপুর।

জাজিরা বাজার স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির প্রতি নজর দিন

শরীয়তপুর জেলার জাজিরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিতে আশেপাশের প্রায় দশ গ্রামের মানুষ দীর্ঘদিন এ স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে স্বাস্থ্যসেবা লাভ করে আসছে। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে এখানকার চিকিৎসাব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। বিল্ডিংগুলো পুরানো ও জরাজীর্ণ হয়ে গেছে। নিয়মিত ঔষধ সরবরাহ নেই। আউটডোর, ইনডোর মিলিয়ে পাঁচ জন ডাক্তারের পদ শূন্য হয়ে আছে। সামান্য ঔষধপত্র যা আসে তারও ব্যবস্থাপত্র দেওয়ার কেউ নেই। এভাবে সঠিক চিকিৎসার অভাবে রোগীর অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ছে। এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যে, কোনো রোগীর প্রতি সঠিক সময় সঠিক চিকিৎসাটি প্রয়োগ না করার ফলে তার মৃত্যুও ঘটেছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির দুরবস্থা থেকে উন্নতি না হলে গ্রামের মানুষের পক্ষে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

এ পরিস্থিতিতে এলাকার জনগণের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনধারা ফিরিয়ে আনতে এবং জীবনের নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির মান উন্নত করে ও সংস্কার করে সেখানে উন্নত প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি ও ওষুধ সামগ্রীর সুব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে আমরা বিভিন্ন মহলে আবেদন জানিয়েছি। কিন্তু তারা এখন পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

সুতরাং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন, এ ব্যাপারে যেন আশু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

নিবেদক
এলাকাবাসীর পক্ষে
সামিয়া রহমান

২. খ.

২৫শে মে, ২০২...
গাজীপুর।

প্রিয় নাফিস,

শুরুতেই শুভেচ্ছা নিয়ো। অনেক দিন তোমার কোনো চিঠিপত্র পাচ্ছি না। আশা করি সবাইকে নিয়ে ভালো আছ। গত 'মাঘী পূর্ণিমার' ছুটিতে আমি আর সুব্রত বগুড়া জেলায় অবস্থিত ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহাস্থানগড় দেখতে গিয়েছিলাম। মহাস্থানগড়ের প্রাচীন পুরাকীর্তি বৌদ্ধযুগের স্থাপত্য নিদর্শন ও ভাস্কর্য সম্পর্কে শুধু বইতে পড়েছি। এবার স্বচক্ষে দেখে মুগ্ধ হলাম। প্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শনের কথা চিঠিতে লিখে ঠিক তোমাকে বোঝাতে পারব কি না জানি না। তবুও ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের আনন্দঘন অভিজ্ঞতা তোমার সাথে ভাগ করে নিতেই কলম ধরলাম।

দিনটি ছিল মঙ্গলবার। সকাল বেলায় নাস্তা খেয়ে আমরা দুজন মহাস্থানগড়ের উদ্দেশে রওয়ানা দিলাম। সেখানে পৌঁছে দেখতে পেলাম রাস্তার পাশে ভগ্নপ্রায় বিরাট দ্বিতল ইমারত। সামনে বিশাল পুকুর। চারপাশে সারি সারি গাছ। পুরাতন সেই ইট-পাথরের প্রতিমূর্তি বাংলার অবলুপ্ত শৌর্যবীর্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রাস্তার দুপাশে রয়েছে পুরানো অট্টালিকা। প্রাচীন যুগের কিছু স্থাপত্য নিদর্শন এবং ইতিহাসের উত্থান-পতনের কাহিনি। এসব দেখতে দেখতে যেন অতীতে হারিয়ে গেলাম। সময় পেলে তুমিও একবার দেখতে এসো বাংলার ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহাস্থানগড়। ভালো লাগবে। তোমার লেখাপড়া কেমন চলছে? ভালো থেকো। তোমার সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করছি।

ইতি
তোমার বন্ধু
মাহিদ

[**বি. দ্র. :** পত্রের শেষে ডাকটিকিট সংবলিত খাম ও ঠিকানা ব্যবহার অপরিহার্য।]

৩. ক. মানুষকে বড়ো করে তোলাই সমাজের কাজ, তাকে বিকশিত করাও তার লক্ষ্য। কিন্তু স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন কিছু লোক অপরের সার্থকতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। তারা প্রেম ও সৌন্দর্যের স্পর্শ পায়নি; বরং অহংকাররূপ দেবতার হাতের পুতুল। এই অহংকার ব্যক্তি থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত।

৩. খ. অনেক ত্যাগ ও তিতিক্ষার বিনিময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। শত্রুবাহিনীর চরম আক্রোশ ও নির্মমতার শিকার হয়েছে নারী, শিশুসহ আপামর জনসাধারণ। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনের বিনিময়ে পাওয়া এই স্বাধীনতাকে কোনো মূল্যে পরিমাপ করা যায় না।

৪. ক. ব্যক্তির জীবনাচরণের মধ্যে যা নেই, তা পালনের জন্য অন্যকে উপদেশ দেওয়া যায় না। অন্যকে উপদেশ দেওয়ার আগে নিজেকে তা পালন করে দেখাতে হয়। এর ফলে যাকে উপদেশ দেওয়া হয়, সে তা পালন করতে আন্তরিকভাবে উদ্বুদ্ধ হয়।

কাউকে উপদেশ দেওয়া যত সহজ, উপদেশ পালন করা তার চেয়ে অনেক কঠিন। যে উপদেশ দেয়, সে যদি নিজে তা পালন না করে, তাহলে উপদেশ-গ্রহণকারীর কাছে এর গুরুত্ব থাকে না। অন্যদিকে উপদেশ দানকারী যদি সেই উপদেশের পালনীয় দিক নিজ জীবনে পালন করে দেখান, তাহলে উপদেশ-গ্রহণকারী উপদেশ পালনের দৃষ্টান্ত পেয়ে যান, যা তার জীবনাচরণে প্রভাব ফেলে। সাধারণত ধর্মপ্রবর্তক, ধর্মপ্রচারক, জ্ঞানী ব্যক্তি বা জীবনে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তদের তরফ থেকে উপদেশ-বাণী বর্ষিত হয়ে থাকে। এঁদের দেওয়া উপদেশ মানুষ পালন করতে দ্বিধা করে না। তবে উপদেশ হিসেবে বর্ষিত কথাটুকু তাঁরা নিজেদের জীবনেও অনুসরণ করেন কি না– এ বিষয়ে তাঁদেরকে সতর্ক থাকতে হয়। সমাজে অনেক মানুষ থাকে, যারা উপদেশ দিতে খুব পটু, কিন্তু ওইসব উপদেশ তারা নিজেরাই পালন করতে অভ্যস্ত নয়। তখন উপদেশগুলো উপদেশ-গ্রহণকারীর কাছে সেইভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোনো একজন লোক নিয়মিত ধূমপান করে, আবার সে যদি অন্যকে ধূমপান করতে নিষেধ করে, তাহলে তা হাস্যকর উপদেশে পরিণত হয়। তাই কোনো একটা ভালো কাজ করতে অন্যকে উদ্‌বুদ্ধ করার আগে উপদেশদাতাকেই ভালো কাজটি করতে অভ্যস্ত হতে হবে। তাতে উপদেশ-গ্রহণকারী উপদেশের পাশাপাশি উপদেশ পালনের নজিরও গ্রহণ করতে পারে।

কাউকে উপদেশ দেওয়ার মধ্য দিয়ে ভালো মানুষ সাজার ভান করা খুব সহজ, কিন্তু উপদেশ পালন করা খুব কঠিন কাজ। তবে সেই উপদেশদাতাই সর্বোত্তম, যিনি নিজে যা পালন করেন, অন্যকেও তা পালন করতে বলেন।

৪. খ. হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ নিয়েই মানুষের জীবন। দুঃখের সময় ভেঙে পড়লে চলবে না। কেননা দুঃখের পরেই আসে সুখ। দুঃখের পাশাপাশি সুখ আসবে এটাই স্বাভাবিক।

জগৎ সংসারে মানুষ সর্বদাই সুখের কাঙাল, মানুষের প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্তই সুখের হয়ে উঠুক এটাই প্রার্থিত। দুঃখকে পরিহার করার সংগ্রামেই মানুষ প্রতিনিয়ত ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সুখ অর্জনের জন্য কষ্টের প্রয়োজন। আর এই কষ্টই হলো দুঃখকে বরণ করে নেওয়া। আর এ দুঃখের রজনী যতই গভীর হয় সুখের অভ্যুদয় ততই নিকটবর্তী হয়ে আসে। পতঙ্গ আনন্দ বিহারে যতই উর্ধ্ব গগনে উড়তে থাকে, ততই এর পতনের মুহূর্ত নিকটবর্তী হতে থাকে। দুঃখের রাত্রি পার হয়েই আসে আনন্দঘন সুপ্রভাত। সুখ মানুষকে আনন্দ দেয়। তাই সুখের প্রতিই তার পক্ষপাতিত্ব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুঃখ হতেও যে অমৃত লাভ করা যায়, মানুষ তা অনুভব করে না। বাস্তব জীবনেও দুঃখ কষ্টের প্রয়োজন আছে। মাতৃস্নেহের মূল্য দুঃখে, পতিব্রতের মূল্য দুঃখে, বীর্যের মূল্য দুঃখে, পুণ্যের মূল্য দুঃখে। দুঃখের অগ্নিপরীক্ষার ভেতর দিয়েই মানুষের চিত্ত শুচিশুভ্র হয়ে ওঠে, মানুষ নতুনতর মহিমান্বিত জীবন লাভ করে। সুতরাং দুঃখের পথ বেয়েই আসে সুখ শান্তির আয়োজন। মেঘ যতই গভীর ও ঘনতর হয়ে আসুক না কেন, সূর্যকে গ্রাস করবার বা অবলুপ্ত করবার মতো ক্ষমতা তার নেই। মেঘ সব সময় থাকে না। মেঘ কেটে গিয়ে সূর্য হেসে উঠবেই। পতনোন্মুখ তরঙ্গও আবার পরক্ষণে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। অমাবস্যার যে অন্ধকার চাঁদকে সাময়িকভাবে গ্রাস করেছে তার পরদিনই হেসে ওঠে নতুন চাঁদ। শীত চিরস্থায়ী নয়। শীতের পর বসন্ত আসবেই।

সুতরাং মানুষকে দুঃখরূপ কালো মেঘের ঘনঘটায় ভেঙে পড়লে চলবে না, বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাসে তার মোকাবিলা করতেই হবে। মনে রাখতে হবে, দুঃখের কালো মেঘ কেটে এক সময় সুখের সোনালি সূর্য হেসে উঠবেই।

৫. ক.

বরাবর
সম্পাদক,
দৈনিক ইনকিলাব,
২/১, আর. কে. মিশন রোড, ঢাকা।

বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।

জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত 'দৈনিক ইনকিলাব' পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশ করলে কৃতার্থ হব।
বিনীত
শামস্
আলোকদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়।

আলোকদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের নবীনবরণ ও বিদায় অনুষ্ঠান

গত ২৩শে জানুয়ারি, ২০২... তারিখে আলোকদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের নবীনবরণ ও বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ এ্যাডভোকেট ইসলাম উদ্দীন খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মনিরুজ্জামান মনির। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবুল আহাদ। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করে স্ব স্ব ধর্মের অনুসারী শিক্ষার্থীরা। তারপর শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ওই অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ও বাংলা বিষয়ের শিক্ষক সরোজ মোস্তফা। এরপর শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে বক্তব্য দেওয়া শুরু হয়। বক্তব্য প্রদান করে বিজ্ঞান বিভাগের বিদায়ী শিক্ষার্থী অপু ও মিতু, মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থী রিফাত ও আবিদ এবং ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের নবীন শিক্ষার্থী হাসান ও রফিক। এসময় এক আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। অনেকে তাদের দীর্ঘদিনের ছাত্রজীবনের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে চোখ অশ্রুসজল করে ফেলে। অনেকে আবার স্কুলজীবনের মজার স্মৃতিগুলো সবার সামনে তুলে ধরে। শিক্ষকরা খুব মন দিয়ে নবীন ও বিদায়ী শিক্ষার্থীদের কথা শোনেন। বিশেষ অতিথি শিক্ষার্থীদের নির্ভীকভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পরামর্শ দেন। প্রধান অতিথি শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মানুষ হওয়ার দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের ভালো ফল প্রত্যাশা করেন। এরপর অতিথিরা স্মারক হিসেবে শিক্ষার্থীদের হাতে ক্রেস্ট ও শুভেচ্ছা উপহার তুলে দেন। স্কুলের মাঠে নবীন ও বিদায়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে নাস্তা পরিবেশন করা হয়।

এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিদায়ী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নবাগত শিক্ষার্থীদের একটি সেতুবন্ধ রচিত হয়। তাছাড়া শিক্ষকদের সঙ্গেও শিক্ষার্থীদের একটি উষ্ণ ভাববিনিময় হয়। ভবিষ্যতে এই স্মৃতিগুলো শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক প্রেরণা জোগাবে।

প্রতিবেদকের নাম ও ঠিকানা	:	শামস্ আলমগীর, মানবিক বিভাগ, দশম শ্রেণি
প্রতিবেদনের শিরোনাম	:	আলোকদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে নবীনবরণ ও বিদায় অনুষ্ঠান
প্রতিবেদনের ধরন	:	বিশেষ প্রতিবেদন
প্রতিবেদন রচনার তারিখ ও সময়	:	২৫শে জানুয়ারি, ২০২...; রাত ৯টা।

৫. খ.

বগুড়ার কাহালু উপজেলায় বৃক্ষমেলা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাহালু, ১৪ই জুলাই, ২০২... : ১০ই জুন থেকে বগুড়ার কাহালু ফুটবল মাঠে সপ্তাহব্যাপী বৃক্ষমেলা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন স্থান থেকে আসা প্রায় ৬৫টি স্টল মেলায় অংশগ্রহণ করে। স্থানীয়ভাবে মানুষের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে এ মেলা। মেলায় ছিল মানুষের উপচে-পড়া ভিড়। শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণিসহ সব বয়স এবং সব শ্রেণি-পেশার মানুষ এ মেলায় অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন স্টল ঘুরে ঘুরে দেখেন। মেলায় প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা বিক্রি হয়।

মেলা উপলক্ষ্যে প্রতিদিন বিকালবেলা আলোচনা সভা ও সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদ্দীপনামূলক ও গণসংগীতের ব্যবস্থাও ছিল মেলায়। মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উপপরিচালক জনাব আলি ইদ্রীস সুজন। আলোচনায় অংশ নেন আজিজুল হক বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রফেসর ড. ইফতেখারুল আমীন, জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি জামিল হোসেন এবং উপজেলা কৃষি অফিসার মামুন সরোয়ার। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বগুড়া জেলাপ্রশাসক ইয়াসিন মোল্লা।

বক্তাগণ বলেন যে, আমাদের দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা দরকার। কিন্তু রয়েছে মাত্র ১৬ শতাংশ। দেশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে ৩০ শতাংশ বনভূমি গড়ে তোলার পরিকল্পনা করে সে মোতাবেক অগ্রসর হতে হবে। বক্তাগণ প্রত্যেককে অন্তত তিনটি করে চারাগাছ লাগানোর জন্য আহ্বান জানান। তাহলে আমাদের দেশে অতিরিক্ত প্রায় ৬০ কোটি গাছ লাগানো সম্ভব হবে; যা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। মেলায় সমাপনী দিনে শ্রেষ্ঠ স্টলের পুরস্কার প্রদান করা হয়। শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করে সবুজায়ন নার্সারি।

৬. ক. **ভূমিকা :** গ্রামবাংলার উৎসব মানুষের প্রাণের স্পন্দন। বহুকাল আগে থেকেই আমাদের সমাজে নানা উপলক্ষ্যে উৎসব পালিত হয়ে আসছে। উৎসব আনন্দ-বিনোদনের মাধ্যম। বাঙালির জাতীয় জীবনে সামাজিক উৎসবের প্রভাব অনস্বীকার্য। এটি মানুষের মনকে প্রফুল্ল করে। মানসিক বিকাশে ও আনন্দদানে সামাজিক উৎসব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন সামাজিক উৎসব বাঙালি জাতির চেতনায় মিশে আছে।

উৎসব : সহজ কথায় 'উৎসব' কথাটির অর্থ হলো আনন্দ বা জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান। এটি হলো মানুষের আনন্দ প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। মূলত উৎসব বলতে এমন অনুষ্ঠানকে বোঝায়, যা অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হয়।

উৎসবের ধরন : উৎসবকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়। যেমন– ব্যক্তিগত উৎসব, পারিবারিক উৎসব, সামাজিক উৎসব, ধর্মীয় উৎসব, রাজনৈতিক উৎসব, সাংস্কৃতিক উৎসব, জাতীয় উৎসব, স্মরণোৎসব প্রভৃতি। বিভিন্ন দিবস বা উপলক্ষ্যকে সামনে রেখে মানুষ এসব উৎসব পালন করে থাকে।

সামাজিক উৎসব : বাংলাদেশের প্রধান সামাজিক উৎসব হলো পহেলা বৈশাখ। এরূপ সামাজিক উৎসব বাঙালি জাতির ঐতিহ্যের ধারক। ঐতিহ্যগতভাবে সামাজিক উৎসবে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ অংশ নেয়। বাংলা বছরের প্রথম দিন পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপনে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শেণির মানুষ উৎসবে মেতে ওঠে। পহেলা বৈশাখের সাথে মেলার সম্পর্ক সুনিবিড়। এ লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে বৈশাখী মেলা বসে। এ মেলায় আয়োজিত ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প প্রদর্শনী, নাচ, গান, লাঠি খেলা, পুতুলনাচ, সার্কাস প্রভৃতি দর্শকদের আনন্দ দেয়। পহেলা বৈশাখকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রীরা বর্ণাঢ্য বৈশাখী মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন করে। পহেলা বৈশাখের সাথে আরও দুটি অনুষ্ঠান সম্পৃক্ত। একটি হলো পুণ্যাহ এবং আরেকটি হলো হালখাতা। পুণ্যাহ প্রাচীন জমিদারদের খাজনা আদায়ের অনুষ্ঠান। তাই জমিদারি প্রথা না থাকায় এখন এ অনুষ্ঠান বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর হালখাতা অনুষ্ঠান এখনো প্রচলিত আছে। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। পহেলা বৈশাখের হালখাতা অনুষ্ঠানে ব্যবসায়ীরা পুরাতন বছরের হিসেবের খাতা বাদ দিয়ে নতুন বছরের হিসেবের খাতা খোলে। দোকানপাট রঙিন কাগজ দিয়ে অত্যন্ত সুন্দর করে সাজানো হয়। আর ক্রেতাদের মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করা হয় ও বকেয়া টাকা তোলা হয় এ দিনে। এছাড়াও ইংরেজি মাসের প্রথম দিন ইংরেজি নববর্ষ পালন করা হয় উৎসবমুখর পরিবেশে। নবান্ন উৎসব, বসন্তবরণ উৎসব, বর্ষবরণ উৎসব, উপজাতিদের বৈসাবিসহ বিভিন্ন উৎসব আমাদের সংস্কৃতির একটি অংশ। বিয়ে একটি প্রাচীন সামাজিক প্রথা। বিয়েকে কেন্দ্র করে দুটি পরিবারের মধ্যে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এছাড়া পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন সকলের সম্মিলনে একটি প্রাণময় উৎসব হলো বিয়ের অনুষ্ঠান, যা অন্যতম একটি সামাজিক উৎসব।

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক উৎসব : মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের কিছু বিষয় বা ঘটনা নিয়েও বিভিন্ন উৎসব পালন করার রীতি আমাদের সমাজে প্রচলিত রয়েছে। আবার পারিবারিক বিভিন্ন উৎসব; যেমন– বিবাহ, সুন্নতে খাতনা, সন্তানের অন্নপ্রাশন, হিন্দুদের শ্রাদ্ধ, নবান্ন প্রভৃতি উৎসব পারিবারিক পরিবেশে অত্যন্ত জৌলুস করে পালন করা হয়। অনেক পরিবারে অনেকে জাঁকজমকপূর্ণভাবে জন্মদিন পালন করে থাকে। আবার পরিবারের কারও বিয়ে উপলক্ষ্যে সেই বাড়ি বা এলাকা উৎসবমুখর হয়ে ওঠে।

ধর্মীয় উৎসব : বাংলাদেশের প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আবার নিজস্ব বিভিন্ন উৎসব রয়েছে। এদেশের প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায় মুসলমান। মুসলমানদের প্রধান দুটি উৎসব হলো ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা। দীর্ঘ একমাস সিয়াম সাধনার পর মুসলমানরা ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপন করে। আর ঈদুল আজহায় পশু কোরবানি করা হয়। এছাড়াও মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা মহররম, হিজরি নববর্ষ, ঈদ-ই-মিলাদুন্নবি (স), শবে বরাত, শবে কদর প্রভৃতি উৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করে থাকে। হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হলো দুর্গাপূজা। এছাড়াও রয়েছে দোলযাত্রা, জন্মাষ্টমী, চৈত্রসংক্রান্তি, হোলি প্রভৃতি উৎসব। এসব উৎসব অনুষ্ঠানে হিন্দুদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বয়ে চলে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড়ো ধর্মীয় উৎসব বৌদ্ধ পূর্ণিমা। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড়ো উৎসব যিশুখ্রিষ্টের জন্মদিন বা বড়োদিন। এছাড়া ইস্টার সানডেতেও খ্রিস্টানরা উৎসব পালন করে থাকে।

সাংস্কৃতিক উৎসব : বাঙালির রয়েছে নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপলক্ষ্যকে সামনে রেখে যে সংস্কৃতির চর্চা করে তা বোঝা যায় বাংলাদেশের পালিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উৎসব দেখে। পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে বইমেলা, বিজ্ঞান মেলা, রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী প্রভৃতি বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সাংস্কৃতিক উৎসব। এছাড়া আলোচনা সভা, জ্ঞানচর্চামূলক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি প্রভৃতিও সংস্কৃতিকে দৃঢ় করে। সংস্কৃতিমনা লোকেরা এসব উৎসব থেকে জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করে। তাছাড়া জাতীয় চিত্রকলা প্রদর্শনী, আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, এশীয় চিত্রকলা প্রদর্শনী, লালন উৎসব, পিঠা উৎসব, ঘুড়ি উৎসব প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নতুন মাত্রা যোগ করে। সাংস্কৃতিক এসব উৎসব গ্রামবাংলার সংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করে দেশকে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারে।

জাতীয় উৎসব : বাংলাদেশের প্রধান জাতীয় উৎসব হলো ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস ও ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস। এ দিবস অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে এদেশের মানুষ পালন করে। দল-মত নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষ এসব দিবস উদ্‌যাপনে অংশ নেয়। বাঙালি জাতির জীবনে এসব দিবস পরিণত হয়েছে জাতীয় উৎসবে। এসব উৎসব উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সভা, সমাবেশ, সেমিনার, মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়ে থাকে। তাছাড়াও বিভিন্ন স্থানে মেলা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বিভিন্ন প্রদর্শনীর আয়োজন থাকে। ২১শে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায়। দিবসটি বাঙালি জাতির জন্য এক শোকবিধুর দিবস। দিবসটি উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে মাসব্যাপী বইমেলার আয়োজন করা হয়। এ বইমেলা আমাদের জন্য একটি জাতীয় উৎসব। জাতীয় উৎসবগুলো সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়।

উৎসবের অসাম্প্রদায়িক চেতনা : এদেশের সামাজিক উৎসব সম্প্রদায়নিরপেক্ষ চেতনার স্মারক। সুখী ও সমৃদ্ধ দেশগঠনের পূর্বশর্ত হলো অসাম্প্রদায়িক চেতনায় সমাজ গঠন। আর এসব উৎসব মানুষকে সম্প্রদায়নিরপেক্ষ চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। সমাজে বসবাসকারী মানুষ একে অপরের সাথে মিলেমিশে বাস করে। ঈদ উৎসবে মুসলমানরা অন্য ধর্মের বন্ধুবান্ধবদের আমন্ত্রণ জানায়। হিন্দুদের দুর্গাপূজা, সরস্বতী পূজা প্রভৃতি বড়ো বড়ো উৎসবে হিন্দুরা অন্য ধর্মাবলম্বীদের আমন্ত্রণ জানায়। খ্রিস্টান ও বৌদ্ধরাও তাদের উৎসবে সবাইকে দাওয়াত করে। এভাবে প্রতিটি ধর্মের লোকেরা পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। আর ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে গড়ে ওঠে ভ্রাতৃত্ববোধ।

উপসংহার : বাংলাদেশে বহু সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান হয়। যে-কোনো উৎসবই আবহমান বাঙালি-সংস্কৃতি ধারণ করে। উৎসবের মধ্যেই আমরা খুঁজে পাই বাঙালি জাতির স্বাধীন সত্তা। তাই জাতীয় জীবনে সামাজিক উৎসবসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৬. খ. **ভূমিকা :** বাংলাদেশের অগ্রগতি অপ্রতিরোধ্য। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে বাংলাদেশ বর্তমানে নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। কিছুদিন আগেও বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায় ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, ২০২৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবে। যোগ্য নেতৃত্ব, যথাযথ ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, মানবসম্পদ উন্নয়ন, অবকাঠামো ও প্রযুক্তির উন্নয়ন, বৈদেশিক বাণিজ্যের বিস্তৃতি, বৈদেশিক কর্মসংস্থান, শক্তিশালী বাজার পরিকল্পনা প্রভৃতির কারণে বাংলাদেশ যেভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তা নজিরবিহীন।

অর্থনৈতিক সূচকে বাংলাদেশ : ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের গড় উৎপাদন প্রবৃদ্ধির (জিডিপি) হার ছিল ৫.৪ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয় ছিল ৫৪৩ মার্কিন ডলার (প্রায় ৪৫,০০০ টাকা)। অথচ ২০১৮–২০১৯ অর্থবছরে এই হার ৮.১৩ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয় ১৯০৯ মার্কিন ডলার (প্রায় ১,৬১,০০০ হাজার টাকা)। শুধু মানুষের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে তা-ই নয়,বেড়েছে মানুষের গড় আয়ু। বাজেটের আকার রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাজেট বাস্তবায়নে কমছে পরনির্ভরতা। সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধির কারণে দারিদ্র্যের হার নিম্নমুখী। বর্তমান সময়ে দারিদ্র্যের হার ১৪ শতাংশেরও কম; আর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি বিবেচনায় বিশ্বে বাংলাদেশ এখন দ্বিতীয় অবস্থানে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নের যে-কোনো সূচকের বিচারে বাংলাদেশের অগ্রগতি অভূতপূর্ব।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন : একটি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার দৃশ্যমান দিক হচ্ছে অবকাঠামোগত উন্নয়ন। এর মধ্য দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও জীবনমানের গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করা যায়। গত এক দশকে বাংলাদেশের এই অবকাঠামোগত উন্নয়ন চোখে পড়ার মতো। বড়ো বড়ো প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অল্প দিনের মধ্যেই চালু হবে বাংলাদেশের জনমানুষের বহুকাঙ্ক্ষিত পদ্মাসেতু। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু নির্মাণের সফলতা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে একটি মাইলফলক। এছাড়া রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর, ঢাকা মেট্রোরেলসহ দেশে ছোটো-বড়ো অনেক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব অবকাঠামো যথাসময়ে সম্পন্ন হলে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে আরও এগিয়ে যাবে। এছাড়া সড়ক নির্মাণ, সেতু নির্মাণ, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-স্থানীয় প্রশাসনের বিভিন্ন ভবন নির্মাণও বর্তমানে দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হচ্ছে। শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং রপ্তানিকে সামনে রেখে পৃথক পৃথক অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে সারা দেশে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশীয় সম্পদ ব্যবহার করে দেশে উৎপাদন ব্যবস্থা সচল হবে, রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন বাড়বে, বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটবে।

প্রযুক্তিগত উন্নয়ন : প্রযুক্তিগত উন্নয়ন বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে আরও গতিশীল করে তুলছে। দেশের তৃণমূল পর্যায়ে প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য দেশের ৪৫৫০টি ইউনিয়ন পরিষদে 'ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার ' স্থাপন করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি উপজেলাকে ইন্টারনেট সেবার আওতায় আনা হয়েছে। টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে বাংলাদেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১২ কোটির অধিক এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজ ও স্বচ্ছ করতে ই-পেমেন্ট ও মোবাইল ব্যাংকিং চালু করা হয়েছে। থ্রি-জি ও ফোর-জি প্রযুক্তির মোবাইল নেটওয়ার্কের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটাইলাইট-১ উৎক্ষেপণ বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতে যুগান্তকারী ঘটনা। এটি বাংলাদেশের নিজস্ব সম্প্রচার উপগ্রহ। ২০১৮ সালের ১১ই মে যুক্তরাষ্ট্রের কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে এটি উৎক্ষেপণ করা হয়। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত ছবি ও তথ্যের মাধ্যমে দেশের সম্প্রচার কার্যক্রম সমৃদ্ধ হচ্ছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবেও লাভবান হচ্ছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন : বাংলাদেশ বিপুল জনসংখ্যার দেশ। এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে যথাযথ পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে সরকার কাজ করছে। সর্বস্তরে শিক্ষাকার্যক্রম নিশ্চিত করার ফলে একটি কর্মক্ষম দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে উঠছে। মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণ প্রভৃতির মাধ্যমে দেশে দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরি হচ্ছে। দেশে ও দেশের বাইরে উভয় ক্ষেত্রে তাদের কর্মসংস্থানের অনেক ক্ষেত্রও তৈরি হয়েছে। কৃষিশিল্প, পোশাকশিল্প, ঔষধশিল্পসহ প্রতিটি শিল্পখাতের আকার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগও বেড়েছে। চাকরি নির্ভরতা কমেছে; উদ্যোক্তার সংখ্যা বেড়েছে। স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নের ফলে মানুষের গড় আয়ু ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে উৎপাদন বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্যে বাংলাদেশ এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ। কৃষিতে শিক্ষিত উদ্যোক্তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত এক দশকে শুধু তথ্যপ্রযুক্তি খাতে কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় ১০ লাখ মানুষের। বর্তমানে বিশ্বের ১৫৭টি দেশে বাংলাদেশের ৮৬ লাখের অধিক শ্রমিক কর্মরত আছে। তারা নিয়মিত তাদের কষ্টে উপার্জিত অর্থ দেশে পাঠাচ্ছে। বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় মানবসম্পদ এভাবে সবচেয়ে বড়ো প্রভাবক শক্তি হিসেবে কাজ করছে।

বৈদেশিক বাণিজ্য : বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির আকার যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমন বিস্তৃত হয়েছে বৈদেশিক বাণিজ্য। বৈদেশিক পণ্য রপ্তানি আয়ে অর্জিত হয়েছে মাইলফলক। ২০১৮–২০১৯ অর্থবছরে পণ্য রপ্তানি হয়েছে চার হাজার কোটি মার্কিন ডলার, যা এখন পর্যন্ত দেশের সর্বোচ্চ পণ্য রপ্তানি আয়।

প্রতিবন্ধকতা : ১৯৭৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অগ্রগতিকে প্রথমবারের মতো আটকে দেওয়ার চক্রান্ত হয়। এরপর বহু বছর ধরে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় বাংলাদেশের অগ্রগতি স্থবির হয়ে পড়ে। একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার আগ পর্যন্ত বাংলাদেশের অগ্রগতি ছিল ধীরগতির। গত এক দশকে তা অস্বাভাবিক গতি অর্জন করেছে। তবে দেশে জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এই অগ্রযাত্রাকে খানিকটা ব্যাহত করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাকে সৃষ্টি করে প্রতিবন্ধকতা। বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় দুর্নীতিও একটা বাধা। এসব বাধা অতিক্রম করা সম্ভব হলে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা আরও ত্বরান্বিত হবে, অগ্রগতি টেকসই হবে এবং অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে।

উপসংহার : বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা এখন পুরো বিশ্বের জন্য দৃষ্টান্ত। এর নাম দেওয়া যেতে পারে : অদম্য বাংলাদেশ। অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও আর্থ-সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ ছাড়িয়ে গেছে দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সব দেশকে। বঙ্গবন্ধু দেখেছিলেন সোনার বাংলার স্বপ্ন, চেয়েছিলেন মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি, গড়তে চেয়েছিলেন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ। বর্তমান সরকার সেই স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। উন্নতির এই ধারা অব্যাহত রাখা সম্ভব হলে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ অর্জন করতে পারে উন্নত দেশের মর্যাদা।

৬. গ. **ভূমিকা :** মাদকাসক্তি আমাদের সমাজের ভয়াবহ একটি সমস্যা। কিছু পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে একজন মানুষ নিজেকে মাদকের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে। আমাদের দেশের তরুণদের মধ্যে মাদক গ্রহণের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। একটি জাতির উন্নয়নের ধারাকে গতিশীল করে তরুণসমাজ। কিন্তু মাদক তরুণসমাজের সেই অদম্য কর্মপ্রেরণাকে ধ্বংস করে দেয়। ফলে সে নিজেকে যেমন ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়, তেমনি দেশকেও মহাবিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দেয়। তাই এর প্রতিকার করা অত্যাবশ্যক।

মাদকের আবির্ভাব বা উৎস : নেশার ইতিহাস বেশ প্রাচীন। মদ, গাঁজা, আফিম, চরস বা তামাকের কথা বহু অগে থেকেই মানবসমাজে প্রচলিত ছিল। উনিশ শতকের মধ্যভাগে বেদনানাশক ওষুধ হিসেবে মাদকের ব্যবহার শুরু হয়, যাকে ইংরেজিতে ড্রাগ বলা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সৈনিকদের ব্যথার উপশম হিসেবে ড্রাগের ব্যবহার হলেও পরে হতাশা কাটাতেও তারা ড্রাগ ব্যবহার করতো। এরপর থেকেই কলম্বিয়া, বলিভিয়া, ব্রাজিল, ইকুয়েডর ইত্যাদি দেশে নেশার দ্রব্য হিসেবে ব্যাপকভাবে ড্রাগের ব্যবহার শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীব্যাপী।

মাদকদ্রব্যের প্রকারভেদ : সমাজে নানা ধরনের মাদকদ্রব্যের উদ্ভাবন ও ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন– হেরোইন, প্যাথেড্রিন, এলএসডি, মারিজুয়ানা, কোকেন, হাসিস প্রভৃতি আধুনিককালের মাদকদ্রব্য; তবে এর মধ্যে হেরোইন ও কোকেন বেশ দামি। আমাদের দেশের যুবসমাজ সচরাচর যে মাদকদ্রব্যগুলো ব্যবহার করে সেগুলো হলো– সিডাকসিন, ইনকটিন, প্যাথেড্রিন, ফেনসিডিল, ডেক্সপোটেন, গাঁজা ইত্যাদি। তবে এ সবকিছুর ব্যবহারকে ছাড়িয়ে গেছে অত্যাধুনিক এক মাদক যার নাম ইয়াবা।

মাদকদ্রব্যের ব্যবহার : দেশে মাদকের ব্যবহার বহু বিচিত্র। মানুষ নিজেকে অপ্রকৃতিস্থ করতে মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে। মাদকের ব্যবহার করে সে কল্পনার জগতে বিচরণ করে। এক্ষেত্রে মাদক ব্যবহারকারীরা নানা ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করে। যেমন– ধূমপান, ইনহেল বা শ্বাসের মাধ্যমে, জিহ্বার নিচে গ্রহণের মাধ্যমে, সরাসরি সেবনের মাধ্যমে, স্কিন পপিং ও মেইন লাইনিংয়ের মাধ্যমে। তবে যেভাবেই গ্রহণ করুন না কেন তাদের উদ্দেশ্য একটাই। আর তা হলো নেশায় উন্মত্ত হওয়া। প্রথমে কৌতূহলের বশে অনেকেই নেশাদ্রব্য গ্রহণ করে। কিন্তু ধীরে ধীরে তাতে অভ্যস্ত হয়ে ভয়াবহ এক সর্বনাশের পথে এগিয়ে যায় তারা।

মাদকাসক্তির কারণ : এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, মাদকাসক্তির অন্যতম কারণ ব্যক্তিজীবনের হতাশা। মানুষ যখন জীবন সম্পর্কে অনেক বেশি হতাশ হয়ে পড়ে, তখন সে মাদকদ্রব্যের আশ্রয় নেয়। হতাশাগ্রস্ত সাধারণ তরুণদের মধ্যে মাদক গ্রহণের হারও অনেক বেশি। তাছাড়া অসৎ সঙ্গে লিপ্ত হয়েও অনেকেই মাদকের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। যেসব পরিবারে পারিবারিক অশান্তি অনেক বেশি, সে পরিবারের ছেলেমেয়েদের জীবন বিশৃঙ্খল হতে থাকে। তারা এই বিশৃঙ্খলা থেকে ধীরে ধীরে মাদকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আমরা প্রতিদিনের পত্রপত্রিকায় এ ধরনের অনেক ঘটনাই লক্ষ করি। বেশির ভাগ মাদকসেবী দেখা যায় যারা বন্ধুবান্ধব বা সহপাঠীর সংস্পর্শে মাদকে আসক্ত হয়, তবে পারিবারিক অশান্তিই মাদকাসক্তির বিশেষ কারণ হিসেবে দেখা যায়।

মাদক চোরাচালান : সাধারণত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মাদক চোরাচালান হয়। সীমান্তে স্থল বা জলপথে এবং আকাশপথে বিশ্বব্যাপী এক বৃহৎ মাদক চোরাচালান নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে যার পেছনে রয়েছে বিরাট এক সিন্ডিকেট। কিছুকাল আগেও মায়ানমার, থাইল্যান্ড ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম নিয়ে গড়ে ওঠে আন্তর্জাতিক মাদক চোরাচালানের 'স্বর্গভূমি'। তবে ভিয়েতনামে সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে এই নেটওয়ার্ক ভেঙে যায়। এর কিছুদিন পরেই চোরাচালানকারীরা ইরান, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান নিয়ে গড়ে তোলে ড্রাগ পাচারের নতুন ভিত্তিভূমি, যার নাম 'গোল্ডেন ক্রিসেন্ট'।

বাংলাদেশে মাদকের আগ্রাসন : বাংলাদেশে মাদকের ব্যবহার আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অবৈধভাবে দেশে প্রবেশ করা এই মাদক আমাদের যুবসমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। মায়ানমার থেকে অবাধে এদেশে প্রবেশ করছে ইয়াবা, যাতে আসক্ত হয়ে পড়ছে বহু তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতি। দর্শনার 'কেরু এন্ড কোম্পানি' এদেশের একমাত্র লাইসেন্সধারী মদ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান; কিন্তু তার বাইরে বহু বিদেশি কোম্পানির মদ অবৈধভাবে অবাধে বাজারে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া গাঁজা ও আফিমের মতো মাদকদ্রব্যও অবাধে ক্রয়-বিক্রয় করা হচ্ছে।

মাদকাসক্তির ভয়াবহতা : মাদকাসক্তিকে অপ্রতিরোধ্য রোগ এইডসের সঙ্গে তুলনা করা যায়। মাদকাসক্তি মানুষকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। ইয়াবা ও হেরোইনের মতো মাদকদ্রব্য মানুষের শরীরের সমস্ত রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। এর আসক্তিতে মানুষ এক অস্বাভাবিক জীবনযাপন করে। নেশায় আক্রান্ত ব্যক্তির সুস্থ জীবনে ফিরে আসাও খুব সহজ হয় না। শরীরে মাদক গ্রহণ বন্ধ করা মাত্রই 'উইথড্রয়াল সিমটম' শুরু হয়। তখন মাদক না পেলে শুরু হয় টার্কি পিরিয়ড; হাত পা কাঁপতে থাকে; অসম্ভব শারীরিক যন্ত্রণা শুরু হয় এবং একপর্যায়ে তা হৃৎপিণ্ডে আঘাত করে। তখন সুচিকিৎসা না পেলে খুব অল্প সময়ে মাদকাসক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

মাদকাসক্তি প্রতিরোধ : বিশ্বজুড়ে যে মাদকবিষ ছড়িয়ে পড়ছে তার থাবা থেকে মানুষকে বাঁচাতে হবে। এ নিয়ে বিশেষজ্ঞরা ভাবছেন। সমাজসেবীরা উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। দেশে দেশে নানা সংস্থা ও সংগঠন মাদকবিরোধী আন্দোলন শুরু করেছে। আমাদের দেশেও মাদকবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছে। বেতার, টিভি, সংবাদপত্র ইত্যাদি গণমাধ্যম মাদকবিরোধী জনমত গঠনে সক্রিয় হয়েছে। মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়েছে। এসব তৎপরতার লক্ষ্য হচ্ছে :

১. মাদকাসক্তদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ভেষজ ও মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ,
২. সুস্থ বিনোদনমূলক কার্যক্রমের সঙ্গে তরুণদের সম্পৃক্ত করে নেশার হাতছানি থেকে তাদের দূরে রাখা,
৩. ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে মাদকাসক্তির মর্মান্তিক পরিণতি সম্পর্কে সকলকে সচেতন করা,
৪. মাদক ব্যবসা ও চোরাচালানের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলা,
৫. বেকার যুবকদের জন্যে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

উপসংহার : মাদকাসক্তি একটি সামাজিক সমস্যা। এ সমস্যায় তরুণরাই বেশি আসক্ত। একটি দেশের গতিশীলতাকে অব্যাহত রাখে তরুণসমাজ। তারাই যদি মাদকের কবলে পড়ে নিজেদের জীবনকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়, তবে দেশের সার্বিক অগ্রগতি চরমভাবে বিনষ্ট হবে। তাই তরুণসমাজকে মাদক সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং এর কারবারিদের সর্বাগ্রে বয়কট করতে হবে। আমাদের প্রত্যাশা বাংলাদেশ মাদকমুক্ত হয়ে সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হোক।

বরিশাল বোর্ড– ২০২৪

সেট : ঘ

বাংলা দ্বিতীয় পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 1 0 2

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময় : ৩০ মিনিট — পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি কালো কালির বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. ভাষার ক্ষুদ্রতম উপাদান–
ⓚ ধ্বনি ⓚ অক্ষর
ⓖ শব্দ ⓖ বাক্য

২. নিচের কোন যুক্তবর্ণটি অস্বচ্ছ?
ⓚ ন্ত ⓚ ক্ষ ⓖ জ্জ ⓖ ন্দ

৩. 'অদ্য' শব্দের উচ্চারণ–
ⓚ ওদ্‌দো ⓚ অদ্‌দো
ⓖ অদ্দো ⓖ ওইদ্‌দো

৪. নিচের কোনটি দ্বিগু কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ?
ⓚ শশব্যস্ত ⓚ চৌরাস্তা
ⓖ আলুসিদ্ধ ⓖ মনমাঝি

৫. নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধির উদাহরণ কোনটি?
ⓚ গোষ্পদ ⓚ একাদশ ⓖ গবাক্ষ ⓖ সম্মান

৬. অভিধানে শব্দের অর্থ গ্রহণের বেলায় নিচের কোনটিকে প্রধান্য দেওয়া হয়?
ⓚ লক্ষ্যার্থ ⓚ বাচ্যার্থ ⓖ গৌণার্থ ⓖ বাগর্থ

৭. 'ভালোভাবে পৌঁছে যেয়ো।' এ বাক্যটি কোন ভবিষ্যৎ কালের উদাহরণ?
ⓚ সাধারণ ⓚ ঘটমান
ⓖ পুরাঘটিত ⓖ অনুজ্ঞা

৮. 'ননীর পুতুল' বাগ্‌ধারার অর্থ নিচের কোনটি?
ⓚ ননী দিয়ে তৈরি পুতুল ⓚ কপট ব্যক্তি
ⓖ স্বল্পস্থায়ী ⓖ শ্রম বিমুখ

৯. যেসব অর্থহীন শব্দাংশ অন্য শব্দের শুরুতে বসে নতুন শব্দ গঠন করে, সেগুলোকে কী বলে?
ⓚ প্রত্যয় ⓚ সমাস ⓖ সন্ধি ⓖ উপসর্গ

১০. কোনটি মৌলিক শব্দ?
ⓚ গরমিল ⓚ বন্ধুত্ব
ⓖ প্রশাসন ⓖ গোলাম

১১. আনুমানিক কত বছর আগে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে?
ⓚ এক হাজার ⓚ দুই হাজার
ⓖ তিন হাজার ⓖ চার হাজার

১২. 'রেস্তোরাঁ' কোন ভাষার শব্দ?
ⓚ আরবি ⓚ পারসি
ⓖ পর্তুগিজ ⓖ ফরাসি

১৩. 'হ্রাস' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?
ⓚ বর্ধন ⓚ বেশি ⓖ বৃদ্ধি ⓖ অনেক

১৪. নিচের কোনটি উপাদানবাচক বিশেষণ?
ⓚ পাথুরে ⓚ ঠান্ডা
ⓖ নীল আকাশ ⓖ চলন্ত গাড়ি

১৫. বাক্যের গৌণকর্মের সঙ্গে কোন বিভক্তির প্রয়োগ হয়?
ⓚ -এ, -তে ⓚ -য়, -য়ে
ⓖ -এ, -য়ের ⓖ -কে, -রে

১৬. নিচের কোনটি অক্রিয় বাক্য?
ⓚ আমার মা চাকরি করেন।
ⓚ তিনি বাংলাদেশের নাগরিক ছিলেন।
ⓖ তিনি বাংলাদেশের নাগরিক।
ⓖ রনি রাতে রুটি খায়।

১৭. বিধেয়ের স্থান ও কাল সংক্রান্ত প্রসারক বসতে পারে–
ⓚ উদ্দেশ্যের পূর্বে ⓚ বিধেয়ের পূর্বে
ⓖ উদ্দেশ্যের বা বিধেয়ের পরে ⓖ উদ্দেশ্যের বা বিধেয়ের পূর্বে

১৮. যে বাক্যের ক্রিয়া-বিশেষ্য বাক্যের ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে কী বলে?
ⓚ কর্তাবাচ্য ⓚ কর্মবাচ্য ⓖ ভাববাচ্য ⓖ বাচ্য

১৯. পরোক্ষ উক্তিতে কর্তা অনুযায়ী কীসের পরিবর্তন করতে হয়?
ⓚ ক্রিয়ারূপের ⓚ স্থানবাচক শব্দের
ⓖ উদ্ধার চিহ্নের ⓖ ক্রিয়ার কালের

২০. নিচের কোনটি ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়?
ⓚ বাগ্‌যন্ত্র ⓚ সর্বনাম
ⓖ কারক বিশ্লেষণ ⓖ বিপরীত শব্দ

২১. ভাষার আঞ্চলিকতাকে কী নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে?
ⓚ আদর্শ কথ্য ভাষা ⓚ উপভাষা
ⓖ লেখ্য ভাষা ⓖ সাধু ভাষা

২২. রাজীব বাংলা ব্যাকরণে ভালো–এই বাক্যে 'ব্যাকরণে' কোন কারক?
ⓚ অপাদান ⓚ অধিকরণ ⓖ করণ ⓖ কর্মকারক

২৩. 'তাকে আসতে বললাম, তবু এলো না।'–এ বাক্যে কোন ধরনের যোজক ব্যবহৃত হয়েছে?
ⓚ সাধারণ ⓚ বিরোধ ⓖ কারণ ⓖ সাপেক্ষ

২৪. বাংলা ভাষায় অর্ধস্বরধ্বনি কতটি?
ⓚ দুইটি ⓚ তিনটি ⓖ চারটি ⓖ পাঁচটি

২৫. নিচের কোন শব্দে কম্পিত ব্যঞ্জনধ্বনি রয়েছে?
ⓚ ভার ⓚ লাল ⓖ বাড়ি ⓖ শসা

২৬. 'হে বন্ধু, তোমাকে অভিনন্দন।'–এ বাক্যে কোন আবেগ প্রকাশ পেয়েছে?
ⓚ প্রশংসা ⓚ করুণা ⓖ সম্বোধন ⓖ অলংকার

২৭. মানি পক্ষের বহুবচন করার সময় নিচের কোন লগ্নক ব্যবহার করা হয়?
ⓚ সব, আবলি, মালা ⓚ বা, এরা, গুলি
ⓖ সমূহ, গুলো, মণ্ডলী ⓖ গণ, বৃন্দ, বর্গ

২৮. নিচের কোন বাক্যে বিশেষণবর্গ রয়েছে?
ⓚ আমার ভাই পড়তে বসেছে।
ⓚ আমটা দেখতে ভারী সুন্দর।
ⓖ সকাল আটটার সময়ে সে রওয়ানা হলো।
ⓖ আমি সকাল থেকে বসে আছি।

২৯. 'ঝাঁক' শব্দটি কোন প্রকারের বিশেষ্য?
ⓚ জাতি ⓚ গুণ ⓖ সমষ্টি ⓖ বস্তু

৩০. নিচের কোনটি নিত্য নরবাচক শব্দ?
ⓚ শিক্ষক ⓚ কৃতদার ⓖ মানুষ ⓖ শ্রমিক

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

বরিশাল বোর্ড– ২০২৪

বাংলা দ্বিতীয় পত্র (রচনামূলক প্রশ্ন)

সেট : ০৩ **বিষয় কোড : 1 0 2**

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। উত্তর প্রাসঙ্গিক ও যথাযথ হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

১। যে-কোনো একটি বিষয়ে অনুচ্ছেদ লেখো : ১০

(ক) বইমেলা

(খ) স্বাধীনতা দিবস।

২। (ক) মনে করো, তুমি তামিম। খুলনা জিলা স্কুলের দশম শ্রেণির একজন শিক্ষার্থী। সম্প্রতি ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় পাঁচ দিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে পারোনি। ছুটি মঞ্জুরের জন্য তোমার প্রধান শিক্ষক বরাবর একখানা আবেদনপত্র লেখো। ১০

অথবা,

(খ) মনে করো, তুমি মাগুরা জিলা স্কুলের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী। তোমার বিদ্যালয়ের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় উপলক্ষ্যে একখানা মানপত্র রচনা করো।

৩। (ক) সারাংশ লেখো : ১০

অভাব আছে বলিয়া জগৎ বৈচিত্র্যময় হইয়াছে। অভাব না থাকিলে জীব-সৃষ্টি বৃথা হইত। অভাব আছে বলিয়া অভাব-পূরণে এত উদ্যম, এত উদ্যোগ। সংসার অভাবক্ষেত্র বলিয়া কর্মক্ষেত্র। অভাব না থাকিলে সকলেই স্থাণু-স্থবির হইত, মনুষ্যজীবন বিড়ম্বনায় হইত। মহাজ্ঞানীগণ অপরের অভাব দূর করিতে পাইয়াছে। সেবা মানবজীবনের পরম ধর্ম। সুতরাং অভাব হইতেই সেবাধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে। আর এই সেবাধর্মের দ্বারাই মানুষের মনুষ্যত্বসুলভ গুণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

অথবা,

(খ) সারমর্ম লেখো :

বসুমতি, কেন তুমি এতই কৃপণা,
কত খোঁড়াখুঁড়ি করি পাই শস্যকণা।
দিতে যদি হয় দে মা, প্রসন্ন সহাস–
কেন এ মাথার ঘাম পায়েতে বহাস?
বিনা চাষে শস্য দিলে কী তাহাতে ক্ষতি?
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কন বসুবতী,
আমার গৌরব তাহে সামান্যই বাড়ে,
তোমার গৌরব তাহে নিতান্তই ছাড়ে।

৪। যে-কোনো একটির ভাব-সম্প্রসারণ লেখো : ১০

(ক) বই কিনে কেউ দেউলিয়া হয় না।

(খ) অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

৫। (ক) মনে করো, তুমি তিথি/তিতাস। তুমি 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকার যশোর জেলা প্রতিনিধি। তোমার এলাকার সড়কের দুরবস্থা সংক্রান্ত একটি সংবাদ প্রতিবেদন তৈরি করো। ১০

অথবা,

(খ) মনে করো, তুমি মাইসা/মাহিম। তুমি 'দৈনিক প্রথম আলো' পত্রিকার খুলনা প্রতিনিধি। তোমার বিদ্যালয়ে 'শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপন সম্পর্কিত একটি সংবাদ প্রতিবেদন রচনা করো।

৬। যে-কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করো : ২০

(ক) কৃষিকাজের বিজ্ঞান

(খ) বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প

(গ) মাদকাসক্তি ও এর প্রতিকার।

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	ক	২	খ	৩	ক	৪	খ	৫	গ	৬	খ	৭	ঘ	৮	ঘ	৯	ঘ	১০	ঘ	১১	ক	১২	ঘ	১৩	গ	১৪	ক	১৫	ঘ
	১৬	গ	১৭	ক	১৮	গ	১৯	ক	২০	ক	২১	খ	২২	খ	২৩	খ	২৪	গ	২৫	ক	২৬	গ	২৭	ঘ	২৮	খ	২৯	গ	৩০	খ

রচনামূলক

১. ক. বইমেলা হলো লেখক, প্রকাশক ও পাঠকের মিলনমেলা। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা-আন্দোলনে সালাম, বরকত, রফিক, শফিউর প্রমুখ শহিদ হন। তাদের সেই স্মৃতিকে অম্লান রাখতেই ১৯৭২ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি মুক্তধারার প্রকাশক চিত্তরঞ্জন সাহা ঢাকার বর্ধমান হাউজ প্রাঙ্গণে ৩২টি বই সাজিয়ে বইমেলার সূচনা করেন। সেই থেকে প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে আয়োজন করা হয় একুশে বইমেলা এবং এর নামকরণ করা হয় 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় এ মেলা। মাসব্যাপী একুশে বইমেলা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হয় অসংখ্য বই। মেলা প্রাঙ্গণে প্রবেশের প্রধান তোরণটি সাজানো হয় অত্যন্ত চমৎকারভাবে। মেলার ভেতরে বটবৃক্ষের বেদিমূলে তৈরি করা হয় নজরুল মঞ্চ। চারদিকে চক্রাকারে থাকে প্রয়াত জ্ঞানীগুণী মনীষীদের ছবি এবং সাজানো থাকে বিখ্যাত ব্যক্তিদের অমর বাণী। মেলায় প্রবেশ করতেই চোখে পড়ে স্টল এবং স্টলে সাজানো বই। বইমেলায় সাধারণত সৃজনশীল বইয়ের সমাবেশ ঘটে। বিভিন্ন রুচির পাঠক তাদের পছন্দমতো বই সংগ্রহ করে বইমেলা থেকে। শিশু-কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ সবারই রুচিসম্মত বইয়ের সমাবেশ থাকে মেলায়। এছাড়া বইমেলায় অনেক লেখকের সাথে পাঠকদের সাক্ষাৎ ঘটে। বর্তমানকালে বইমেলা বা পুস্তক প্রদর্শনীগুলোর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এবং সাফল্য গ্রন্থ প্রকাশনার জগতে এনেছে অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য। একুশে বইমেলা একদিকে বাঙালির বই কেনা, পাঠাভ্যাস গঠন ও পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের এক মিলনতীর্থ, অপরদিকে এটি বাঙালির সংগ্রামী চেতনা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের এক তাৎপর্যপূর্ণ অনুষঙ্গ।

১. খ. ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস। এটা আমাদের জাতীয় জীবনে একটি স্মরণীয় ও ঐতিহাসিক দিন। বাঙালি জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা ১৯৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রাম। ৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ জয়লাভ সত্ত্বেও স্বৈরাচার পাকিস্তান সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় এদেশের জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অন্যদিকে পাক-সরকার জনগণের রায়কে উপেক্ষা করে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতের অন্ধকারে পাকহানাদার বাহিনী কামান, গুলি, ট্যাংক নিয়ে ঘুমন্ত, নিরস্ত্র, নিরীহ বাঙালির ওপর আক্রমণ চালায়। এরই প্রেক্ষিতে ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। দীর্ঘ নয় মাস রক্তাক্ত যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ত্রিশ লক্ষ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। ১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। তারপর থেকে প্রতিবছর এ দিনটি যথাযথ মর্যাদার সাথে পালিত হয়ে আসছে। দিবসটি উদ্‌যাপনের জন্য বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সব ভবনে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ওড়ানো হয়। ভোরবেলা গণজমায়েত হয় বিভিন্ন প্রাঙ্গণে, শহিদদের আত্মার শান্তি কামনা করে প্রার্থনা করা হয়, জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং রেডিও-টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। এভাবে সমগ্র দেশে রাষ্ট্রীয় মর্যাদার সাথে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। আমাদের জাতীয় জীবনে দিবসটি অত্যন্ত গৌরবের ও মর্যাদার।

২. ক.

২০শে মে, ২০২...
বরাবর
প্রধান শিক্ষক,
খুলনা জিলা স্কুল, খুলনা।

বিষয় : অনুপস্থিতির জন্য ছুটির আবেদন।

মহোদয়,
বিনীত নিবেদন এই যে, আমি আপনার বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির একজন নিয়মিত ছাত্র। গত ১৫ই মে থেকে ১৯শে মে ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় আমি বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে পারিনি।
অতএব, মহোদয় সমীপে সদয় প্রার্থনা, আমাকে উল্লিখিত পাঁচ দিনের ছুটি মঞ্জুর করে বাধিত করবেন।
বিনীত
আপনার অনুগত ছাত্র
তামিম
দশম শ্রেণি, ক্রমিক নং-২

২. খ. ঐতিহ্যবাহী মাগুরা জিলা স্কুলের ২০২... সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় উপলক্ষ্যে অশ্রুসিক্ত বাণী কবির ভাষায়–

উড়ে এসেছিলাম জ্ঞানের বাগানে
মোরা পথভোলা বুলবুল।
উড়ে যাই আবার জীবন-সংগ্রাম নীড়ে
আশঙ্কা বেদনায় হৃদয় ভাঙা ব্যাকুল।

হে বিদায়ী বন্ধুরা,

চমৎকার সুন্দর নীলচে আকাশে শারদীয় মেঘ, শিউলিঝরা প্রভাত আর কুয়াশার শুচি-শুভ্র উত্তরীয় প্রকৃতি যখন অনিন্দ্যসুন্দর, তখন শেষ হয়ে এলো তোমাদের জীবনের শিক্ষাকাল। তোমাদের বিদায় রাগিণীতে আমাদের মনের সোনালি আকাশ ছেয়ে গেছে বিষাদের ছায়ায়।

হে শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ,

বাঙালি কৃষ্টি, সভ্যতা আর ঐতিহ্য চেতনার প্রতিশ্রুতি নিয়ে যাত্রালগ্ন থেকেই জ্ঞানপিয়াসী কত না মনীষী, সুধী-জ্ঞানী-গুণী দিয়েছ বিদায় তোমার এই অনন্ত সুবাসিত কুসুমকানন হতে। একবিংশ শতাব্দীর ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ উত্তাল সিন্ধু মাঝে আমরাও আজ রিক্ত হস্তে দিচ্ছি পাড়ি মহাকালের যাত্রাপথে। তাই আমরা আজ আশঙ্কিত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়; কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ– জ্বালিয়ে দেব সকল কুসংস্কারের আস্তানা।

হে বিদায়ী অগ্রজবৃন্দ,

বেদনাবিধুর এ বিদায় বেলায় আমাদের মনে পড়ছে বিগত দিনের অফুরন্ত স্মৃতি। সুদীর্ঘ সময়ে তোমাদের সাথে আমাদের হৃদ্যতার যে নিবিড় সম্পর্কের গ্রন্থি রচিত হয়েছিল, তা আজ ছিন্ন করে আমাদের হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করে তোমরা চলে যাচ্ছ। তবু শিক্ষার এ ক্ষুদ্রতর সীমার বাঁধন পেরিয়ে উচ্চতর এক শিক্ষাজীবনের সন্ধানে যাত্রা করছ ভেবে আমাদের মনে বেদনার মাঝেও কিছুটা আনন্দের ধারা বহমান।

হে সুহৃদ বন্ধুগণ,

জানি, তোমাদের যথাযথ সম্মান আমরা দিতে পারিনি। অনেক সময় আমাদের অবুঝ যুক্তিতর্ক, আচার-ব্যবহারে তোমরা মনঃক্ষুণ্ন হয়েছ। আজ এ বিদায়লগ্নে করজোড়ে তোমাদের আকাশসম হৃদয়ের কাছে আমরা ক্ষমার মঞ্চে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি। আশা করি ক্ষমা করে দেবে।

তোমাদের নতুন যাত্রাপথ সাফল্যময় হোক। পূর্ণ হোক মনের সকল মঙ্গল বাসনা।

তোমাদের স্নেহমুগ্ধ
শিক্ষার্থীবৃন্দ
মাগুরা জিলা স্কুল, মাগুরা।
৭ই নভেম্বর, ২০২...

৩. ক. জীবনে অসম্পূর্ণতা আছে বলেই মানুষ পূর্ণতার খোঁজ করে। অভাব দূর করার জন্যই সে কর্মপ্রচেষ্টায় রত থাকে। আবার কিছু মানুষ অন্যের অভাব পূরণের মধ্য দিয়ে মহান হয়ে ওঠে।

৩. খ. পরিশ্রমের মাঝে যা পাওয়া যায় তার দাম যেমন অনেক, তার গৌরবও বেশি। যে-কোনো উন্নতির মূলে রয়েছে শ্রমবৃদ্ধি, শ্রমসাধনা। আর যা করুণার দান, ভিক্ষার দান, তা গ্রহণ করায় রয়েছে লজ্জা। এর ভেতর কোনো গৌরব নেই।

৪. ক. জ্ঞান আহরণ করার আশা নিয়ে মানুষ বই কেনে। আর এই বই কেনার জন্য যে অর্থ-ব্যয় হয়, অর্জিত জ্ঞানের তুলনায় তা খুব নগণ্য।

বই মানুষের জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়ে মনের জগৎকে প্রসারিত করে। কূপমণ্ডূকতা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বিশ শতকের সূচনায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের দার্শনিকগণ বলেছিলেন, 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'। তাঁদের ধারণা অনুযায়ী জ্ঞানের সীমানা বাড়াতে, বুদ্ধিকে বন্ধনহীন করতে, আর মানুষের মুক্তি আনতে বই পড়ার কোনো বিকল্প নেই। সব মানুষই খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, চিকিৎসা ইত্যাদি মৌলিক প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় করে। মৌলিক চাহিদা পূরণের পর অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করার আরও অনেক উপায় আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে ভালো উপায়– বই কেনা। বই কিনে কেউ নিঃস্ব হয় না। কারণ, একটা বইয়ের অর্থমূল্য বেশি নয়। বরং একটি বই কিনতে যে অর্থের প্রয়োজন হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি অর্থ অনেকে অন্যান্য কাজে ব্যয় করে থাকে। ব্যক্তিকে আলোকিত করতে একটি বই যেভাবে ভূমিকা রাখে, তাতে বই কেনার ব্যাপারে কার্পণ্য করা বোকামি। একটা বই অনেক সময়ে মানুষের জীবনকে পর্যন্ত বদলে দিতে পারে।

বই মানুষের প্রকৃত বন্ধু। তাই নিজেকে সমৃদ্ধ করতে বই কেনার ও তা পড়ার কোনো বিকল্প নেই।

৪. খ. অন্যায় করা আর অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া সমান অপরাধ। অন্যায়ভাবে শক্তিমান, ঐশ্বর্যবান হওয়া যেমন দোষের তেমনি অন্যায় সহ্য করার মানসিকতাও সমভাবে নিন্দনীয়।

সহজ ও সুন্দর জীবনযাত্রার জন্য প্রত্যেক মানুষেরই কিছু নৈতিক কর্তব্য রয়েছে। সামাজিক অনুশাসনে নিয়ন্ত্রিত এই অলিখিত কর্তব্যের যথাযথ রূপায়ণ ঘটলে মানুষের মর্যাদাবোধ ক্ষুণ্ন হয় না। কিন্তু এই মর্যাদা রক্ষার ক্ষমতা বা সাহস সকলের সমান হয় না। ফলে কিছু লোভী, পরশ্রীকাতর ও অত্যাচারী মানুষ দুর্বলের ওপর নির্যাতন করার সাহস পায়। অন্যায়কারীরা নিজের হীন ইচ্ছাকে বীরভোগ্য বসুন্ধরা বা Might is right ভেবে তৃপ্ত হয়। 'জোর যার মুল্লুক তার' এই মনোভাবে বিশ্বাসীরা নিরীহ, শান্তিপ্রিয় মানুষের ওপর চড়াও হয়– সুখশান্তি ব্যাহত করে, নির্যাতন চালায়, সম্ভ্রম ও শ্লীলতাহানি করে। কেন তারা এমন করতে পারে? বস্তুত কিছু মানুষের নীরবতা, উদাসীনতা, কাপুরুষতা, পৌরুষহীনতা পরোক্ষভাবে মদদ জোগায় অন্যায়কারীদের। যদি সমস্ত ভয় ভেঙে দুর্বলের দল, নিস্পৃহের দল অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে মাথা তুলে প্রতিবাদ করতো– তবে অন্যায়কারী পিছু হঠতে বাধ্য হতো। সেক্ষেত্রে অন্যায় কখনোই সংঘটিত হতে পারত না।

মূলত অন্যায়কে সহ্য করা, প্রকারান্তরে অন্যায়কে সমর্থন করা। তাই যে অন্যায় করে সে যেমন পাপী যে অন্যায় কার্যকে সহ্য করে সেও তেমনি পাপী ও ঘৃণ্য।

৫. ক.

সড়কের বেহাল দশা : যাত্রীদের দুর্ভোগ

তিথি, যশোর প্রতিনিধি, ২২শে জুলাই ২০২...॥ যশোর সদর উপজেলা থেকে মনিরামপুর উপজেলা পর্যন্ত সড়কটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। প্রায় এক যুগ ধরে সড়কটির কোনো সংস্কার কাজ হয়নি। সড়কের এ বেহাল দশায় যাত্রীরা চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে সরেজমিনে দেখা গেছে, দীর্ঘ সড়কটির পুরোটাই বড়ো বড়ো গর্ত ও খানাখন্দে ভরা। এমনকি দুই কিলোমিটার অংশে দুই পাশের মাটি সরে গেছে। প্রতিদিন এ সড়ক দিয়ে হাজার হাজার মানুষ চলাচল করে। এছাড়া কমপক্ষে ত্রিশটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এ পথে যাতায়াত করে থাকে। এলাকাবাসী জানান, সড়কটির সুরকির স্তর দেবে গিয়ে বালু বের হয়ে আসে এবং সৃষ্টি হয় খানাখন্দের। এরপর প্রতি বর্ষায় বৃষ্টিপাতে পানি ও কাদায় সড়কটি একাকার হয়ে যায়, যা এখন চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। গত বুধবার একটি পিকআপ ভ্যান রাস্তার গর্তে পড়ে যায়। এতে চালকসহ তিন জন যাত্রী আহত হন।

সাধারণ মানুষ মনে করে, সড়কটি নিয়ে এলাকাবাসীর দুর্ভোগ দীর্ঘদিনের। অথচ এর সমাধানে কর্তৃপক্ষের কোনো নজর নেই। এটি মেরামতের জন্য স্থানীয় লোকজন সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে একাধিকবার আবেদন করলেও কোনো প্রতিকার পায়নি। এলাকাবাসীর দাবি, গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কটি দ্রুত সংস্কার করে জনদুর্ভোগ কমাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যেন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

৫. খ.

'শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপন

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে খুলনা জিলা স্কুলে ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০২... দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (বাংলা) জনাব জসিম উদ্দিন।

সকাল ৭টায় প্রভাতফেরির মাধ্যমে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ভোর থেকেই বিদ্যালয়ের আশপাশের ছাত্রছাত্রীরা খালি পায়ে প্রশাসনিক ভবনের সামনে সমবেত হয়। তাদের সঙ্গে শিক্ষকবৃন্দ যোগদান করেন। বিদ্যালয় মাঠের দক্ষিণ প্রান্তে শহিদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের খালি পায়ে শোভাযাত্রা শুরু হয়। সবার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয় একুশে ফেব্রুয়ারির অমর গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি।' এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হয় শোভাযাত্রা। অবশেষে সকাল ৮টায় শহিদ মিনারের পাদদেশে সকলে উপনীত হলে প্রধান শিক্ষক প্রথম পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে অমর শহিদদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ ফুলের তোড়া শহিদ মিনারে অর্পণ করে শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

শহিদ দিবস ও মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে পরবর্তী কর্মসূচি ছিল কবিতা আবৃত্তি ও সংগীতানুষ্ঠান। শহিদ মিনারের বেদিমূলে সবুজ ঘাসের গালিচার উপর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথমে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত কবিগণের নির্বাচিত কবিতা আবৃত্তি করে। পরে স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনানো হয়। আবৃত্তিশেষে শুরু হয় সংগীতানুষ্ঠান। দেশাত্মবোধক গানই ছিল এ পর্যায়ের মূল আকর্ষণ।

বিকেলে আয়োজন করা হয়েছিল আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সভাপতিত্বে আলোচনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি মুহম্মদ সামাদ। বিদ্যালয়ের দুজন শিক্ষার্থী মাতৃভাষা দিবসের ওপর আলোচনা করে। আলোচনার শেষে ছিল পুরস্কার বিতরণ পর্ব। শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত কবিতা ও রচনা প্রতিযোগিতা এবং সংগীত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং প্রধান অতিথি। নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

প্রতিবেদকের নাম	:	মাইসা রহমান
প্রতিবেদনের শিরোনাম	:	'শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপন।
প্রতিবেদনের প্রক্রিয়া	:	বিশেষ প্রতিবেদন
প্রতিবেদনের সময়	:	দুপুর ১২টা
প্রতিবেদনের তারিখ	:	২৩/০২/২০২...

৬. ক. **ভূমিকা :** সভ্যতার ক্রম পরিবর্তনে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা পালন করেছে বিজ্ঞান। বর্তমান বিশ্বে মানুষের যে অগ্রযাত্রা তা বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। বিজ্ঞান মানুষকে গতিশীল করেছে এবং সভ্যতার অগ্রযাত্রাকে করেছে ত্বরান্বিত। বর্তমানে কৃষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূত্র বিজ্ঞানই আবিষ্কার করেছে। কৃষিকাজে বিজ্ঞানের অবদান অপরিসীম।

মানবসভ্যতা ও কৃষি : মানব সভ্যতার ইতিহাস অত্যন্ত পুরোনো। আর সেই সভ্যতার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কৃষির হাত ধরেই। মানুষ শিকারের বিকল্প হিসেবে কৃষিকে বেছে নিয়ে তার জীবনকে গতিশীল ও উন্নত করেছিল। তাই এটি মানুষের আদিমতম জীবিকার একটি পেশাও বটে। সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায় যে, কৃষিতে যে দেশ যত তাড়াতাড়ি অগ্রগতি সাধন করতে পেরেছে, সে দেশ তত তাড়াতাড়ি সভ্যতার উপরের সিঁড়িকে অতিক্রম করেছে। এ থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, কৃষির উন্নতিতেই সমাজ, দেশ ও সভ্যতার ক্রমোন্নতি সম্ভব হয়।

মানবজীবনে কৃষির গুরুত্ব : কৃষি মানুষের অস্তিত্বের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। মানবজীবন ও মানবসমাজে এর গুরুত্ব অপরিসীম। জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে এটি মানুষের আদিমতম জীবিকার উপায়। দেশে দেশে কৃষিই সমাজের মেরুদণ্ড, কৃষিই সমাজের ভিত্তি। স্বভাবতই কৃষির ক্রমোন্নতিতেই সমাজের ও দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি। এই উন্নতিতে অনন্য ও অভাবনীয় ভূমিকা রেখেছে বিজ্ঞান। আজকের বিশ্বে প্রতিটি ক্ষেত্রের মতো কৃষিক্ষেত্রেও বিজ্ঞানই আজ বাড়িয়ে দিয়েছে তার সুদূরপ্রসারী কল্যাণী হাত।

কৃষিকাজে বিজ্ঞান : মানুষ খাদ্যের জন্য কৃষির ওপর নির্ভরশীল। আজ বিজ্ঞানের প্রভাবে কৃষিকাজ আদিম স্তর কাটিয়ে আধুনিক স্তরে পৌঁছেছে। পানি সেচের ব্যবস্থা, উন্নত ধরনের বীজ, বীজ বপন, ফসল কাটা ও মাড়াই, ভূমি সংরক্ষণ ইত্যাদির প্রভূত উন্নতি কৃষিবিজ্ঞানেরই আধুনিক

প্রযুক্তিনির্ভর মেশিনের অবদান। পৃথিবীতে আজ জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু ফসলি জমির পরিমাণ সীমিত। এ সীমিত কর্ষণযোগ্য জমিতে বিজ্ঞানের সহায়তায় নতুন বীজ আবিষ্কার, নতুন পদ্ধতি প্রয়োগে মানুষ ক্ষুধার্তের অন্ন সংগ্রহের প্রয়াস চালাচ্ছে।

বিভিন্ন দেশে কৃষিকাজে বিজ্ঞান : উন্নত দেশগুলোর কৃষিব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিজ্ঞাননির্ভর। জমিতে বীজ বপন থেকে শুরু করে ঘরে ফসল তোলা পর্যন্ত সমস্ত কাজেই রয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়া। বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক কৃষিযন্ত্র, যেমন– মোয়ার (শস্য-ছেদনকারী যন্ত্র), রপার (ফসল কাটার যন্ত্র), বাইন্ডার (ফসল বাঁধার যন্ত্র), থ্রেশিং মেশিন (মাড়াইযন্ত্র), ম্যানিউর স্প্রেডার (সার বিস্তরণ যন্ত্র) ইত্যাদি উন্নত দেশগুলোর কৃষিক্ষেত্রে এনেছে বৈপ্লবিক সাফল্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের খামারে একদিনে **১০০** একর পর্যন্ত জমি চাষ হচ্ছে কেবল এক-একটি ট্রাক্টরের মাধ্যমে। সেগুলো আবার একসাথে তিন-চারটি ফসল কাটার যন্ত্রকে একত্রে কাজে লাগাতে সক্ষম। তারা বিভিন্নভাবে কৃষিকাজের এমন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করছে যার ফলে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তারা কৃষিকাজে ব্যাপকভাবে অগ্রগামী। যেমন বলা যায় জাপানের কথা। জাপানে জমির উর্বরাশক্তি বাংলাদেশের তুলনায় কম। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে তারা বাংলাদেশের তুলনায় ৬ গুণ বেশি ফসল উৎপাদন করছে। শীতপ্রধান দেশে 'শীত নিয়ন্ত্রণ' ঘর বানিয়ে শাকসবজি এবং ফলমূল সংরক্ষণ করছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে বর্তমানে শুষ্ক মরুভূমির মতো জায়গাতে সেচ, সার ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় চাষাবাদ করে সোনার ফসল ফলানো সম্ভব হচ্ছে। এভাবে বিজ্ঞান কৃষিকাজে এক যুগান্তকারী বিপ্লব সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশের কৃষিকাজে বিজ্ঞান : আমাদের দেশেও এখন কৃষিকাজে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে জমি খণ্ডবিখণ্ড হচ্ছে। এই খণ্ডবিখণ্ডতার কারণে জমি কর্ষণে ব্যাপকভাবে ট্রাক্টর ব্যবহার করা যাচ্ছে না। তবে মানুষ এখন আর চাতকের ন্যায় বৃষ্টিধারার জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে না। সেচের জন্য এখন ব্যবহার করা হয় গভীর নলকূপ এবং মেশিনচালিত পাম্প। বপনের জন্য ব্যবহার করা হয় উন্নত ধরনের বীজ। বীজ সংরক্ষণে সাহায্য নেওয়া হয় বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির। বর্তমানে রাসায়নিক সার ব্যবহার করে ফসল উৎপাদনের মাত্রা বাড়ানো হচ্ছে। আগে যে জমিতে একধরনের ফসল হতো, বিজ্ঞানের সাহায্যে এখন সেখানে তিন ধরনের ফসল হয়। ধানের চারা রোপণ, ধান কাটা ও ধান মাড়াইয়ের আধুনিক যন্ত্রপাতি বাংলাদেশে বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে আমাদের দেশের কৃষিকাজ এখনো সম্পূর্ণ যান্ত্রিক করা সম্ভব হয়নি। চাষাবাদে বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারলে আমাদের খাদ্য সমস্যা সমাধান করা যাবে এবং বিদেশেও রপ্তানি করা যাবে।

বিজ্ঞানসম্মত কৃষির গুরুত্ব : আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কৃষির বাস্তবিক গুরুত্ব অনেকখানি। তবে পুরোনো পদ্ধতির চাষাবাদে বর্তমানে আর সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। এখন প্রয়োজন অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ। উন্নত বিশ্বের মতো ছোটো জায়গায় অধিক ফসল ফলানোর কৌশল আমাদেরও আয়ত্ত করতে হবে। তবেই কৃষক ও কৃষির সমন্বিত সাফল্য ত্বরান্বিত হবে।

বৈজ্ঞানিক কৃষি ও অর্থনীতি : বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষিকাজের ফলে অর্থনীতির অগ্রগতি সাধিত হওয়া সম্ভব। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, আমরা এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি। আমরা নিজেদের উৎপাদিত ফসল বাইরেও রপ্তানি করতে সমর্থ হচ্ছি। জীবনরহস্য আবিষ্কারের ফলে পাটের সোনালি দিন আবার আমাদের মধ্যে আসতে শুরু করেছে। বহু আগে থেকেই আমরা বিভিন্ন দেশে চা রপ্তানি করে আসছি। সুতরাং সর্বাধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদের ফলে আমাদের পক্ষে এ সাফল্যকে আরও ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

উপসংহার : কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞানের জাদুর ছোঁয়ায় অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। কেননা বিজ্ঞানকে আমরা যত কাজে লাগাতে পারব, ততই আমাদের কৃষিতে অপার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। তাই সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায় থেকেই বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদে কৃষককে উৎসাহিত করা আবশ্যক এবং সহযোগিতার হাতকে প্রসারিত করা একান্ত কর্তব্য।

৬. খ. **ভূমিকা :** বাংলাদেশে পর্যটন শিল্প এক উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় খাত। এদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং জনগণের উদার আতিথেয়তা এ শিল্পের জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক। দেশ-দেশান্তরে পরিভ্রমণ করে মানুষ তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য পিপাসাকে নিবৃত্ত করে। এমন পরিভ্রমণকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে পর্যটন শিল্প। কিন্তু বাংলাদেশে এ শিল্পের আশানুরূপ অগ্রগতি নেই। অথচ পর্যটন শিল্পে এদেশে অসংখ্য বেকারের কর্মসংস্থান হতে পারে।

পর্যটনের পরিচয় : প্রাচীনকালে মার্কোপোলো, ইবনে বতুতা, ফাহিয়েন, হিউয়েন সাং-সহ বিশ্ববিখ্যাত পর্যটকরা ইতিহাসে স্থায়ী হয়ে আছেন। সেসময়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব কষ্টকর ও দুর্গম থাকা সত্ত্বেও ভ্রমণপিপাসুরা ঘুরে বেড়িয়েছেন এক দেশ থেকে অন্য দেশে। আমরা ইতিহাস থেকে জানতে পারি এসব বিখ্যাত পর্যটকের অনেকেই এ উপমহাদেশে এসেছিলেন। আজ পর্যটন পৃথিবীব্যাপী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে মানুষের অদেখাকে দেখার অভিপ্রায় থেকেই।

বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন : একসময় বাংলাদেশ পর্যটন শিল্পে বিখ্যাত ছিল। বিভিন্ন শাসক-শোষক শ্রেণির কারণে তা বিনষ্ট হয়ে যায়। তবে **১৯৭১** সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমাদের হারিয়ে যাওয়া পর্যটন শিল্পের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন দেখা দেয়। বাংলাদেশের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য আর বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতিকে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে **১৯৭২** সালের **২৭**শে নভেম্বর জারিকৃত মহামান্য রাষ্ট্রপতির **১৪৩**নং আদেশবলে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পর্যটন সম্ভাবনাকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানের উদ্যোগ সূচিত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে **১৯৭৩** সালের জানুয়ারি মাসে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন' নামে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং **১৯৭৫** সালে বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার পর বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে নেওয়া হয়। জাতীয় পর্যটন সংস্থা হিসেবে এই সংস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের বিকাশ, পর্যটন সম্ভাবনাময় স্থানসমূহের অবকাঠামোর উন্নয়ন, পর্যটকদের সেবা প্রদান, বিদেশে ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরা ও দেশের পর্যটন সম্পদের বিকাশসাধন করা। এর ফলে এ শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করা যাবে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব ও অবদান : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। খাতটি নানাভাবে এদেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এ শিল্পের অবদান অতুলনীয়। পর্যটন কর্পোরেশন মুনাফা অর্জনকারী সংস্থার মধ্যে একটি। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার পাশাপাশি পর্যটন শিল্পে মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য **১৯৭৪** সালে জাতীয় হোটেল এবং পর্যটন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে। এ পর্যন্ত এখানে পরিচালিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে কয়েক হাজার শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকেই দেশ-বিদেশে কর্মরত রয়েছে।

বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ও সম্ভাবনা : বাংলাদেশের প্রাচীন ঐতিহ্য মসলিন। পৃথিবীব্যাপী এদেশের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল সূক্ষ্ম বস্ত্র মসলিনের মাধ্যমে। দেশের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও ইতিহাস বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ করে এদেশের আর্থিক সমৃদ্ধি এনেছে। বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন রয়েছে বাংলাদেশে, যা বিশ্ববাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করে। বাংলাদেশে রয়েছে পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত। ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের আমাদের দেশটি যেন প্রাকৃতিক এক মিউজিয়াম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর দৃষ্টিনন্দন এদেশটি যুগে যুগে তাই অনেক কবি-লেখক তৈরিতে সহায়ক হয়েছে এবং বিখ্যাত পর্যটকদের আকৃষ্ট করেছে।

বাংলাদেশের অনুপম নিসর্গ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পর্যটন কেন্দ্রগুলো। এসব অনুপম নৈসর্গিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য উপভোগের জন্য বাংলাদেশ যুগে যুগে হাতছানি দিয়েছে কাছের ও দূরের ভ্রমণ পিপাসুদের। তারা অবাক হয়ে এদেশের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য উপভোগ করেছেন। অনেকেই তাদের ভ্রমণ অভিজ্ঞতায় প্রশস্তি গেয়েছেন বাংলাদেশের মনোলোভা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের। তাই বাংলাদেশের রূপে মুগ্ধ একজন পর্যটক বলেছেন– বাংলাদেশে প্রবেশের হাজার দুয়ার খোলা রয়েছে কিন্তু বেরুবার একটিও নেই।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। তাই দেশে ক্রমান্বয়ে বিদেশি পর্যটক এবং পর্যটন খাত থেকে বৈদেশিক মুদ্রার আয় বেড়ে চলেছে। সুইজারল্যান্ডভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা 'দ্য নিউ সেভেন ওয়ান্ডার্স ফাউন্ডেশন' অনলাইনে প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্য নির্বাচন প্রতিযোগিতায় শীর্ষ দশ স্থানের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত 'কক্সবাজার' ও বিশ্বের একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট 'সুন্দরবন'।

বাংলাদেশের পর্যটন স্পট : ভ্রমণের নেশা মানুষের স্বভাবগত। প্রকৃতি যে অন্তহীন সৌন্দর্যের পসরা সাজিয়ে বসে আছে, একমাত্র দেশভ্রমণের ফলে তা পূর্ণভাবে উপভোগ করা সম্ভব হয়। আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে অবাধ চলার সুযোগ করে দিয়েছে বলেই মানুষ খুব সহজেই দেশ-দেশান্তরের দর্শনীয় স্থানগুলো উপভোগ করতে সক্ষম হয়েছে। পর্যটকদের কাছে বাংলাদেশ একটি আকর্ষণীয় দেশ। বাংলাদেশের সবুজ-শ্যামল প্রাকৃতিক শোভা সত্যিই নয়নাভিরাম। তাছাড়া কক্সবাজার পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দুটোই উপভোগ করা যায় কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত থেকে। ঐতিহাসিক পর্যটন নিদর্শন হিসেবে খ্যাত মহাস্থানগড়, রামসাগর, সোনারগাঁও, লালবাগ দুর্গ, কান্তজীর মন্দির প্রভৃতি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি হিসেবে খ্যাত রাঙামাটি, বান্দরবান, কাপ্তাই হ্রদ, মহেশখালী, সুন্দরবন, জাফলং প্রভৃতি পর্যটন স্পট রয়েছে।

পর্যটন কেন্দ্রগুলো আকর্ষণীয় করে তুলতে সরকারি উদ্যোগ : বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পকে গতিশীল ও আকর্ষণীয় করার জন্য এবং স্থানীয় পর্যটন কেন্দ্রগুলো সুপরিচিত ও সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার এক্সক্লুসিভ জোন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। আগামী **২০২১** সালের মধ্যে দেশের পর্যটন শিল্পকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার জন্য একটি খসড়া নীতিমালাও তৈরি করা হয়েছে। কক্সবাজার বিমানবন্দর উন্নয়নে সরকার পদক্ষেপ নিয়েছেন। ইনানী থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত মেরিন ড্রাইভ নির্মাণসহ সেন্টমার্টিন দ্বীপের উন্নয়নে মাস্টার প্লানের কাজ চলছে। কুয়াকাটা পর্যটন কেন্দ্রের রাস্তাঘাট উন্নয়নের জন্য ওই এলাকাকে পৌর এলাকা ঘোষণাসহ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এসব বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে আমাদের পর্যটন শিল্প বিপুল সমৃদ্ধি বয়ে আনবে বলে আশা করা যায়।

উপসংহার : বর্তমানে বাংলাদেশে পর্যটন শিল্প এক অভাবনীয় উন্নয়নের সোপান। বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পকে আরও উন্নত করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। সরকারের পাশাপাশি আমরা বেসরকারি উদ্যোগে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটাতে পারি। আমাদের সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এদেশের পর্যটন শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটবে, অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে– এটাই আজকের প্রত্যাশা।

৬. গ. ভূমিকা : মাদকাসক্তি আমাদের সমাজের ভয়াবহ একটি সমস্যা। কিছু পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে একজন মানুষ নিজেকে মাদকের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে। আমাদের দেশের তরুণদের মধ্যে মাদক গ্রহণের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। একটি জাতির উন্নয়নের ধারাকে গতিশীল করে তরুণসমাজ। কিন্তু মাদক তরুণসমাজের সেই অদম্য কর্মপ্রেরণাকে ধ্বংস করে দেয়। ফলে সে নিজেকে যেমন ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়, তেমনি দেশকেও মহাবিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দেয়। তাই এর প্রতিকার করা অত্যাবশ্যক।

মাদকের আবির্ভাব বা উৎস : নেশার ইতিহাস বেশ প্রাচীন। মদ, গাঁজা, আফিম, চরস বা তামাকের কথা বহু আগে থেকেই মানবসমাজে প্রচলিত ছিল। উনিশ শতকের মধ্যভাগে বেদনানাশক ওষুধ হিসেবে মাদকের ব্যবহার শুরু হয়, যাকে ইংরেজিতে ড্রাগ বলা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সৈনিকদের ব্যথার উপশম হিসেবে ড্রাগের ব্যবহার হলেও পরে হতাশা কাটাতেও তারা ড্রাগ ব্যবহার করতো। এরপর থেকেই কলম্বিয়া, বলিভিয়া, ব্রাজিল, ইকুয়েডর ইত্যাদি দেশে নেশার দ্রব্য হিসেবে ব্যাপকভাবে ড্রাগের ব্যবহার শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীব্যাপী।

মাদকদ্রব্যের প্রকারভেদ : সমাজে নানা ধরনের মাদকদ্রব্যের উদ্ভাবন ও ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন– হেরোইন, প্যাথেড্রিন, এলএসডি, মারিজুয়ানা, কোকেন, হাসিস প্রভৃতি আধুনিককালের মাদকদ্রব্য; তবে এর মধ্যে হেরোইন ও কোকেন বেশ দামি। আমাদের দেশের যুবসমাজ সচরাচর যে মাদকদ্রব্যগুলো ব্যবহার করে সেগুলো হলো– সিডাকসিন, ইনকটিন, প্যাথেড্রিন, ফেনসিডিল, ডেক্সপোটেন, গাঁজা ইত্যাদি। তবে এ সবকিছুর ব্যবহারকে ছাড়িয়ে গেছে অত্যাধুনিক এক মাদক যার নাম ইয়াবা।

মাদকদ্রব্যের ব্যবহার : দেশে মাদকের ব্যবহার বহু বিচিত্র। মানুষ নিজেকে অপ্রকৃতিস্থ করতে মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে। মাদকের ব্যবহার করে সে কল্পনার জগতে বিচরণ করে। এক্ষেত্রে মাদক ব্যবহারকারীরা নানা ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করে। যেমন– ধূমপান, ইনহেল বা শ্বাসের মাধ্যমে, জিহ্বার নিচে গ্রহণের মাধ্যমে, সরাসরি সেবনের মাধ্যমে, স্কিন পপিং ও মেইন লাইনিংয়ের মাধ্যমে। তবে যেভাবেই গ্রহণ করুন না কেন তাদের উদ্দেশ্য একটাই। আর তা হলো নেশায় উন্মত্ত হওয়া। প্রথমে কৌতূহলের বশে অনেকেই নেশাদ্রব্য গ্রহণ করে। কিন্তু ধীরে ধীরে তাতে অভ্যস্ত হয়ে ভয়াবহ এক সর্বনাশের পথে এগিয়ে যায় তারা।

মাদকাসক্তির কারণ : এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, মাদকাসক্তির অন্যতম কারণ ব্যক্তিজীবনের হতাশা। মানুষ যখন জীবন সম্পর্কে অনেক বেশি হতাশ হয়ে পড়ে, তখন সে মাদকদ্রব্যের আশ্রয় নেয়। হতাশাগ্রস্ত সাধারণ তরুণদের মধ্যে মাদক গ্রহণের হারও অনেক বেশি। তাছাড়া অসৎ সঙ্গে লিপ্ত হয়েও অনেকেই মাদকের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। যেসব পরিবারে পারিবারিক অশান্তি অনেক বেশি, সে পরিবারের ছেলেমেয়েদের জীবন বিশৃঙ্খল হতে থাকে। তারা এই বিশৃঙ্খলা থেকে ধীরে ধীরে মাদকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আমরা প্রতিদিনের পত্রপত্রিকায় এ ধরনের অনেক ঘটনাই লক্ষ করি। বেশির ভাগ মাদকসেবী দেখা যায় যারা বন্ধুবান্ধব বা সহপাঠীর সংস্পর্শে মাদকে আসক্ত হয়, তবে পারিবারিক অশান্তিই মাদকাসক্তির বিশেষ কারণ হিসেবে দেখা যায়।

মাদক চোরাচালান : সাধারণত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মাদক চোরাচালান হয়। সীমান্তে স্থল বা জলপথে এবং আকাশপথে বিশ্বব্যাপী এক বৃহৎ মাদক চোরাচালান নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে যার পেছনে রয়েছে বিরাট এক সিন্ডিকেট। কিছুকাল আগেও মায়ানমার, থাইল্যান্ড ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম নিয়ে গড়ে ওঠে আন্তর্জাতিক মাদক চোরাচালানের 'স্বর্গভূমি'। তবে ভিয়েতনামে সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে এই নেটওয়ার্ক ভেঙে যায়। এর কিছুদিন পরেই চোরাচালানকারীরা ইরান, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান নিয়ে গড়ে তোলে ড্রাগ পাচারের নতুন ভিত্তিভূমি, যার নাম 'গোল্ডেন ক্রিসেন্ট'।

বাংলাদেশে মাদকের আগ্রাসন : বাংলাদেশে মাদকের ব্যবহার আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অবৈধভাবে দেশে প্রবেশ করা এই মাদক আমাদের যুবসমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। মায়ানমার থেকে অবাধে এদেশে প্রবেশ করছে ইয়াবা, যাতে আসক্ত হয়ে পড়ছে বহু তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতি। দর্শনার 'কেরু এন্ড কোম্পানি' এদেশের একমাত্র লাইসেন্সধারী মদ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান; কিন্তু তার বাইরে বহু বিদেশি কোম্পানির মদ অবৈধভাবে অবাধে বাজারে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া গাঁজা ও আফিমের মতো মাদকদ্রব্যও অবাধে ক্রয়-বিক্রয় করা হচ্ছে।

মাদকাসক্তির ভয়াবহতা : মাদকাসক্তিকে অপ্রতিরোধ্য রোগ এইডসের সঙ্গে তুলনা করা যায়। মাদকাসক্তি মানুষকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। ইয়াবা ও হেরোইনের মতো মাদকদ্রব্য মানুষের শরীরের সমস্ত রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। এর আসক্তিতে মানুষ এক অস্বাভাবিক জীবনযাপন করে। নেশায় আক্রান্ত ব্যক্তির সুস্থ জীবনে ফিরে আসাও খুব সহজ হয় না। শরীরে মাদক গ্রহণ বন্ধ করা মাত্রই 'উইথড্রয়াল সিমটম' শুরু হয়। তখন মাদক না পেলে শুরু হয় টার্কি পিরিয়ড; হাত পা কাঁপতে থাকে; অসম্ভব শারীরিক যন্ত্রণা শুরু হয় এবং একপর্যায়ে তা হৃৎপিণ্ডে আঘাত করে। তখন সুচিকিৎসা না পেলে খুব অল্প সময়ে মাদকাসক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

মাদকাসক্তি প্রতিরোধ : বিশ্বজুড়ে যে মাদকবিষ ছড়িয়ে পড়ছে তার থাবা থেকে মানুষকে বাঁচাতে হবে। এ নিয়ে বিশেষজ্ঞরা ভাবছেন। সমাজসেবীরা উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। দেশে দেশে নানা সংস্থা ও সংগঠন মাদকবিরোধী আন্দোলন শুরু করেছে। আমাদের দেশেও মাদকবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছে। বেতার, টিভি, সংবাদপত্র ইত্যাদি গণমাধ্যম মাদকবিরোধী জনমত গঠনে সক্রিয় হয়েছে। মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়েছে। এসব তৎপরতার লক্ষ্য হচ্ছে :

১. মাদকাসক্তদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ভেষজ ও মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ,
২. সুস্থ বিনোদনমূলক কার্যক্রমের সঙ্গে তরুণদের সম্পৃক্ত করে নেশার হাতছানি থেকে তাদের দূরে রাখা,
৩. ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে মাদকাসক্তির মর্মান্তিক পরিণতি সম্পর্কে সকলকে সচেতন করা,
৪. মাদক ব্যবসা ও চোরাচালানের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলা,
৫. বেকার যুবকদের জন্যে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

উপসংহার : মাদকাসক্তি একটি সামাজিক সমস্যা। এ সমস্যায় তরুণরাই বেশি আসক্ত। একটি দেশের গতিশীলতাকে অব্যাহত রাখে তরুণসমাজ। তারাই যদি মাদকের কবলে পড়ে নিজেদের জীবনকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়, তবে দেশের সার্বিক অগ্রগতি চরমভাবে বিনষ্ট হবে। তাই তরুণসমাজকে মাদক সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং এর কারবারিদের সর্বাগ্রে বয়কট করতে হবে। আমাদের প্রত্যাশা বাংলাদেশ মাদকমুক্ত হয়ে সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হোক।

দিনাজপুর বোর্ড–২০২৪

সেট : গ

বাংলা দ্বিতীয় পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) **বিষয় কোড : 1 0 2**

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময় : ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি কালো কালির বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. **নিচের কোনটি বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ?**
ⓚ রাজপথ ⓚ সেতার
ⓖ ঘিভাত ⓖ তেলেভাজা

(ক) রাজপথ (খ) সেতার (গ) ঘিভাত (ঘ) তেলেভাজা

২. **নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি কোনটি?**
(ক) কুলটা (খ) একাদশ (গ) গোষ্পদ (ঘ) বৃহস্পতি

৩. **কোনটি অনুকার দ্বিত্বের উদাহরণ?**
(ক) গরম গরম (খ) সুরে সুরে (গ) ফটাফট (ঘ) চুপচাপ

৪. **নিচের কোন নারীবাচক শব্দের সঙ্গে নরবাচক শব্দের গঠনগত মিল নেই?**
(ক) শিক্ষিকা (খ) বেগম (গ) বাঘিনি (ঘ) সতীন

৫. **'সকলের মঙ্গল হোক' –বাক্যটি কোন কাল নির্দেশ করে?**
(ক) সাধারণ ভবিষ্যৎ (খ) অনুজ্ঞা ভবিষ্যৎ (গ) অনুজ্ঞা বর্তমান (ঘ) সাধারণ বর্তমান

৬. **দারুণ! আমরা জিতে গিয়েছি। –বক্তব্যের লক্ষ্য অনুযায়ী কোন শ্রেণির বাক্য?**
(ক) আবেগবাচক (খ) বিবৃতিবাচক (গ) প্রশ্নবাচক (ঘ) অনুজ্ঞাবাচক

৭. **নিচের কোনটি সরল বাক্য?**
(ক) যে ছেলেটি এখানে এসেছিল, সে আমার ভাই।
(খ) দোষ করেছো; অতএব শাস্তি পাবে।
(গ) বিপদ ও দুঃখ একসঙ্গে আসে।
(ঘ) সে এখানে এসে সব কথা খুলে বলল।

৮. **ভাষার আঞ্চলিক বৈচিত্র্যকে কী বলা হয়?**
(ক) প্রাকৃত ভাষা (খ) আর্য ভাষা (গ) উপভাষা (ঘ) ধ্রুপদি ভাষা

৯. **'বাগ্‌ধারা' নিয়ে আলোচনা করা হয়–**
(ক) অর্থতত্ত্বে (খ) ধ্বনিতত্ত্বে (গ) রূপতত্ত্বে (ঘ) বাক্যতত্ত্বে

১০. **পশ্চিমবঙ্গে কোন উপভাষার ব্যবহার পাওয়া যায়?**
(ক) বরেন্দ্রি (খ) রাঢ়ি (গ) কামরূপি (ঘ) পূর্বি

১১. **অনুনাসিক স্বরধ্বনি উচ্চারণে কোনটি নিচে নেমে আসে?**
(ক) ওষ্ঠ (খ) আলজিভ (গ) মূর্ধা (ঘ) কোমল তালু

১২. **নিচের কোনটি মৌলিক স্বরধ্বনি?**
(ক) অ্যা (খ) ঐ (গ) ঔ (ঘ) ঈ

১৩. **তালব্য ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ আছে কোন শব্দে?**
(ক) কাকা (খ) থালা (গ) ঝড় (ঘ) ধান

১৪. **কোনটি সাধিত শব্দ?**
(ক) গাছ (খ) মাছ (গ) চাঁদ (ঘ) সাংবাদিক

১৫. <u>ফুলের</u> **গন্ধে ঘুম আসে না– এই বাক্যে 'ফুলের' কোন কারক?**
(ক) অধিকরণ (খ) সম্বন্ধ (গ) অপাদান (ঘ) কর্ম

১৬. **যে বাক্যের ক্রিয়া-বিশেষ্য বাক্যের ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে কোন বাচ্য বলে?**
(ক) কর্তাবাচ্য (খ) কর্মকর্তাবাচ্য (গ) ভাববাচ্য (ঘ) কর্মবাচ্য

১৭. **সাধারণ পূরণবাচকের নারীবাচক রূপের ব্যবহার আছে কোনটিতে?**
(ক) পহেলা (খ) তেহাই (গ) দ্বাদশী (ঘ) আটাশে

১৮. **নিচের কোনটি তুর্কি শব্দ?**
(ক) দারোগা (খ) তোশক (গ) উকিল (ঘ) কলম

১৯. **'ইত্তেফাক' কোন জাতীয় নাম-বিশেষ্য?**
(ক) স্থাননাম (খ) কালনাম (গ) ব্যক্তিনাম (ঘ) সৃষ্টিনাম

২০. **নির্দেশক সর্বনামের উদাহরণ কোনটি?**
(ক) কেউ (খ) এরা (গ) যে-সে (ঘ) স্বয়ং

২১. **'তাকে আসতে বললাম,** <u>**তবু**</u> **এলো না'– বাক্যটি কোন যোজক নির্দেশ করেছে?**
(ক) বিরোধ যোজক (খ) বিকল্প যোজক (গ) সাপেক্ষ যোজক (ঘ) কারণ যোজক

২২. **মানী পক্ষের বহুবচনে কী লগ্নক ব্যবহৃত হয়?**
(ক) আবলি (খ) এরা (গ) মালা (ঘ) গণ

২৩. **'আরাক্ত' শব্দে 'আ' উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে?**
(ক) অপূর্ণ (খ) ঈষৎ (গ) অভাব (ঘ) বিপরীত

২৪. **নিচের কোনটি কৃৎপ্রত্যয় সাধিত শব্দ?**
(ক) বর্ধমান (খ) বুদ্ধিমান (গ) জ্ঞানবান (ঘ) দয়াবান

২৫. **নিন্দা অর্থে কোন শব্দটি ব্যবহার হয়েছে?**
(ক) চোরা (খ) ডিঙা (গ) বেতো (ঘ) জ্যাঠামি

২৬. **'প্রাচী' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?**
(ক) প্রতীচ্য (খ) প্রতীচী (গ) প্রত্যক্ষ (ঘ) প্রফুল্ল

২৭. **'স্বর্ণ' শব্দের সঠিক প্রতিশব্দ কোনটি?**
(ক) কান্তিমান (খ) কুন্তল (গ) কনক (ঘ) সবিতা

২৮. **নিচের কোন বাগ্‌ধারাটির অর্থ 'বিশৃঙ্খল'?**
(ক) কাছাঢিলা (খ) নয়-ছয় (গ) ঘোড়ার ডিম (ঘ) জগাখিচুড়ি

২৯. **'গবাক্ষ' শব্দের দ্বারা জানালা বোঝালে অর্থের কী ধরনের পরিবর্তন হয়?**
(ক) অর্থবদল (খ) অর্থের অবনতি (গ) অর্থের উন্নতি (ঘ) অর্থসংকোচ

৩০. **বাক্যের মধ্যকার একাধিক পদকে সংযুক্ত করতে কোন যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হয়?**
(ক) কোলন (খ) ড্যাশ (গ) হাইফেন (ঘ) সেমিকোলন

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

দিনাজপুর বোর্ড–২০২৪

বাংলা দ্বিতীয় পত্র (রচনামূলক প্রশ্ন)

সেট : ০৩ বিষয় কোড : | 1 | 0 | 2 |

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। উত্তর প্রাসঙ্গিক ও যথাযথ হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

১। যে-কোনো একটি বিষয়ে অনুচ্ছেদ লেখো। ১০

(ক) জাতীয় সংগীত

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়।

২। (ক) মনে করো, তুমি সোহেল/সোহেলী। তোমার বিশেষ প্রয়োজনে কিছু ঋণ প্রয়োজন। এ জন্য যে-কোনো সরকারি ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়ার জন্য ব্যবস্থাপক বরাবর একটি আবেদনপত্র লেখো। ১০

অথবা,

(খ) মনে করো, তুমি সেলিম/সেলিনা। কাপাসিয়া, গাজীপুরের বাসিন্দা। বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ পালনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে যে-কোনো জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের উপযোগী একটি পত্র লেখো।

৩। (ক) সারাংশ লেখো : ১০

তুমি বসন্তের কোকিল, বেশ লোক। যখন ফুল ফুটে, দক্ষিণা বাতাস বহে, এ সংসার সুখের স্পর্শে শিহরিয়া উঠে, তখন তুমি আসিয়া রসিকতা আরম্ভ করো। আবার যখন দারুণ শীতে জীবলোকে থরহরি কম্প লাগে, তখন কোথায় থাকো, বাপু! যখন শ্রাবণের ধারায় আমার চালাঘরে নদী বহে, যখন বৃষ্টির চোটে কাক চিল ভিজিয়া গোময় হয়, তখন তোমার মাজা মাজা কালো কালো দুলালি ধরনের শরীরখানি কোথায় থাকে? তুমি বসন্তের কোকিল, শীত-বর্ষার কেহ নও।

অথবা,

(খ) সারমর্ম লেখো :

বসুমতি, কেন তুমি এতই কৃপণা,
কত খোঁড়াখুঁড়ি করি পাই শস্য কণা।
দিতে যদি হয় দে মা, প্রসন্ন সহাস–
কেন এ মাথায় ঘাম পায়েতে বহাস?
বিনা চাষে শস্য দিলে কী তাহাতে ক্ষতি?
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কন বসুবতী,
আমার গৌরব তাহে সামান্যই বাড়ে,
তোমার গৌরব তাহে নিতান্তই ছাড়ে।

৪। যে-কোনো একটি ভাব-সম্প্রসারণ করো : ১০

(ক) ভোগে নয়, ত্যাগেই মনুষ্যত্বের বিকাশ।

(খ) অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

৫। (ক) মনে করো, তুমি আরশ/আরশিহা, একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার একজন জেলা প্রতিনিধি। জেলার সড়কের দুরবস্থা সংক্রান্ত একটি সংবাদ প্রতিবেদন প্রণয়ন করো। ১০

অথবা,

(খ) মনে করো, তুমি ফাহিম/ফাহিমা, একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি। তোমার জেলার শহিদ স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'সুন্দর হাতের লেখা' প্রতিযোগিতা বিষয়ক একটি সংবাদ প্রতিবেদন প্রণয়ন করো।

৬। যে-কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করো : ২০

(ক) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

(খ) কৃষিকাজে বিজ্ঞান

(গ) রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন।

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	খ	২	ক	৩	ঘ	৪	খ	৫	গ	৬	ক	৭	ঘ	৮	গ	৯	ক	১০	খ	১১	ঘ	১২	ক	১৩	গ	১৪	ঘ	১৫	খ
	১৬	গ	১৭	গ	১৮	ক	১৯	ঘ	২০	খ	২১	ক	২২	ঘ	২৩	খ	২৪	ক	২৫	ঘ	২৬	খ	২৭	গ	২৮	ঘ	২৯	ক	৩০	গ

রচনামূলক

১. ক. রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত এক বা একাধিক দেশপ্রেমমূলক গানকে জাতীয় সংগীত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির সূচনায় বা জাতীয় দিবসসমূহ পালনের সময়ে বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতিদিন সকালের সমাবেশে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়। জাতীয় সংগীত পরিবেশনের সময়ে সমবেত সবাইকে উঠে দাঁড়াতে হয়। এটা দেশের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর সামিল। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় খেলা শুরুর আগেও প্রতিযোগীরা নিজ নিজ দেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করে। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের প্রথম লাইন: 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।' বাউল গানের সুরে গানটি রচনা করেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। **১৯৭২** সালের **১৩ই** জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশের মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে গানটিকে জাতীয় সংগীতের মর্যাদা দেওয়া হয়। গানটির কথায় বাংলাদেশ এবং বাংলা ভাষার প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রতিফলিত হয়েছে। এই ধরনের জাতীয় সংগীত দেশের মানুষকে নিজ দেশের প্রতি দায়বদ্ধ হতে শেখায়।

১. খ. উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত বহু বিদ্যাচর্চার প্রতিষ্ঠানকে বলে বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে একদিকে যেমন জ্ঞান বিতরণ করা হয়, অন্যদিকে তেমন নতুন জ্ঞান সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণিগুলোতে জ্ঞান বিতরণ করা হয় এবং যাঁরা নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করেন তাঁদের এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করা হয়। যাঁরা জ্ঞান বিতরণের সঙ্গে জড়িত তাঁরা অধ্যাপক নামে এবং যাঁরা জ্ঞান সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত তাঁরা গবেষক নামে পরিচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাশাখাগুলোকে সাধারণত মানবিক, সমাজতত্ত্ব, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কৃষি, আইন, চারুকলা, প্রযুক্তি, চিকিৎসা প্রভৃতি শৃঙ্খলা বা অনুষদে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। প্রাচীন কালে উপমহাদেশে একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল যার নাম নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। এর বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থান বাংলাদেশের সীমানার অদূরে। পৃথিবীর প্রাচীনতম যে বিশ্ববিদ্যালয়টি এখনো চালু আছে তার নাম আল কারাওয়াইন বিশ্ববিদ্যালয়। এটি মরক্কোর ফেজ শহরে অবস্থিত। বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। **১৯২১** সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দেড় শতাধিক। এগুলো বিভিন্ন শ্রেণিনামে পরিচিত : স্বায়ত্তশাসিত, সরকারি, বেসরকারি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, কৃষি, প্রকৌশল, মেডিকেল, বিশেষায়িত, কেন্দ্রীয়, আন্তর্জাতিক ইত্যাদি। জ্ঞানচর্চার মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বিশ্বকে কল্যাণমূলক ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

২. ক.

৩০শে আগস্ট, ২০২...
বরাবর
ব্যবস্থাপক
সোনালী ব্যাংক লি.
ফুলপুর শাখা, ময়মনসিংহ
বিষয় : ব্যাবসায়িক ঋণ গ্রহণের জন্য আবেদন।
প্রিয় মহোদয়,
আপনার ব্যাংকে আমার সঞ্চয়ী ও চলতি উভয় প্রকার হিসাব খোলা আছে। আপনি হয়তো অবগত যে, আমাদের ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান মেসার্স আলিফ ট্রেডার্স দীর্ঘদিন ধরে আপনাদের ব্যাংকে সুনামের সাথে লেনদেন পরিচালনা করে আসছে। সম্প্রতি আমরা আমাদের ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য একটি নতুন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। এ লক্ষ্যে আমাদের প্রতিষ্ঠানের নামে আনুমানিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যাবসায়িক ঋণ গ্রহণ করা প্রয়োজন। উক্ত ঋণের মূলধন এবং সুদের অর্থ আমরা মোট ৩৬ কিস্তিতে ৩ বছরে পরিশোধ করতে চাই। ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা আপনাদের ব্যাংকের সকল শর্ত মেনে চলব। উল্লেখ্য যে, ২০২... সালের মার্চ মাসে আমরা আপনাদের ব্যাংক থেকে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে তা যথাসময়ে পরিশোধ করি।
আমাদের চাহিদা মাফিক ঋণ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করছি।
আপনার বিশ্বস্ত
(স্বাক্ষর)
সোহেল আইমান
স্বত্বাধিকারী, মেসার্স আলিফ ট্রেডার্স
ফুলপুর, ময়মনসিংহ
সোনালী ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাব নং : **১১৭৭০৮**
চলতি হিসাব নং : **১২২০০১**
সংযুক্তি :
১. ব্যবসা সম্প্রসারণের কর্মপরিকল্পনা।
২. পূর্বের ঋণ পরিশোধের প্রমাণপত্র।

২. খ. **গাজীপুরের কাপাসিয়ায় বৃক্ষমেলা অনুষ্ঠিত**

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাপাসিয়া, ১৪ই জুলাই, ২০২... : ১০ই জুন থেকে কাপাসিয়া ডিগ্রি কলেজ মাঠে সপ্তাহব্যাপী বৃক্ষমেলা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন স্থান থেকে আসা প্রায় ৬৫টি স্টল মেলায় অংশগ্রহণ করে। স্থানীয়ভাবে মানুষের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে এ মেলা। মেলায় ছিল মানুষের উপচে-পড়া ভিড়। শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণিসহ সব বয়স এবং সব শ্রেণি-পেশার মানুষ এ মেলায় অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন স্টল ঘুরে ঘুরে দেখেন। মেলায় প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা বিক্রি হয়।

মেলা উপলক্ষ্যে প্রতিদিন বিকালবেলা আলোচনা সভা ও সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদ্দীপনামূলক ও গণসংগীতের ব্যবস্থাও ছিল মেলায়। মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উপপরিচালক জনাব আলি ইদ্রীস সুজন। আলোচনায় অংশ নেন কাপাসিয়া ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ ইফতেখারুল আমীন, জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি জামিল হোসেন এবং উপজেলা কৃষি অফিসার মামুন সরোয়ার। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন গাজীপুর জেলাপ্রশাসক ইয়াসিন মোল্লা।

বক্তাগণ বলেন যে, আমাদের দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা দরকার। কিন্তু রয়েছে মাত্র ১৬ শতাংশ। দেশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে ৩০ শতাংশ বনভূমি গড়ে তোলার পরিকল্পনা করে সে মোতাবেক অগ্রসর হতে হবে। বক্তাগণ প্রত্যেককে অন্তত তিনটি করে চারাগাছ লাগানোর জন্য আহ্বান জানান। তাহলে আমাদের দেশে অতিরিক্ত প্রায় ৬০ কোটি গাছ লাগানো সম্ভব হবে; যা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। মেলায় সমাপনী দিনে শ্রেষ্ঠ স্টলের পুরস্কার প্রদান করা হয়। শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করে সবুজায়ন নার্সারি।

৩. ক. সুবিধাবাদীদের উপস্থিতি সুসময়ে দেখা যায়। দুঃখের দিনে তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রয়োজনের সময়ে এই সুসময়ের বন্ধুরা কোনো উপকারে আসে না।

৩. খ. পরিশ্রমের মাঝে যা পাওয়া যায় তার দাম যেমন অনেক, তার গৌরবও বেশি। যে-কোনো উন্নতির মূলে রয়েছে শ্রমবৃদ্ধি, শ্রমসাধনা। আর যা করুণার দান, ভিক্ষার দান, তা গ্রহণ করায় রয়েছে লজ্জা। এর ভেতর কোনো গৌরব নেই।

৪. ক. দেশ ও মানবকল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাওয়ার মধ্যে রয়েছে ত্যাগের অনন্ত মহিমা। আর এ ত্যাগের মধ্যেই নিহিত রয়েছে প্রকৃত সুখ। কিন্তু ভোগলিপ্সা শুধু লোভী করে তোলে, সুখী করতে পারে না। অপরের মঙ্গালের আত্মতৃপ্তিই বড়ো সুখ।

ভোগের কোনো শেষ নেই, কোনো পরিতৃপ্তি নেই। যতই মানুষ ধনসম্পদ ভোগ করে ততই তার ভোগের ইচ্ছা বেড়ে যায়। ফলে প্রচুর ভোগের ব্যবস্থাও তার কাছে অতি সামান্য বলে মনে হয় এবং অন্তরের দিক থেকে সে খুবই দরিদ্র হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত আরও ভোগ করার অতৃপ্ত লালসার দংশন তাকে এমনভাবে জর্জরিত করতে থাকে, তার ধনসম্পদ যত বেশিই হোক তা তার কাছে অতি নগণ্য বলে প্রতীয়মান হয়। আরও বেশি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তার অন্তরে এক দুঃখানুভূতি জাগিয়ে রাখে। যা আছে তা ভোগ করে আনন্দ লাভ করতে তার আর প্রবৃত্তি থাকে না। যা নেই তা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় আকুল হয়ে সে শুধু দুঃখকেই আহ্বান করতে থাকে। অন্যদিকে প্রত্যেক মানুষেরই দেশের প্রতি ও সমাজের প্রতি অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এ দায়িত্ব এত বেশি যে কখনো শেষ হয় না। সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য মানুষকে মহৎ করে তোলে এবং অন্তর অপার আনন্দে পরিপূর্ণ করে দেয়। সমাজে অনেক অসহায় নারী-পুরুষ রয়েছে। তাদের বিপদে সাহায্য করতে পারলে অজ্ঞাতে অন্তরে এক অনির্বচনীয় শান্তি ও সুখের ধারা বয়ে যায়।

অতএব পরের মঙ্গালের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে পারলেই প্রকৃত সুখ পাওয়া যায় এবং জীবন সার্থক হয়। পরার্থে জীবন উৎসর্গ করার মাঝেই রয়েছে প্রকৃত সুখ ও শান্তি। তাই জীবনের সুন্দর বিকাশের জন্য স্বার্থত্যাগ বাঞ্ছনীয়।

৪. খ. অন্যায় করা আর অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া সমান অপরাধ। অন্যায়ভাবে শক্তিমান, ঐশ্বর্যবান হওয়া যেমন দোষের তেমনি অন্যায় সহ্য করার মানসিকতাও সমভাবে নিন্দনীয়।

সহজ ও সুন্দর জীবনযাত্রার জন্য প্রত্যেক মানুষেরই কিছু নৈতিক কর্তব্য রয়েছে। সামাজিক অনুশাসনে নিয়ন্ত্রিত এই অলিখিত কর্তব্যের যথাযথ রূপায়ণ ঘটলে মানুষের মর্যাদাবোধ ক্ষুণ্ন হয় না। কিন্তু এই মর্যাদা রক্ষার ক্ষমতা বা সাহস সকলের সমান হয় না। ফলে কিছু লোভী, পরশ্রীকাতর ও অত্যাচারী মানুষ দুর্বলের ওপর নির্যাতন করার সাহস পায়। অন্যায়কারীরা নিজের হীন ইচ্ছাকে বীরভোগ্য বসুন্ধরা বা Might is right ভেবে তৃপ্ত হয়। 'জোর যার মুল্লুক তার' এই মনোভাবে বিশ্বাসীরা নিরীহ, শান্তিপ্রিয় মানুষের ওপর চড়াও হয়– সুখশান্তি ব্যাহত করে, নির্যাতন চালায়, সম্ভ্রম ও শ্লীলতাহানি করে। কেন তারা এমন করতে পারে? বস্তুত কিছু মানুষের নীরবতা, উদাসীনতা, কাপুরুষতা, পৌরুষহীনতা পরোক্ষভাবে মদদ জোগায় অন্যায়কারীদের। যদি সমস্ত ভয় ভেঙে দুর্বলের দল, নিস্পৃহের দল অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে মাথা তুলে প্রতিবাদ করতো– তবে অন্যায়কারী পিছু হঠতে বাধ্য হতো। সেক্ষেত্রে অন্যায় কখনোই সংঘটিত হতে পারত না।

মূলত অন্যায়কে সহ্য করা, প্রকারান্তরে অন্যায়কে সমর্থন করা। তাই যে অন্যায় করে সে যেমন পাপী যে অন্যায় কার্যকে সহ্য করে সেও তেমনি পাপী ও ঘৃণ্য।

৫. ক.

সড়কের বেহাল দশা : যাত্রীদের দুর্ভোগ

আরশ, চাটখিল (নোয়াখালী), ২২শে জুলাই ২০২...॥ নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি উপজেলার জয়াগ বাজার থেকে কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ উপজেলার হাসনাবাদ পর্যন্ত শহিদ মুক্তিযোদ্ধা একরামুল হক সড়কটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। প্রায় এক যুগ ধরে সড়কটির কোনো সংস্কার কাজ হয়নি। সড়কের এ বেহাল দশায় যাত্রীরা চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছে।

গতকাল মঙ্গালবার দুপুরে সরেজমিনে দেখা গেছে, বারো কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কটির পুরোটাই বড়ো বড়ো গর্ত ও খানাখন্দে ভরা। জয়াগ বাজার থেকে মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের নগরপাড়া সেতু পর্যন্ত দুই কিলোমিটার অংশে দুই পাশের মাটি সরে গেছে। প্রতিদিন এ সড়ক দিয়ে নোয়াখালীর চাটখিল ও সোনাইমুড়ি, কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ ও লাকসাম এবং চাঁদপুরের শাহরাস্তি উপজেলার হাজার হাজার বাসিন্দা চলাচল করে। এছাড়া কমপক্ষে ত্রিশটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এ পথে যাতায়াত করে থাকে। এলাকাবাসী জানান, সড়কটির তিন কিলোমিটার সোনাইমুড়ি এবং বাকি নয় কিলোমিটার চাটখিল উপজেলায় পড়েছে। বিগত ২০২... সালের বন্যায় সড়কটির সুরকির স্তর দেবে গিয়ে বালু বের হয়ে আসে এবং

সৃষ্টি হয় খানাখন্দের। এরপর প্রতি বর্ষায় বৃষ্টিপাতে পানি ও কাদায় সড়কটি একাকার হয়ে যায়, যা এখন চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। গত বুধবার একটি পিকআপ ভ্যান ভাওরকোট গ্রামের কাছে রাস্তার গর্তে পড়ে যায়। এতে চালকসহ তিন জন যাত্রী আহত হন।

চাটখিল ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ মানুষ মনে করে, সড়কটি নিয়ে এলাকাবাসীর দুর্ভোগ দীর্ঘদিনের। অথচ এর সমাধানে কর্তৃপক্ষের কোনো নজর নেই। এটি মেরামতের জন্য স্থানীয় লোকজন সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে একাধিকবার আবেদন করলেও কোনো প্রতিকার পায়নি। এলাকাবাসীর দাবি, গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কটি দ্রুত সংস্কার করে জনদুর্ভোগ কমাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যেন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

৫. খ.

সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতা

ফাহিম, জেলা প্রতিনিধি, পাবনা, ২২শে ফেব্রুয়ারি, ২০২...... ॥

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে শহিদ স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ের উদ্যোগে সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পাবনা জেলার বিভিন্ন স্কুল-কলেজের প্রায় ৩৫০ জন শিক্ষার্থী এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করে। সকাল নয়টায় অনুষ্ঠানের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। নির্দিষ্ট রচনা থেকে লেখার জন্য শিক্ষার্থীদের এক ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়। দুটি বিভাগে ছিল এ আয়োজন– বাংলা ও ইংরেজি। বিকালে ছিল পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রতি বিভাগে তিন জন করে মোট ছয় জনকে পুরস্কৃত করা হয়। বিচারক হিসেবে ছিলেন এই স্কুলের শিক্ষক মুকুল কুমার মিত্র, আয়শা সুলতানা ও আফজাল হোসেন খান। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন সংস্কৃতিকর্মী জনাব ফজলুল হক। এরপর শহিদ স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক পর্ব উপভোগ করেন উপস্থিত দর্শক ও অতিথিবৃন্দ।

৬. ক. **ভূমিকা :** বাঙালির আবহমান কালের ইতিহাসে এক মাইলফলক স্বাধীনতা যুদ্ধ। এক মহিমান্বিত ইতিহাস রচিত হয়েছে এই **১৯৭১** সালে। রক্ত, অশ্রু, আর অপরিসীম আত্মত্যাগের ভেতর দিয়ে একাত্তরে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীনতা। আর বীরত্বপূর্ণ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে অভ্যুদয় হয়েছে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের। মুক্তিযুদ্ধ তাই আমাদের জাতীয় জীবনে এক অহংকার, গৌরবের এক মহান বিজয়গাথা।

মুক্তিযুদ্ধের সূচনা : গণ-আন্দোলনের মুখে জেনারেল আইয়ুব খানের পদত্যাগের পর জেনারেল ইয়াহিয়া খান **১৯৬৯** সালে পুনরায় সামরিক শাসন জারি করেন। তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করেই ঘোষণা করলেন, শীঘ্রই সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে সামরিক বাহিনী ব্যারাকে ফিরে যাবে। ইয়াহিয়া খানের ঘোষণানুযায়ী **১৯৭০** সালের **১৭ই** ডিসেম্বরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের **১৬৯টি** আসনের মধ্যে **১৬৭টিতে** এবং প্রাদেশিক পরিষদের **৩৯০টি** আসনের মধ্যে **২৯৮টি** আসনে জয়ী হয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। নির্বাচনের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে ইয়াহিয়া খান গড়িমসি শুরু করেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ভুট্টোর পরামর্শে **১৯৭১** সালের তেসরা মার্চ জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনের তারিখ ঘোষণা করেন। ইত্যবসরে জুলফিকার আলী ভুট্টো এসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলাপ-আলোচনা করে পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যান। কিন্তু ইয়াহিয়া খান হঠাৎ পহেলা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন।

অসহযোগ আন্দোলন : ইয়াহিয়া খানের পহেলা মার্চের ঘোষণায় পূর্ব পাকিস্তানের জনতা হতবাক হয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনার জন্য ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক ঐতিহাসিক জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন–

- সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে।
- অবিলম্বে সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে।
- সামরিক বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার করতে হবে।
- জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের পূর্বেই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

এ আহ্বানে সকল অফিস আদালত, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায় এবং স্বাধীনতা আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে।

আলোচনার নামে প্রহসন : ১৫ই মার্চ ইয়াহিয়া খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকায় এসে ১৬ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে বৈঠকে বসেন। দীর্ঘ দশ দিন পর্যন্ত আলোচনা চলে। এ আলোচনা ছিল প্রহসন মাত্র। এ বৈঠকের আড়ালে তারা কালক্ষেপণ করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ আনতে থাকে।

তীব্র আন্দোলন শুরু ও গণপ্রতিরোধ : আলোচনার নামে এরূপ প্রহসনের বিরুদ্ধে তীব্র গণ-আন্দোলন শুরু হলে সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান এ আন্দোলন চিরতরে স্তব্ধ করার লক্ষ্যে ২৫শে মার্চ গভীর রাতে জনগণের ওপর সেনাবাহিনী লেলিয়ে দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে পাড়ি জমান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘুমন্ত জনগণের ওপর সেনাবাহিনীর অতর্কিত হামলায় ঢাকা শহর ভয়াল মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়।

স্বাধীনতা ঘোষণা : ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এ ঘোষণার সাথে সাথেই সর্বত্র সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হয়।

অস্থায়ী সরকার গঠন : ১০ই এপ্রিল পূর্ব বাংলার নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্যরা মুজিবনগরে এক অধিবেশনে মিলিত হয়ে বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র ঘোষণা দেয় এবং **১৭ই** এপ্রিল বহুসংখ্যক দেশি-বিদেশি সাংবাদিক, গণপরিষদ সদস্য ও মুক্তিকামী জনতার উপস্থিতিতে কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরের আম্রকাননে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করে এবং মেহেরপুরকেই মুজিবনগর নাম দিয়ে বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানী ঘোষণা করা হয়।

মুক্তিবাহিনী গঠন ও চূড়ান্ত বিজয় : অস্থায়ী সরকার গঠনের পর মুক্তিবাহিনী গঠিত হয় এবং কর্নেল (অব.) আতাউল গনি ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর সেনাপতি করা হয়। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশকে **১১টি** সেক্টরে ভাগ করা হয়। এদেশের অগণিত ছাত্র-জনতা, পুলিশ, ইপিআর, আনসার ও সামরিক বেসামরিক লোকদের সমন্বয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করা হয়। তারা পাকবাহিনীর মুখোমুখি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এভাবে

দীর্ঘ ৯ মাসের যুদ্ধে পাকবাহিনীর অবস্থা অত্যন্ত নাজুক হয়ে পড়ে। আর কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে হানাদার বাহিনী **১৯৭১** সালের **১৬ই** ডিসেম্বর নিঃশর্তভাবে মিত্রবাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে **৯৩** হাজার পাকিস্তানি সৈন্য আত্মসমর্পণ করে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও প্রাপ্তি : পাকিস্তানি শোষকদের শোষণ-বঞ্চনা ও ভেদ-বৈষম্যের অবসান, অর্থনৈতিক মুক্তি, সর্বোপরি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও বাস্তবতা হলো, স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও মুক্তিযুদ্ধের এ চেতনা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এখনো এদেশের মানুষ ঘুমায় পথের ধারে, এখনো মানুষ মরে অনাহারে, এখনো জাতীয় পতাকা পোড়ানো হয়, মসজিদের ইমামকে গুম, হত্যা করা হয়, মন্দিরের জমি-জায়গা দখল করা হয়। এখনো মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়, গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে মানুষ বঞ্চিত হয়। সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও দুঃশাসনের কবলে পড়ে দেশবাসী আজ বড়ো অসহায়। আর এসবই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থি।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন : প্রথমত বাংলাদেশের তরুণ যুবকদের সুসংগঠিত করার মধ্য দিয়ে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বাস্তবায়িত করা যেতে পারে। এরপর জনগণের কাছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে রূপরেখা তুলে ধরতে হবে। শিক্ষা-কার্যক্রমে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটসহ এর নানাবিধ ঘটনা উপস্থাপিত করা যেতে পারে। সমস্ত গণমাধ্যমে এ চেতনা বাস্তবায়নে জনমত তৈরি করতে হবে। শুধু রাষ্ট্রের দিকে চেয়ে এই মহান আদর্শকে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়, বরং সকলকে একসঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর কাদা ছোড়াছুড়ি বন্ধ করে অন্তত এই বিষয়ে একই প্ল্যাটফর্মে সমবেত হতে হবে। আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা এমনকি সমাজকাঠামোতে যে দুর্নীতির রাহুগ্রাস বর্তমান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় তার মূলোৎপাটনে এগিয়ে আসতে হবে। লক্ষ শহিদের রক্তের মর্যাদায়, শত-সহস্র মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে আমাদের পাওয়া মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তাহলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়িত হবে।

আমরা লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে পাওয়া মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করি হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা দিয়ে। প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর বুকে গড়ে উঠুক এক সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিফলিত হয় কবির এ কবিতায়–

'স্বাধীনতা তুমি
রবি ঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান।
স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজরুল ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা।
স্বাধীনতা তুমি
শহিদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা।'

উপসংহার : মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির ইতিহাসে এক সোনালি অধ্যায়। এ অধ্যায় বড়ো উজ্জ্বল, অত্যন্ত বেদনা ও আনন্দের। মুক্তিযুদ্ধ থেকেই বাঙালির সত্তায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনের চেতনা জন্ম নেয়। তবে স্বাধীনতার এতো দিন পরেও সার্বভৌমত্ব রক্ষা, অর্থনৈতিক মুক্তি ও সাংস্কৃতিক মুক্তির জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে। তাই ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের জন্য দলমত জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলকে নতুন করে শপথ নিতে হবে।

৬. খ. **ভূমিকা :** সভ্যতার ক্রম পরিবর্তনে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা পালন করেছে বিজ্ঞান। বর্তমান বিশ্বে মানুষের যে অগ্রযাত্রা তা বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। বিজ্ঞান মানুষকে গতিশীল করেছে এবং সভ্যতার অগ্রযাত্রাকে করেছে ত্বরান্বিত। বর্তমানে কৃষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূত্র বিজ্ঞানই আবিষ্কার করেছে। কৃষিকাজে বিজ্ঞানের অবদান অপরিসীম।

মানবসভ্যতা ও কৃষি : মানব সভ্যতার ইতিহাস অত্যন্ত পুরোনো। আর সেই সভ্যতার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কৃষির হাত ধরেই। মানুষ শিকারের বিকল্প হিসেবে কৃষিকে বেছে নিয়ে তার জীবনকে গতিশীল ও উন্নত করেছিল। তাই এটি মানুষের আদিমতম জীবিকার একটি পেশাও বটে। সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায় যে, কৃষিতে যে দেশ যত তাড়াতাড়ি অগ্রগতি সাধন করতে পেরেছে, সে দেশ তত তাড়াতাড়ি সভ্যতার উপরের সিঁড়িকে অতিক্রম করেছে। এ থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, কৃষির উন্নতিতেই সমাজ, দেশ ও সভ্যতার ক্রমোন্নতি সম্ভব হয়।

মানবজীবনে কৃষির গুরুত্ব : কৃষি মানুষের অস্তিত্বের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। মানবজীবন ও মানবসমাজে এর গুরুত্ব অপরিসীম। জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে এটি মানুষের আদিমতম জীবিকার উপায়। দেশে দেশে কৃষিই সমাজের মেরুদণ্ড, কৃষিই সমাজের ভিত্তি। স্বভাবতই কৃষির ক্রমোন্নতিতেই সমাজের ও দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি। এই উন্নতিতে অনন্য ও অভাবনীয় ভূমিকা রেখেছে বিজ্ঞান। আজকের বিশ্বে প্রতিটি ক্ষেত্রের মতো কৃষিক্ষেত্রেও বিজ্ঞানই আজ বাড়িয়ে দিয়েছে তার সুদূরপ্রসারী কল্যাণী হাত।

কৃষিকাজে বিজ্ঞান : মানুষ খাদ্যের জন্য কৃষির ওপর নির্ভরশীল। আজ বিজ্ঞানের প্রভাবে কৃষিকাজ আদিম স্তর কাটিয়ে আধুনিক স্তরে পৌঁছেছে। পানি সেচের ব্যবস্থা, উন্নত ধরনের বীজ, বীজ বপন, ফসল কাটা ও মাড়াই, ভূমি সংরক্ষণ ইত্যাদির প্রভূত উন্নতি কৃষিবিজ্ঞানেরই আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর মেশিনের অবদান। পৃথিবীতে আজ জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু ফসলি জমির পরিমাণ সীমিত। এ সীমিত কর্ষণযোগ্য জমিতে বিজ্ঞানের সহায়তায় নতুন বীজ আবিষ্কার, নতুন পদ্ধতি প্রয়োগে মানুষ ক্ষুধার্তের অন্ন সংগ্রহের প্রয়াস চালাচ্ছে।

বিভিন্ন দেশে কৃষিকাজে বিজ্ঞান : উন্নত দেশগুলোর কৃষিব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিজ্ঞাননির্ভর। জমিতে বীজ বপন থেকে শুরু করে ঘরে ফসল তোলা পর্যন্ত সমস্ত কাজেই রয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়া। বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক কৃষিযন্ত্র, যেমন– মোয়ার (শস্য-ছেদনকারী যন্ত্র), রপার (ফসল কাটার যন্ত্র), বাইন্ডার (ফসল বাঁধার যন্ত্র), থ্রেশিং মেশিন (মাড়াইযন্ত্র), ম্যানিউর স্প্রেডার (সার বিস্তরণ যন্ত্র) ইত্যাদি উন্নত দেশগুলোর কৃষিক্ষেত্রে এনেছে বৈপ্লবিক সাফল্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের খামারে একদিনে **১০০** একর পর্যন্ত জমি চাষ হচ্ছে কেবল এক-একটি ট্রাক্টরের মাধ্যমে। সেগুলো আবার একসাথে তিন-চারটি ফসল কাটার যন্ত্রকে একত্রে কাজে লাগাতে সক্ষম। তারা বিভিন্নভাবে কৃষিকাজের এমন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করছে যার ফলে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তারা কৃষিকাজে ব্যাপকভাবে অগ্রগামী। যেমন বলা যায় জাপানের কথা। জাপানে জমির উর্বরাশক্তি বাংলাদেশের তুলনায় কম। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে তারা বাংলাদেশের তুলনায় ৬ গুণ বেশি ফসল উৎপাদন করছে। শীতপ্রধান দেশে 'শীত নিয়ন্ত্রণ' ঘর বানিয়ে শাকসবজি এবং ফলমূল সংরক্ষণ করছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে বর্তমানে শুষ্ক মরুভূমির মতো জায়গাতে সেচ, সার ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় চাষাবাদ করে সোনার ফসল ফলানো সম্ভব হচ্ছে। এভাবে বিজ্ঞান কৃষিকাজে এক যুগান্তকারী বিপ্লব সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশের কৃষিকাজে বিজ্ঞান : আমাদের দেশেও এখন কৃষিকাজে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে জমি খণ্ডবিখণ্ড হচ্ছে। এই খণ্ডবিখণ্ডতার কারণে জমি কর্ষণে ব্যাপকভাবে ট্রাক্টর ব্যবহার করা যাচ্ছে না। তবে মানুষ এখন আর চাতকের ন্যায় বৃষ্টিধারার জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে না। সেচের জন্য এখন ব্যবহার করা হয় গভীর নলকূপ এবং মেশিনচালিত পাম্প। বপনের জন্য ব্যবহার করা হয় উন্নত ধরনের বীজ। বীজ সংরক্ষণে সাহায্য নেওয়া হয় বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির। বর্তমানে রাসায়নিক সার ব্যবহার করে ফসল উৎপাদনের মাত্রা বাড়ানো হচ্ছে। আগে যে জমিতে একধরনের ফসল হতো, বিজ্ঞানের সাহায্যে এখন সেখানে তিন ধরনের ফসল হয়। ধানের চারা রোপণ, ধান কাটা ও ধান মাড়াইয়ের আধুনিক যন্ত্রপাতি বাংলাদেশে বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে আমাদের দেশের কৃষিকাজ এখনো সম্পূর্ণ যান্ত্রিক করা সম্ভব হয়নি। চাষাবাদে বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারলে আমাদের খাদ্য সমস্যা সমাধান করা যাবে এবং বিদেশেও রপ্তানি করা যাবে।

বিজ্ঞানসম্মত কৃষির গুরুত্ব : আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কৃষির বাস্তবিক গুরুত্ব অনেকখানি। তবে পুরোনো পদ্ধতির চাষাবাদে বর্তমানে আর সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। এখন প্রয়োজন অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ। উন্নত বিশ্বের মতো ছোটো জায়গায় অধিক ফসল ফলানোর কৌশল আমাদেরও আয়ত্ত করতে হবে। তবেই কৃষক ও কৃষির সমন্বিত সাফল্য ত্বরান্বিত হবে।

বৈজ্ঞানিক কৃষি ও অর্থনীতি : বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষিকাজের ফলে অর্থনীতির অগ্রগতি সাধিত হওয়া সম্ভব। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, আমরা এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি। আমরা নিজেদের উৎপাদিত ফসল বাইরেও রপ্তানি করতে সমর্থ হচ্ছি। জীবনরহস্য আবিষ্কারের ফলে পাটের সোনালি দিন আবার আমাদের মধ্যে আসতে শুরু করেছে। বহু আগে থেকেই আমরা বিভিন্ন দেশে চা রপ্তানি করে আসছি। সুতরাং সর্বাধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদের ফলে আমাদের পক্ষে এ সাফল্যকে আরও ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

উপসংহার : কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞানের জাদুর ছোঁয়ায় অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। কেননা বিজ্ঞানকে আমরা যত কাজে লাগাতে পারব, ততই আমাদের কৃষিতে অপার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। তাই সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায় থেকেই বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদে কৃষককে উৎসাহিত করা আবশ্যক এবং সহযোগিতার হাতকে প্রসারিত করা একান্ত কর্তব্য।

৬. গ. **ভূমিকা :** বাংলার মুসলিম নারী জাগরণ ও নারীমুক্তির অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। তিনি রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও মুক্তমনা প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী ছিলেন। মুসলিম নারীশিক্ষার অন্ধকার যুগে মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে মহল্লায় মহল্লায় ছাত্রী সংগ্রহ করে নারীশিক্ষা বিস্তারে রেখেছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তিনি শুধু সমাজসেবিকাই নন, বাংলা গদ্যের একজন বিশিষ্ট শিল্পীও বটে। সমাজের কুসংস্কার ও অজ্ঞতা দূর করার জন্য অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং হৃদয়গ্রাহী গদ্য রচনাও তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি ছিল।

জন্ম ও বংশপরিচয় : ১৮৮০ সালের ৯ই ডিসেম্বর রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে বিখ্যাত মুসলিম পরিবারে বেগম রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জহিরুদ্দীন মুহম্মদ আবু আলী সাবের। তিনি আরবি ও ফারসি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। এ পরিবারে পর্দাপ্রথা এত কঠোর ছিল যে, মহিলারা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও চাকরানি ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের সামনে যেতে পারতেন না।

শিক্ষাজীবন : রোকেয়ার সময় মুসলমানগণ অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অশিক্ষার অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছিল। ইংরেজি শিক্ষার নামে তারা শিউরে উঠত, নারী শিক্ষাকে তারা মহাপাপ মনে করতো। এরূপ এক তমসাচ্ছন্ন পরিবেশে বেগম রোকেয়ার জন্ম। রোকেয়ার পিতাও সমাজের কুসংস্কার হতে মুক্ত ছিলেন না। এ কারণেই রোকেয়াকে কুরআন শরিফ ছাড়া আর কিছুই পড়তে দেওয়া হয়নি। বেগম রোকেয়ার জ্ঞানপিপাসা ছিল অসীম। রোকেয়ার বড়ো ভাই আবুল আসাদ ইব্রাহীম সাবের তাঁকে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। গভীর রাতে বাড়ির সকলে ঘুমিয়ে পড়লে বালিকা রোকেয়া মোমবাতির আলোতে বড়ো ভাইয়ের কাছে ইংরেজি ও বাংলা পড়তেন। শত লাঞ্ছনা-গঞ্জনার মধ্যেও এভাবে দিনের পর দিন তাঁর শিক্ষার দ্রুত উন্নতি হতে লাগল। তাঁর বিদ্যাশিক্ষার আগ্রহ দেখে ভাইও তাঁকে যত্নের সঙ্গে শিক্ষাদান করতে লাগলেন। আর এ সময়েই বেগম রোকেয়ার মনে মুসলিম নারী সমাজের দুর্গতি কীভাবে দূর করা যায় সেই ভাবনা জন্ম নেয় এবং এক্ষেত্রে তাঁর স্বামী সাখাওয়াত হোসেন সহযোগিতা করেন।

বৈবাহিক জীবন : বিহারের ভাগলপুরে রোকেয়ার বিবাহ হয়। তাঁর স্বামী ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন। তিনি ছিলেন বিদ্যোৎসাহী। তাঁর সাহায্যে বেগম রোকেয়ার শিক্ষার ক্রমোন্নতি হয়। নিজে শিক্ষালাভ করেই বেগম রোকেয়া থামলেন না, তিনি বাংলার মুসলিম নারীদের দুর্দশাও লক্ষ করলেন। বুঝলেন, শিক্ষার বিস্তার না হলে তাদের উন্নতি সম্ভব নয়। তাই তিনি নারীশিক্ষার প্রসারে নিয়োজিত হলেন।

কর্মজীবন : নিয়তির কী পরিহাস, বিয়ের নয় বছর পর ১৯১১ সালে রোকেয়াকে নিঃসন্তান অবস্থায় রেখে স্বামী সাখাওয়াত হোসেন পরলোকগমন করেন। সংসারের বাঁধন হতে মুক্ত হয়ে বেগম রোকেয়া নারী জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করার মনস্থ করেন। সে অনুযায়ী রোকেয়া শ্বশুরালয় ভাগলপুরে একটি স্কুল খুলে শিক্ষাদান করার চিন্তা করেন। কিন্তু স্কুল খোলায় নানারকম সমস্যা দেখা দেওয়ায় তিনি ভাগলপুর ত্যাগ করে কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতায় এসে স্বামীর প্রদত্ত শেষ সম্বল দশ হাজার টাকা দিয়ে তিনি ১৯১১ সালে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পাঁচজন ছাত্রী নিয়ে স্কুল স্থাপিত হলো। রোকেয়া নিজেই স্কুলের ছাত্রীদের পড়াতে লাগলেন। কিন্তু অনেক বাধা বিপত্তি তাঁকে মোকাবিলা করতে হলো। বাড়িঘর, আত্মীয়-স্বজন সব ছেড়ে, শত বিদ্রূপ-অপমান সয়ে তিনি স্কুলের জন্য সংগ্রাম করে চললেন। দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরে তাঁর সাধনা সফল হলো। সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল একটি প্রথম শ্রেণির ইংরেজি বিদ্যালয়ে পরিণত হলো। এছাড়াও রোকেয়া সমাজে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কলকাতায় ১৯১৬ সালে 'আঞ্জুমান খাওয়াতীনে ইসলাম মহিলা সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন।

সাহিত্যিক রোকেয়া : কর্মী রোকেয়া যত বড়ো, সাহিত্যিক রোকেয়া আরও বড়ো ও খ্যাতিমান। রোকেয়া সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল তাঁর কর্মশক্তির অপূর্ব নিদর্শন। স্কুলের কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে তিনি সাহিত্যচর্চা করতেন। তিনি 'মতিচূর', 'পদ্মরাগ', 'অবরোধবাসিনী' প্রভৃতি বই রচনা করেন। তাছাড়া তিনি 'সুলতানার স্বপ্ন' (Sultana's Dream) নামক একখানা ইংরেজি বইও রচনা করেন। তাঁর রচিত বইগুলো বাংলার মুসলিম নারী জাগরণে এক প্রামাণ্য দলিল হিসেবে পরিগণিত। তিনিই বাংলাদেশের মুসলিম নারী আন্দোলনের জন্মদাত্রী ও পথিকৃৎ।

উপসংহার : ১৯৩২ সালের ৯ই ডিসেম্বর এই মহীয়সী রমণী পরলোকগমন করেন। বেগম রোকেয়া নারী-মুক্তির দূত হয়ে এসেছিলেন। মুসলিম নারী সমাজের দুর্গতির কথা তাঁর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। তাই বাংলার নর-নারী শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর নাম উচ্চারণ করে। কারণ রোকেয়ার কীর্তি অমর– তাঁর স্মৃতি অক্ষয়।

ময়মনসিংহ বোর্ড–২০২৪

সেট : গ

বাংলা দ্বিতীয় পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : | 1 | 0 | 2 |

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময় : ৩০ মিনিট

পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি কালো কালির বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. **'বাংলাদেশ'– কোন বিশেষ্য পদ?**
ⓚ জাতি-বিশেষ্য ⓚ নাম-বিশেষ্য
ⓖ সমষ্টি-বিশেষ্য ⓖ গুণ-বিশেষ্য

২. **নিচের কোন বাক্যে বিধেয় বিশেষণ আছে?**
ক) লোকটা পাগল খ) আধা কেজি চাল
গ) খুব ভালো খবর ঘ) তৃতীয় প্রজন্ম

৩. **ভূত, ভাবী এবং শর্ত কোন ক্রিয়ার উদাহরণ?**
ক) অকর্মক ক্রিয়া খ) অসমাপিকা ক্রিয়া
গ) যৌগিক ক্রিয়া ঘ) প্রযোজক ক্রিয়া

৪. **ভয়ে ভয়ে, চুপি চুপি– গঠন বিবেচনায় কোন ক্রিয়াবিশেষণ?**
ক) ধরনবাচক খ) পদাণু
গ) বহুপদী ঘ) কালবাচক

৫. **অনুসর্গকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়?**
ক) দুই ভাগে খ) তিন ভাগে
গ) চার ভাগে ঘ) পাঁচ ভাগে

৬. **ছেলেটাকে চোখে চোখে রাখো। এখানে 'চোখে চোখে' কোন শব্দ দ্বিত্ব?**
ক) অনুকার দ্বিত্ব খ) বিভক্তিযুক্ত পুনরাবৃত্ত
গ) ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্ব ঘ) সাধারণ দ্বিত্ব

৭. **প্রকৃতি-প্রত্যয় সাধিত সঠিক শব্দ কোনটি?**
ক) চল্ + ইষ্ণু = চলিষ্ণু খ) প্রাণ + ই = প্রাণী
গ) ঢাক্ + আই = ঢাকাই ঘ) সল্ + ঈল = সলিল

৮. **পদের অংশ কোনটি?**
ক) প্রত্যয় খ) উপসর্গ গ) নির্দেশক ঘ) অনুসর্গ

৯. **'এ' বর্ণের উচ্চারণ কয় রকমের?**
ক) দুই খ) তিন গ) চার ঘ) পাঁচ

১০. **অর্থ নেই, কিন্তু অর্থের দ্যোতনা তৈরি করে–**
ক) অনুসর্গ খ) উপসর্গ গ) বিভক্তি ঘ) প্রত্যয়

১১. **সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ নিচের কোনটি?**
ক) বন + ঔষধি = বনৌষধি খ) শীত + আর্ত = শীতার্ত
গ) পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা ঘ) রবী + ইন্দ্র = রবীন্দ্র

১২. **বাংলা ভাষায় মৌলিক ধ্বনি কয়টি?**
ক) ৭ টি খ) ৩২ টি গ) ৩৭ টি ঘ) ৫০ টি

১৩. **'তেহাই' কী ধরনের সংখ্যাবাচক শব্দ?**
ক) সাধারণ পূরণবাচক খ) গণনাবাচক
গ) ক্রমবাচক ঘ) ভগ্নাংশ পূরণবাচক

১৪. **বাংলা লিপি কোন লিপির বিবর্তিত রূপ?**
ক) সংস্কৃতি লিপি খ) ব্রাহ্মীলিপি
গ) আর্য লিপি ঘ) কুটিল লিপি

১৫. **বাংলা ভাষায় প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন কে?**
ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ) রামমোহন রায়
গ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ) রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ

১৬. **প্রত্যয় যোগে নারীবাচক শব্দ গঠিত হয়েছে নিচের কোনটিতে?**
ক) বিধবা খ) বেগম গ) শ্রীমতী ঘ) মেয়ে

১৭. **'বাদি' শব্দটি দ্বারা ফরিয়াদি বোঝালেও 'বাদী' শব্দটি দ্বারা কী বোঝানো হয়?**
ক) চাকরানি খ) মতাদর্শ গ) যথার্থ ঘ) দেয়াল

১৮. **বাক্যের মধ্যকার একাধিক পদকে সংযুক্ত করতে কোন যতিচিহ্নের ব্যবহার হয়?**
ক) কমা খ) কোলন গ) ড্যাস ঘ) হাইফেন

১৯. **নিচের কোন বাক্যটি ভাববাচ্যের?**
ক) শরতে শিউলি ফোটে।
খ) চিঠিটা পড়া হয়েছে।
গ) আমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।
ঘ) ওখানে কেন যাওয়া হলো?

২০. **নিত্য অতীত কালের শ্রোতাপক্ষের সাধারণ রূপে ক্রিয়ার সাথে কোন বিভক্তি যুক্ত হয়?**
ক) তাম খ) তি গ) ত ঘ) তে

২১. **নিচের কোনটি যৌগিক বাক্যের উদাহরণ?**
ক) নিয়মিত সাঁতার কাটো, স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।
খ) সে এখানে এসে সব কথা খুলে বলল।
গ) যদি তুমি যাও, তবে তার দেখা পাবে।
ঘ) আমি পড়া শোনা শেষ করে খেলতে যাব।

২২. **একবচন শব্দের পরে কী যুক্ত হয়ে বহুবচন শব্দ তৈরি করে?**
ক) লগ্নক খ) নির্দেশক গ) বিভক্ত ঘ) প্রত্যয়

২৩. **বাক্যের মধ্যকার একাধিক শব্দ দিয়ে গঠিত বাক্যাংশকে কী বলে?**
ক) উদ্দেশ্যের প্রসারণ খ) বাক্যাংশ
গ) বিধেয় কর্ম ঘ) বর্গ

২৪. **'বল্লভ' শব্দটির প্রতিশব্দ নিচের কোনটি?**
ক) স্বামী খ) তপন গ) পানি ঘ) সাগর

২৫. **কোন কারকে ক্রিয়ার উৎস নির্দেশ করা হয়?**
ক) অধিকরণ খ) সম্বন্ধ গ) করণ ঘ) অপাদান

২৬. **'সোনায় সোহাগা' বাগ্‌ধারাটির সমার্থক বাগ্‌ধারা হলো–**
ক) মানিক জোড় খ) সোনার পাথর বাটি
গ) মণিকাঞ্চন যোগ ঘ) একাদশে বৃহস্পতি

২৭. **যদি বৃষ্টি হতো, সবাই মিলে খিচুড়ি খেতাম। ক্রিয়ার বিশিষ্ট প্রয়োগে বাক্যটি কোন কালের?**
ক) সাধারণ ভবিষ্যৎ খ) সাধারণ বর্তমান
গ) সাধারণ অতীত ঘ) ঘটমান বর্তমান

২৮. **নিচের কোন বাক্যে অলংকার আবেগ আছে?**
ক) বাহ্! চমৎকার লিখেছো। খ) আরে; তুমি আবার কখন এলে?
গ) যাকগে, ওসব কথা থাক। ঘ) বেশ, তবে যাওয়াই যাক।

২৯. **গোলাপ নামের ফুল = গোলাপফুল কোন সমাসের উদাহরণ?**
ক) দ্বন্দ্ব খ) বহুব্রীহি গ) তৎপুরুষ ঘ) কর্মধারয়

৩০. **জিভের সম্মুখ-পশ্চাৎ অবস্থান অনুযায়ী স্বরধ্বনিগুলো কয় ভাগে বিভক্ত?**
ক) দুই ভাগে খ) তিন ভাগে গ) চার ভাগে ঘ) পাঁচ ভাগে

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

ময়মনসিংহ বোর্ড–২০২৪

বাংলা দ্বিতীয় পত্র (রচনামূলক প্রশ্ন)

সেট : ০৩ বিষয় কোড : | 1 | 0 | 2 |

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। উত্তর প্রাসঙ্গিক ও যথাযথ হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

১। যে-কোনো একটি বিষয়ে অনুচ্ছেদ লেখো : ১০

(ক) বইমেলা

(খ) মোবাইল ফোন।

২। (ক) মনে করো, তুমি ইফতি। ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা জানিয়ে তোমার বন্ধু রাহাতকে একটি পত্র লেখো। ১০

অথবা,

(খ) মনে করো, তুমি মাসুম। সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিকারের দাবি জানিয়ে পত্রিকায় প্রকাশের উপযোগী একটি পত্র লেখো।

৩। (ক) সারাংশ লেখো : ১০

তুমি বসন্তের কোকিল, বেশ লোক। যখন ফুল ফুটে, দক্ষিণা বাতাস বহে, এ সংসার সুখের স্পর্শে শিহরিয়া উঠে, তখন তুমি আসিয়া রসিকতা আরম্ভ করো। আবার যখন দারুণ শীতে জীবলোকে থরথরি কম্প লাগে, তখন কোথায় থাকো, বাপু! যখন শ্রাবণের ধারায় আমার চালাঘরে নদী বহে, যখন বৃষ্টির চোটে কাক চিল ভিজিয়া গোময় হয়, তখন তোমার মাজা মাজা কালো কালো দুলালি ধরনের শরীরখানি কোথায় থাকে? তুমি বসন্তের কোকিল, শীত-বর্ষার কেহ নও।

অথবা,

(খ) সারমর্ম লেখো :

বসুমতি, কেন তুমি এতই কৃপণা
কত খোঁড়াখুঁড়ি করি পাই শস্যকণা।
দিতে যদি হয় দে মা, প্রসন্ন সহাস–
কেন এ মাথার ঘাম পায়েতে বহাস?
বিনা চাষে শস্য দিলে কী তাহাতে ক্ষতি?
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কন বসুমতী,
আমার গৌরব তাহে সামান্যই বাড়ে,
তোমার গৌরব তাহে নিতান্তই ছাড়ে।

৪। যে-কোনো একটি বিষয়ে ভাব-সম্প্রসারণ করো :

(ক) মানুষ বাঁচে তার কর্মের মধ্যে, বয়সের মধ্যে নয়। ১০

(খ) গ্রন্থগত বিদ্যা আর পরহস্তে ধন,
নহে বিদ্যা নহে ধন হলে প্রয়োজন।

৫। (ক) মনে কর, তুমি অরুণ। তোমার বিদ্যালয়ের নবীনবরণ ও বিদায়-সংবর্ধনা অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন সম্পর্কিত একটি সংবাদ প্রতিবেদন তৈরি করো। ১০

অথবা,

(খ) মনে করো, তুমি ধ্রুব। 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকার একজন নিজস্ব সংবাদদাতা হিসেবে সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতা বিষয়ক একটি প্রতিবেদন তৈরি করো।

৬। যে-কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করো : ২০

(ক) ভাষা-আন্দোলন

(খ) মাদকাসক্তি ও এর প্রতিকার

(গ) কৃষিকাজে বিজ্ঞান।

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	ⓐ খ	২	ক	৩	খ	৪	গ	৫	ক	৬	খ	৭	ক	৮	ঘ	৯	ক	১০	খ	১১	গ	১২	গ	১৩	ঘ	১৪	ঘ	১৫	খ
	১৬	গ	১৭	খ	১৮	ঘ	১৯	ঘ	২০	ঘ	২১	ক	২২	ক	২৩	ঘ	২৪	ক	২৫	ঘ	২৬	গ	২৭	গ	২৮	গ	২৯	ঘ	৩০	খ

রচনামূলক

১. ক. বইমেলা হলো লেখক, প্রকাশক ও পাঠকের মিলনমেলা। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা-আন্দোলনে সালাম, বরকত, রফিক, শফিউর প্রমুখ শহিদ হন। তাদের সেই স্মৃতিকে অম্লান রাখতেই ১৯৭২ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি মুক্তধারার প্রকাশক চিত্তরঞ্জন সাহা ঢাকার বর্ধমান হাউজ প্রাঙ্গণে ৩২টি বই সাজিয়ে বইমেলার সূচনা করেন। সেই থেকে প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে আয়োজন করা হয় একুশে বইমেলা এবং এর নামকরণ করা হয় 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় এ মেলা। মাসব্যাপী একুশে বইমেলা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হয় অসংখ্য বই। মেলা প্রাঙ্গণে প্রবেশের প্রধান তোরণটি সাজানো হয় অত্যন্ত চমৎকারভাবে। মেলার ভেতরে বটবৃক্ষের বেদিমূলে তৈরি করা হয় নজরুল মঞ্চ। চারদিকে চক্রাকারে থাকে প্রয়াত জ্ঞানীগুণী মনীষীদের ছবি এবং সাজানো থাকে বিখ্যাত ব্যক্তিদের অমর বাণী। মেলায় প্রবেশ করতেই চোখে পড়ে স্টল এবং স্টলে সাজানো বই। বইমেলায় সাধারণত সৃজনশীল বইয়ের সমাবেশ ঘটে। বিভিন্ন রুচির পাঠক তাদের পছন্দমতো বই সংগ্রহ করে বইমেলা থেকে। শিশু-কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ সবারই রুচিসম্মত বইয়ের সমাবেশ থাকে মেলায়। এছাড়া বইমেলায় অনেক লেখকের সাথে পাঠকদের সাক্ষাৎ ঘটে। বর্তমানকালে বইমেলা বা পুস্তক প্রদর্শনীগুলোর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এবং সাফল্য গ্রন্থ প্রকাশনার জগতে এনেছে অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য। একুশে বইমেলা একদিকে বাঙালির বই কেনা, পাঠাভ্যাস গঠন ও পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের এক মিলনতীর্থ, অপরদিকে এটি বাঙালির সংগ্রামী চেতনা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের এক তাৎপর্যপূর্ণ অনুষঙ্গ।

১. খ. এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সহজে বহন করা যায় এমন ফোনকে বলে মোবাইল ফোন। মোবাইল ফোন আবিষ্কারের আগে দূরবর্তী কারো সঙ্গে কথা বলার জন্য ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে টেলিফোন নামক যন্ত্র রাখতে হতো। এর সংক্ষিপ্ত নাম ফোন। বিভিন্ন বাড়ি বা অফিসে তারের মাধ্যমে ফোনগুলো যুক্ত থাকত। অন্যদিকে মোবাইল ফোন তারবিহীন প্রযুক্তি হওয়ায় এটি যেখানে খুশি সেখানে বহন করা যায়। মোবাইল ফোনকে কখনো সেলুলার ফোন, হ্যান্ড ফোন বা মুঠোফোন নামে অভিহিত করা হয়। মোবাইল ফোনে আজকাল কথা বলার পাশাপাশি আধুনিক কম্পিউটার প্রযুক্তির যাবতীয় সুবিধা ভোগ করা যায়। এই সুবিধা আছে যেসব মোবাইল ফোনে, সেগুলোকে বলে স্মার্ট-ফোন। এই স্মার্টফোনে কথা বলা যায়, খুদে বার্তা আদান-প্রদান করা যায়, ই-মেইল করা যায়, বিভিন্ন সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে পৃথিবীর যাবতীয় তথ্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়, গান শোনা যায়, নাটক দেখা যায়, রেডিও শোনা যায়, টিভি দেখা যায়। অপরাধী শনাক্ত করার কাজেও আজকাল মোবাইল ফোন গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে মোবাইল ফোন প্রথম চালু হয় ১৯৯৩ সালে। প্রায় ত্রিশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা দশ কোটি ছাড়িয়ে গেছে।

২. ক.

২৫শে মে, ২০২...
পীরগাছা, রংপুর।

প্রিয় রাহাত,

শুরুতেই শুভেচ্ছা নিয়ো। অনেক দিন তোমার কোনো চিঠিপত্র পাচ্ছি না। আশা করি সবাইকে নিয়ে ভালো আছ। গত 'মাঘী পূর্ণিমার' ছুটিতে আমি আর সুব্রত বগুড়া জেলায় অবস্থিত ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহাস্থানগড় দেখতে গিয়েছিলাম। মহাস্থানগড়ের প্রাচীন পুরাকীর্তি বৌদ্ধযুগের স্থাপত্য নিদর্শন ও ভাস্কর্য সম্পর্কে শুধু বইতে পড়েছি। এবার স্বচক্ষে দেখে মুগ্ধ হলাম। প্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শনের কথা চিঠিতে লিখে ঠিক তোমাকে বোঝাতে পারব কি না জানি না। তবুও ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের আনন্দঘন অভিজ্ঞতা তোমার সাথে ভাগ করে নিতেই কলম ধরলাম।

দিনটি ছিল মঙ্গলবার। সকাল সাতটায় নাস্তা খেয়ে আমরা দুজন মহাস্থানগড়ের উদ্দেশে রওয়ানা দিলাম। রংপুর থেকে বেশি দূরে নয় বলে পৌঁছাতে সময় লাগল না। সেখানে পৌঁছে দেখতে পেলাম রাস্তার পাশে ভগ্নপ্রায় বিরাট দ্বিতল ইমারত। সামনে বিশাল পুকুর। চারপাশে সারি সারি গাছ। পুরাতন সেই ইট-পাথরের প্রতিমূর্তি বাংলার অবলুপ্ত শৌর্যবীর্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রাস্তার দুপাশে রয়েছে পুরানো অট্টালিকা। প্রাচীন যুগের কিছু স্থাপত্য নিদর্শন এবং ইতিহাসের উত্থান-পতনের কাহিনি। এসব দেখতে দেখতে যেন অতীতে হারিয়ে গেলাম। সময় পেলে তুমিও একবার দেখতে এসো বাংলার ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহাস্থানগড়। ভালো লাগবে। তোমার লেখাপড়া কেমন চলছে? ভালো থেকো। তোমার সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করছি।

ইতি
তোমার বন্ধু
ইফতি

[বি. দ্র. পত্রের শেষে ডাকটিকিট সংবলিত খাম ও ঠিকানা ব্যবহার অপরিহার্য]

২. খ.

১৩ই মে, ২০২...

বরাবর

সম্পাদক,

দৈনিক সমকাল,

৩৮৭, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।

বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি আপনার পত্রিকায় প্রকাশের আবেদন।

জনাব,

আপনার বহুল প্রচারিত 'দৈনিক সমকাল'-এ চিঠিপত্র কলামে নিম্নলিখিত পত্রটি প্রকাশ করলে বাধিত থাকব।

বিনীত

মাসুম রেজা

ঘিওর, মানিকগঞ্জ।

সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিকার চাই

'একটি দুর্ঘটনা, সারা জীবনের কান্না'– স্লোগানটি নির্মম বাস্তবতানির্ভর। ইদানীং সড়ক দুর্ঘটনা আমাদের দেশে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই সংঘটিত হচ্ছে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা। প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললে একটি না একটি সড়ক দুর্ঘটনার খবর চোখে পড়ে। এ ধরনের দুর্ঘটনা যেন দিন দিন বেড়েই চলছে, যার ফলে বহু পরিবার সর্বনাশের সম্মুখীন হচ্ছে। কত মা-বাবা তার সন্তান হারিয়েছে। কত সদ্যবিবাহিতাকে বিধবা-জীবন বরণ করতে হচ্ছে। কত পিতাকে যে পুত্রের লাশ বহন করতে হচ্ছে। দিন দিন মানুষের জীবন অনিরাপদ হয়ে পড়ছে। একথা সত্য যে, 'জন্মিলে মরিতে হবে।' কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুকে মেনে নেওয়া যায় না।

সাধারণত আমাদের দেশে সড়ক দুর্ঘটনা কয়েকটি কারণ হলো– ত্রুটিযুক্ত গাড়ি, অনভিজ্ঞ বা মাদকাসক্ত ড্রাইভার, ধারণ ক্ষমতার অধিক মাল বা যাত্রী বহন, ওভারটেকিং বা চালকের দায়িত্বহীনতা, ট্রাফিক আইন না মানার প্রবণতা ইত্যাদি। এসব সমস্যা সমাধানে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যেমন– পরিবহণ সংশ্লিষ্ট সবাইকে যানবাহন বিধি ও আইন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া, রাস্তা সংস্কার, ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মিডিয়াগুলোতে সড়ক দুর্ঘটনা সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রচারের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

আশা করি, উপরিউক্ত কারণগুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করলে সড়ক দুর্ঘটনা অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব হবে।

নিবেদক

মাসুম রেজা

৩. ক. সুবিধাবাদীদের উপস্থিতি সুসময়ে দেখা যায়। দুঃখের দিনে তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রয়োজনের সময়ে এই সুসময়ের বন্ধুরা কোনো উপকারে আসে না।

৩. খ. পরিশ্রমের মাঝে যা পাওয়া যায় তার দাম যেমন অনেক, তার গৌরবও বেশি। যে-কোনো উন্নতির মূলে রয়েছে শ্রমবৃদ্ধি, শ্রমসাধনা। আর যা করুণার দান, ভিক্ষার দান, তা গ্রহণ করায় রয়েছে লজ্জা। এর ভেতর কোনো গৌরব নেই।

৪. ক. এ পৃথিবীতে সুন্দর কর্মের জন্যই মানুষ মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকে। অক্ষয় হয়ে থাকে তার মহৎ কর্মগুলো।

এ কথা চিরন্তন সত্য যে, মানুষ মরণশীল। তার দেহ একদিন মাটির সাথে বিলীন হয়ে যাবে। কিন্তু এ নশ্বর পৃথিবীতে সে আপন কীর্তির মহিমায় অমরত্ব লাভ করতে পারে। মানুষ শুধু আহার-নিদ্রায়, ভোগ-বিলাসে মগ্ন থাকার জন্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে না। তার জন্মের মূলে নিশ্চয় স্রষ্টার একটা মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। নইলে মানুষকে বুদ্ধি না দিয়ে পশুর মতো করেই পৃথিবীতে পাঠানো হতো। মানুষের বুদ্ধিমত্তা আছে বলেই সে শুধু আত্মকল্যাণে জীবন কাটিয়ে দিয়ে তৃপ্ত হতে পারে না, জনকল্যাণের মাঝে নিয়োজিত রেখেই সে তার মানুষ নামের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। ফলে এই জনকল্যাণের মাপকাঠি দিয়েই মানুষের জীবনের মূল্য পরিমাপ করা হয়ে থাকে। যে স্বার্থপর লোক শুধু নিজের সুখের জন্য কাজ করে এবং তার চারপাশের যেসব অসহায় নর নারী রয়েছে; তাদের দুঃখ মোচনের জন্য কোনো কিছুই করে না। মৃত্যুর সাথে সাথেই তার স্মৃতি চিরদিনের জন্য পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যায়। তার জন্য কেউ শোক জ্ঞাপন করে না এবং তার কথা কেউ কোনো দিন মনে রাখে না। পক্ষান্তরে অন্যের জন্য যারা অকাতরে নিজেকে বিলিয়ে দেয়, মৃত্যুর পরও তার কীর্তির কথা, তার মহত্ত্বের কথা কেউ ভোলে না। সে সকলের নিকট স্মরণীয়, বরণীয় হয়ে থাকে। মানুষ তার কর্মকে প্রতিনিয়ত শ্রদ্ধা করে ।

মানুষ পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত বয়সকালের মধ্যে নয়; বরং তার সুকর্মের স্মৃতিতে যুগ যুগ বেঁচে থাকে।

৪. খ. বিদ্যা ও ধন এ দুটো মানুষের জীবনে খুবই প্রয়োজন। কিন্তু এ বিদ্যা ও ধনের সার্থকতা নির্ভর করে মানুষের প্রয়োজন মেটানোর ওপর। প্রয়োজনের মুহূর্তে কাজে না লাগলে এ দুটোর কোনো মূল্য নেই।

গ্রন্থের সাহায্যে আমরা বিদ্যার্জন তথা জ্ঞানলাভ করে থাকি। কিন্তু অর্জিত বিদ্যার ব্যাবহারিক প্রয়োগ না শিখলে তা অর্থহীন হয়ে যায়। গ্রন্থের মধ্যে বিদ্যা লিখিত আছে। গ্রন্থ সংগ্রহ করে পাঠ করলে তা অর্জন করা যায়। কিন্তু শুধু পুথিগত বিদ্যা কোনো কাজে আসে না। তাকে ব্যাবহারিক জীবনে প্রয়োগ করতে পারলেই সার্থক হয়। পৃথিবীতে প্রচুর ধনসম্পদ রয়েছে। পরিশ্রম করলেই তা উপার্জন করা যায়। পৃথিবীতে বাঁচতে হলে ধনসম্পদের প্রয়োজন হয়। পরিশ্রম করে তা উপার্জন না করলে প্রয়োজনের সময় পাওয়া যায় না। সুদিনে অনেক বন্ধু পাওয়া

গেলেও দুর্দিনে কাউকে পাওয়া যায় না। গ্রন্থাগারে প্রচুর গ্রন্থ থাকলেই চলে না। তাদের মধ্যে যেসব জ্ঞানের বিষয় আছে, সেগুলোকে ব্যাবহারিক জীবনে প্রয়োগ করতে না পারলে কোনোই প্রয়োজন মেটে না। নিজের জন্য সঞ্চিত না রেখে ধনসম্পদ পরের হাতে তুলে দিলেও প্রয়োজনের সময় ফিরে পাওয়া যায় না। যে প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিদ্যা ও ধনসম্পদ অর্জন করা হয়, তা যদি যথাসময়ে পাওয়া না যায়, তাহলে তার কোনো মূল্য নেই। যে জ্ঞান কোনো ব্যাবহারিক জীবনে প্রয়োগ করা যায় না, সে জ্ঞান দ্বারা নিজে যেমন উপকৃত হয় না; জগতেরও কোনো কল্যাণ সাধিত হয় না। তাই আমাদের উচিত, অর্জিত বিদ্যাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা এবং জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করা।

ধন মানুষের অতীব প্রয়োজনীয় জিনিস। ধন অর্জন করে কেউ যদি অপরের নিকট রেখে দেয়, তাহলে প্রয়োজনের সময় তা পাওয়া যায় না। তেমনি বিদ্যাও যদি কেবল গ্রন্থের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে তা জীবনের কোনো কাজে লাগে না।

৫. ক.

২০শে অক্টোবর, ২০২...

বরাবর

সম্পাদক,

দৈনিক ইনকিলাব,

২/১, আর. কে. মিশন রোড, ঢাকা।

বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।

জনাব,

আপনার বহুল প্রচারিত 'দৈনিক ইনকিলাব' পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশ করলে কৃতার্থ হব।

বিনীত

অরুণ বসাক

ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে নবীনবরণ ও বিদায়-সংবর্ধনা

গত ২৩শে জানুয়ারি, ২০২... তারিখে ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে নবীনবরণ ও বিদায়-সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ এ্যাডভোকেট ইসলাম উদ্দীন খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মনিরুজ্জামান মনির। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবুল আহাদ। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করে স্ব স্ব ধর্মের অনুসারী শিক্ষার্থীরা। তারপর শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ওই অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ও বাংলা বিষয়ের শিক্ষক সরোজ মোস্তফা। এরপর শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে বক্তব্য দেওয়া শুরু হয়। বক্তব্য প্রদান করে বিজ্ঞান বিভাগের বিদায়ী শিক্ষার্থী অপু ও মিতু, মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থী রিফাত ও আবিদ এবং ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের নবীন শিক্ষার্থী হাসান ও রফিক। এসময় এক আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। অনেকে তাদের দীর্ঘদিনের ছাত্রজীবনের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে চোখ অশ্রুসজল করে ফেলে। অনেকে আবার স্কুলজীবনের মজার স্মৃতিগুলো সবার সামনে তুলে ধরে। শিক্ষকরা খুব মন দিয়ে নবীন ও বিদায়ী শিক্ষার্থীদের কথা শোনেন। বিশেষ অতিথি শিক্ষার্থীদের নির্ভীকভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পরামর্শ দেন। প্রধান অতিথি শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মানুষ হওয়ার দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের ভালো ফল প্রত্যাশা করেন। এরপর অতিথিরা স্মারক হিসেবে শিক্ষার্থীদের হাতে ক্রেস্ট ও শুভেচ্ছা উপহার তুলে দেন। স্কুলের মাঠে নবীন ও বিদায়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে নাস্তা পরিবেশন করা হয়।

এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিদায়ী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নবাগত শিক্ষার্থীদের একটি সেতুবন্ধ রচিত হয়। তাছাড়া শিক্ষকদের সঙ্গেও শিক্ষার্থীদের একটি উষ্ণ ভাববিনিময় হয়। ভবিষ্যতে এই স্মৃতিগুলো শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক প্রেরণা জোগাবে।

প্রতিবেদকের নাম ও ঠিকানা	:	অরুণ বসাক, মানবিক বিভাগ, দশম শ্রেণি
প্রতিবেদনের শিরোনাম	:	ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে নবীনবরণ ও বিদায়-সংবর্ধনা
প্রতিবেদনের ধরন	:	বিশেষ প্রতিবেদন
প্রতিবেদন রচনার তারিখ ও সময়	:	২৫শে জানুয়ারি, ২০২...; রাত ৯টা।

৫. খ.

চারুকলায় সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতা

ধ্রুব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক, ঢাকা, ২২শে ফেব্রুয়ারি, ২০২...... ॥

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের উদ্যোগে সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন স্কুল-কলেজের প্রায় ৩৫০ জন শিক্ষার্থী এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করে। সকাল নয়টায় অনুষদ প্রাঙ্গণের বকুলতলায় প্রতিযোগিতা শুরু হয়। নির্দিষ্ট রচনা থেকে লেখার জন্য শিক্ষার্থীদের এক ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়। দুটি বিভাগে ছিল এ আয়োজন– বাংলা ও ইংরেজি। বিকালে ছিল পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রতি বিভাগে তিন জন করে মোট ছয় জনকে পুরস্কৃত করা হয়। বিচারক হিসেবে ছিলেন এই চারুকলা অনুষদের শিক্ষক অধ্যাপক মুকুল কুমার মিত্র, ড. আয়শা সুলতানা ও ড. আফজাল হোসেন খান। জয়নুল আবেদিন মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন সংস্কৃতিকর্মী জনাব ফজলুল হক। এরপর চারুকলা অনুষদের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক পর্ব উপভোগ করেন উপস্থিত দর্শক ও অতিথিবৃন্দ।

৬. ক. **ভূমিকা :** ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর থেকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সংগঠিত আন্দোলনই ভাষা-আন্দোলন, যা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে ১৯৫২ সালে। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারিতে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউর প্রমুখ বাংলা ভাষাপ্রেমীদের আত্মদানের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতি পায়। অবশ্য এ আন্দোলনের বীজ রোপিত হয়েছিল আরও আগে, অন্যদিকে এর প্রতিক্রিয়া এবং ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। প্রকৃত বিচারে ভাষা-আন্দোলন বাঙালির আত্মপরিচয়ের সংকট থেকে উত্তরণের প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এর মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন বাঙালি জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে, অন্যদিকে সমগ্র বাঙালি জাতি পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয়। এটি একইসঙ্গে ছিল তৎকালীন পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন। বলা যায়, ভাষা-আন্দোলনের মধ্যেই নিহিত ছিল বাঙালির স্বাধিকার অর্জনের বীজমন্ত্র।

ভাষা-আন্দোলনের প্রথম পর্যায় : ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ব্রিটিশ ভারত ভাগ হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামের দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। পাকিস্তানের ছিল দুটি অংশ– পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তান। প্রায় দুই হাজার কিলোমিটারের অধিক দূরত্বের ব্যবধানে অবস্থিত পাকিস্তানের দুটি অংশের মধ্যে সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক ও ভাষাগত দিক থেকে অনেকগুলো মৌলিক পার্থক্য ছিল। সমগ্র পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ মানুষের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের বৈঠকে ইংরেজি ও উর্দুভাষা ব্যবহারের পাশাপাশি বাংলা ভাষা ব্যবহারের অধিকার সংক্রান্ত এক সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন পূর্ব বাংলা থেকে নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এ প্রস্তাবের কঠোর সমালোচনা করেন। ফলে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয়নি।

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে গড়ে ওঠে তমদ্দুন মজলিস ও রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ১৯৪৮ সালের ১০ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভায় বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ধর্মঘট ডাকার সিদ্ধান্ত হয়। ১১ই মার্চ পালিত সেই ধর্মঘটে পিকেটিংয়ের সময়ে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এর কিছুদিন পরে ২১শে মার্চ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ঢাকায় এক ভাষণে ঘোষণা করেন; 'উর্দু একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। ২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে গিয়েও তিনি একই বক্তব্য রাখেন। যখন তিনি উর্দুর ব্যাপারে তাঁর অবস্থানের কথা পুনরুল্লেখ করেন, উপস্থিত ছাত্ররা সমস্বরে 'না, না' বলে চিৎকার করে ওঠে। তাৎক্ষণিকভাবে এ ঘোষণার প্রতিবাদে তারা বলে, উর্দু নয় বাংলা হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যেও গভীর ক্ষোভের জন্ম হয়। বাংলা ভাষার সম-মর্যাদার দাবিতে পূর্ব বাংলায় আন্দোলন দ্রুত দানা বেঁধে ওঠে।

ভাষা-আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় : ১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারি পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন আবারও উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন। এর ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ২৯শে জানুয়ারি সিদ্ধান্ত হয়, ঢাকা শহরে প্রতিবাদী মিছিল-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। রাষ্ট্রভাষার দাবিতে আন্দোলনকারী সংগঠনগুলো সম্মিলিতভাবে ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে সমগ্র পূর্ব বাংলায় প্রতিবাদ কর্মসূচি ও ধর্মঘটের আহ্বান করে। আন্দোলন দমন করতে পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করে। ফলে দিনটিতে ঢাকা শহরে সকল প্রকার মিছিল, সমাবেশ ইত্যাদি বেআইনি ও নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। কিন্তু এ আদেশ অমান্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্র ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী বিক্ষোভ মিছিল শুরু করেন।

একুশে ফেব্রুয়ারি : ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী সকাল ৯টা থেকে সরকারি আদেশ উপেক্ষা করে ঢাকা শহরের স্কুল-কলেজের হাজার হাজার ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হয়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রশ্নে পুরাতন কলাভবন প্রাঙ্গণের আমতলায় ঐতিহাসিক ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্ররা পাঁচ-সাতজন করে ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসতে চায়। তারা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে স্লোগান দিতে থাকে। পুলিশ অস্ত্র হাতে সভাস্থলের চারদিক ঘিরে রাখে। বেলা সোয়া এগারোটার দিকে ছাত্ররা একত্র হয়ে প্রতিবন্ধকতা ভেঙে রাস্তায় নামার প্রস্তুতি নিলে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে ছাত্রদের সতর্ক করে দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তখন পুলিশকে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ বন্ধ করতে অনুরোধ জানান এবং ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ত্যাগের নির্দেশ দেন। কিন্তু ক্যাম্পাস ত্যাগ করার সময়ে কয়েকজন ছাত্রকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে পুলিশ গ্রেফতার করলে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। এরপর আরও অনেক ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ ছাত্ররা বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের কাছাকাছি এলে পুলিশ ১৪৪ ধারা অবমাননার অজুহাতে আন্দোলনকারীদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। গুলিতে নিহত হন রফিক, সালাম, বরকত, জব্বারসহ আরও অনেকে। শহিদের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়ে ওঠে। শোকাবহ এ ঘটনার অভিঘাতে সমগ্র পূর্ব বাংলায় তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।

২১শে ফেব্রুয়ারি-পরবর্তী আন্দোলন : ২১শে ফেব্রুয়ারির ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে সারাদেশে বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। ২২শে ও ২৩শে ফেব্রুয়ারি ছাত্র, শ্রমিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক ও সাধারণ জনতা পূর্ণ হরতাল পালন করে এবং সভা-শোভাযাত্রাসহকারে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে। ২২শে ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে শহিদ হন শফিউর রহমান শফিক। ২৩শে ফেব্রুয়ারি ফুলবাড়িয়ায় ছাত্র-জনতার মিছিলেও পুলিশ অত্যাচার-নিপীড়ন চালায়। শহিদদের স্মৃতিকে অম্লান করে রাখতে ওইদিন বিকেল থেকে রাত অবধি কাজ করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে ছাত্ররা নির্মাণ করে ভাষা-আন্দোলনের প্রথম শহিদ মিনার। ২৪শে ফেব্রুয়ারি শহিদ মিনারটি উদ্‌বোধন করেন বাইশে ফেব্রুয়ারি শহিদ হওয়া শফিউর রহমানের পিতা। ২৬শে ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে শহিদ মিনারটি উদ্‌বোধন করেন দৈনিক আজাদ পত্রিকার সম্পাদক জনাব আবুল কাশেম শামসুদ্দীন।

ভাষা-আন্দোলনের অর্জন : ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির আন্দোলন ভাষাকেন্দ্রিক হলেও তা পুরো বাঙালি জাতিকে অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে। এর ফল হিসেবে ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল ব্যবধানে মুসলিম লীগকে পরাজিত করে। একুশের

চেতনাকে ধারণ করে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি ইশতাহার ছিল ২১ দফা সংবলিত। ক্রমবর্ধমান গণ-আন্দোলনের মুখে ১৯৫৪ সালের ৭ই মে পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গৃহীত হয়। ১৯৫৫ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার জন্য বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে বাংলা ও উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো বাংলা ভাষা-আন্দোলন, মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকারের প্রতি সম্মান জানিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে, যা বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে গভীর শ্রদ্ধা ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদ্‌যাপিত হয়। দিবসটির এই আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করতে কানাডা প্রবাসী রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

ভাষা-আন্দোলনভিত্তিক সাহিত্য : রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নতুন গতি লাভ করে। রচিত হয় ভাষা-আন্দোলনকেন্দ্রিক অনেক কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস। ১৯৫৩ সালে হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় একুশের প্রথম সাহিত্য সংকলন 'একুশে ফেব্রুয়ারি' প্রকাশিত হয়। একই বছর মুনীর চৌধুরী কারাগারে বসে 'কবর' নাটক রচনা করেন। আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী লেখেন গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'। 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' কবিতা রচনা করেন মাহবুব উল আলম চৌধুরী; শামসুর রাহমান রচনা করেন 'বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা'; আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ রচনা করেন 'মাগো, ওরা বলে' কবিতা। জহির রায়হান একুশকে নিয়ে রচনা করেন উপন্যাস 'আরেক ফাল্গুন'। এছাড়া ওই সময়পর্ব থেকে বর্তমান পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন বাংলা সাহিত্যে চর্চার অন্যতম অনুপ্রেরণা।

ভাষা-আন্দোলনের তাৎপর্য : রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রধান তাৎপর্য এই যে, বাঙালি জাতি তার জাতীয়তাবোধ ও অধিকার সম্পর্কে প্রথম সচেতন হয়। ভাষার প্রশ্নে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এর ফলে পূর্ব বাংলায় গড়ে ওঠে একটি সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এরপর যত আন্দোলন সংগ্রাম হয়েছে তার পেছনে কাজ করেছে ভাষা-আন্দোলনের উজ্জ্বল স্মৃতি। ভাষা-আন্দোলনের প্রেরণায় ১৯৬২-র শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬-র ছয় দফা এবং ১৯৬৯-র গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির বিজয় অর্জিত হয়েছে। তবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করা ছিল ভাষা-আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য। এখনও সেই লক্ষ্য পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি।

উপসংহার : একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির জাতিসত্তার পরিচয় নির্দেশক দিন। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বীর ভাষা-শহিদদের অবদান জাতি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। তবে তাঁদের আত্মদান তখনই সার্থক হবে, যখন বাংলাদেশের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলন করা সম্ভব হবে। এ ব্যাপারে রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি প্রত্যেকের দায়িত্ব রয়েছে।

৬. খ. **ভূমিকা :** মাদকাসক্তি আমাদের সমাজের ভয়াবহ একটি সমস্যা। কিছু পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে একজন মানুষ নিজেকে মাদকের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে। আমাদের দেশের তরুণদের মধ্যে মাদক গ্রহণের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। একটি জাতির উন্নয়নের ধারাকে গতিশীল করে তরুণসমাজ। কিন্তু মাদক তরুণসমাজের সেই অদম্য কর্মপ্রেরণাকে ধ্বংস করে দেয়। ফলে সে নিজেকে যেমন ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়, তেমনি দেশকেও মহাবিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দেয়। তাই এর প্রতিকার করা অত্যাবশ্যক।

মাদকের আবির্ভাব বা উৎস : নেশার ইতিহাস বেশ প্রাচীন। মদ, গাঁজা, আফিম, চরস বা তামাকের কথা বহু আগে থেকেই মানবসমাজে প্রচলিত ছিল। উনিশ শতকের মধ্যভাগে বেদনানাশক ওষুধ হিসেবে মাদকের ব্যবহার শুরু হয়, যাকে ইংরেজিতে ড্রাগ বলা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সৈনিকদের ব্যথার উপশম হিসেবে ড্রাগের ব্যবহার হলেও পরে হতাশা কাটাতেও তারা ড্রাগ ব্যবহার করতো। এরপর থেকেই কলম্বিয়া, বলিভিয়া, ব্রাজিল, ইকুয়েডর ইত্যাদি দেশে নেশার দ্রব্য হিসেবে ব্যাপকভাবে ড্রাগের ব্যবহার শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীব্যাপী।

মাদকদ্রব্যের প্রকারভেদ : সমাজে নানা ধরনের মাদকদ্রব্যের উদ্ভাবন ও ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন– হেরোইন, প্যাথেড্রিন, এলএসডি, মারিজুয়ানা, কোকেন, হাসিস প্রভৃতি আধুনিককালের মাদকদ্রব্য; তবে এর মধ্যে হেরোইন ও কোকেন বেশ দামি। আমাদের দেশের যুবসমাজ সচরাচর যে মাদকদ্রব্যগুলো ব্যবহার করে সেগুলো হলো– সিডাকসিন, ইনকটিন, প্যাথেড্রিন, ফেনসিডিল, ডেক্সপোটেন, গাঁজা ইত্যাদি। তবে এ সবকিছুর ব্যবহারকে ছাড়িয়ে গেছে অত্যাধুনিক এক মাদক যার নাম ইয়াবা।

মাদকদ্রব্যের ব্যবহার : দেশে মাদকের ব্যবহার বহু বিচিত্র। মানুষ নিজেকে অপ্রকৃতিস্থ করতে মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে। মাদকের ব্যবহার করে সে কল্পনার জগতে বিচরণ করে। এক্ষেত্রে মাদক ব্যবহারকারীরা নানা ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করে। যেমন– ধূমপান, ইনহেল বা শ্বাসের মাধ্যমে, জিহ্বার নিচে গ্রহণের মাধ্যমে, সরাসরি সেবনের মাধ্যমে, স্কিন পপিং ও মেইন লাইনিংয়ের মাধ্যমে। তবে যেভাবেই গ্রহণ করুন না কেন তাদের উদ্দেশ্য একটাই। আর তা হলো নেশায় উন্মত্ত হওয়া। প্রথমে কৌতূহলের বশে অনেকেই নেশাদ্রব্য গ্রহণ করে। কিন্তু ধীরে ধীরে তাতে অভ্যস্ত হয়ে ভয়াবহ এক সর্বনাশের পথে এগিয়ে যায় তারা।

মাদকাসক্তির কারণ : এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, মাদকাসক্তির অন্যতম কারণ ব্যক্তিজীবনের হতাশা। মানুষ যখন জীবন সম্পর্কে অনেক বেশি হতাশ হয়ে পড়ে, তখন সে মাদকদ্রব্যের আশ্রয় নেয়। হতাশাগ্রস্ত সাধারণ তরুণদের মধ্যে মাদক গ্রহণের হারও অনেক বেশি। তাছাড়া অসৎ সঙ্গে লিপ্ত হয়েও অনেকেই মাদকের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। যেসব পরিবারে পারিবারিক অশান্তি অনেক বেশি, সে পরিবারের ছেলেমেয়েদের জীবন বিশৃঙ্খল হতে থাকে। তারা এই বিশৃঙ্খলা থেকে ধীরে ধীরে মাদকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আমরা প্রতিদিনের পত্রপত্রিকায় এ ধরনের অনেক ঘটনাই লক্ষ করি। বেশির ভাগ মাদকসেবী দেখা যায় যারা বন্ধুবান্ধব বা সহপাঠীর সংস্পর্শে মাদকে আসক্ত হয়, তবে পারিবারিক অশান্তিই মাদকাসক্তির বিশেষ কারণ হিসেবে দেখা যায়।

মাদক চোরাচালান : সাধারণত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মাদক চোরাচালান হয়। সীমান্তে স্থল বা জলপথে এবং আকাশপথে বিশ্বব্যাপী এক বৃহৎ মাদক চোরাচালান নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে যার পেছনে রয়েছে বিরাট এক সিন্ডিকেট। কিছুকাল আগেও মায়ানমার, থাইল্যান্ড ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম নিয়ে গড়ে ওঠে আন্তর্জাতিক মাদক চোরাচালানের 'স্বর্গভূমি'। তবে ভিয়েতনামে সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে এই নেটওয়ার্ক ভেঙে যায়। এর কিছুদিন পরেই চোরাচালানকারীরা ইরান, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান নিয়ে গড়ে তোলে ড্রাগ পাচারের নতুন ভিত্তিভূমি, যার নাম 'গোল্ডেন ক্রিসেন্ট'।

বাংলাদেশে মাদকের আগ্রাসন : বাংলাদেশে মাদকের ব্যবহার আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অবৈধভাবে দেশে প্রবেশ করা এই মাদক আমাদের যুবসমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। মায়ানমার থেকে অবাধে এদেশে প্রবেশ করছে ইয়াবা, যাতে আসক্ত হয়ে পড়ছে বহু তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতি। দর্শনার 'কেরু এন্ড কোম্পানি' এদেশের একমাত্র লাইসেন্সধারী মদ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান; কিন্তু তার বাইরে বহু বিদেশি কোম্পানির মদ অবৈধভাবে অবাধে বাজারে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া গাঁজা ও আফিমের মতো মাদকদ্রব্যও অবাধে ক্রয়-বিক্রয় করা হচ্ছে।

মাদকাসক্তির ভয়াবহতা : মাদকাসক্তিকে অপ্রতিরোধ্য রোগ এইডসের সঙ্গে তুলনা করা যায়। মাদকাসক্তি মানুষকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। ইয়াবা ও হেরোইনের মতো মাদকদ্রব্য মানুষের শরীরের সমস্ত রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। এর আসক্তিতে মানুষ এক অস্বাভাবিক জীবনযাপন করে। নেশায় আক্রান্ত ব্যক্তির সুস্থ জীবনে ফিরে আসাও খুব সহজ হয় না। শরীরে মাদক গ্রহণ বন্ধ করা মাত্রই 'উইথড্রয়াল সিমটম' শুরু হয়। তখন মাদক না পেলে শুরু হয় টার্কি পিরিয়ড; হাত পা কাঁপতে থাকে; অসম্ভব শারীরিক যন্ত্রণা শুরু হয় এবং একপর্যায়ে তা হৃৎপিণ্ডে আঘাত করে। তখন সুচিকিৎসা না পেলে খুব অল্প সময়ে মাদকাসক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

মাদকাসক্তি প্রতিরোধ : বিশ্বজুড়ে যে মাদকবিষ ছড়িয়ে পড়ছে তার থাবা থেকে মানুষকে বাঁচাতে হবে। এ নিয়ে বিশেষজ্ঞরা ভাবছেন। সমাজসেবীরা উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। দেশে দেশে নানা সংস্থা ও সংগঠন মাদকবিরোধী আন্দোলন শুরু করেছে। আমাদের দেশেও মাদকবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছে। বেতার, টিভি, সংবাদপত্র ইত্যাদি গণমাধ্যম মাদকবিরোধী জনমত গঠনে সক্রিয় হয়েছে। মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়েছে। এসব তৎপরতার লক্ষ্য হচ্ছে :

১. মাদকাসক্তদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ভেষজ ও মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ,
২. সুস্থ বিনোদনমূলক কার্যক্রমের সঙ্গে তরুণদের সম্পৃক্ত করে নেশার হাতছানি থেকে তাদের দূরে রাখা,
৩. ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে মাদকাসক্তির মর্মান্তিক পরিণতি সম্পর্কে সকলকে সচেতন করা,
৪. মাদক ব্যবসা ও চোরাচালানের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলা,
৫. বেকার যুবকদের জন্যে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

উপসংহার : মাদকাসক্তি একটি সামাজিক সমস্যা। এ সমস্যায় তরুণরাই বেশি আসক্ত। একটি দেশের গতিশীলতাকে অব্যাহত রাখে তরুণসমাজ। তারাই যদি মাদকের কবলে পড়ে নিজেদের জীবনকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়, তবে দেশের সার্বিক অগ্রগতি চরমভাবে বিনষ্ট হবে। তাই তরুণসমাজকে মাদক সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং এর কারবারিদের সর্বাগ্রে বয়কট করতে হবে। আমাদের প্রত্যাশা বাংলাদেশ মাদকমুক্ত হয়ে সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হোক।

৬. গ. **ভূমিকা :** সভ্যতার ক্রম পরিবর্তনে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা পালন করেছে বিজ্ঞান। বর্তমান বিশ্বে মানুষের যে অগ্রযাত্রা তা বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। বিজ্ঞান মানুষকে গতিশীল করেছে এবং সভ্যতার অগ্রযাত্রাকে করেছে ত্বরান্বিত। বর্তমানে কৃষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূত্র বিজ্ঞানই আবিষ্কার করেছে। কৃষিকাজে বিজ্ঞানের অবদান অপরিসীম।

মানবসভ্যতা ও কৃষি : মানব সভ্যতার ইতিহাস অত্যন্ত পুরোনো। আর সেই সভ্যতার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কৃষির হাত ধরেই। মানুষ শিকারের বিকল্প হিসেবে কৃষিকে বেছে নিয়ে তার জীবনকে গতিশীল ও উন্নত করেছিল। তাই এটি মানুষের আদিমতম জীবিকার একটি পেশাও বটে। সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায় যে, কৃষিতে যে দেশ যত তাড়াতাড়ি অগ্রগতি সাধন করতে পেরেছে, সে দেশ তত তাড়াতাড়ি সভ্যতার উপরের সিঁড়িকে অতিক্রম করেছে। এ থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, কৃষির উন্নতিতেই সমাজ, দেশ ও সভ্যতার ক্রমোন্নতি সম্ভব হয়।

মানবজীবনে কৃষির গুরুত্ব : কৃষি মানুষের অস্তিত্বের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। মানবজীবন ও মানবসমাজে এর গুরুত্ব অপরিসীম। জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে এটি মানুষের আদিমতম জীবিকার উপায়। দেশে দেশে কৃষিই সমাজের মেরুদণ্ড, কৃষিই সমাজের ভিত্তি। স্বভাবতই কৃষির ক্রমোন্নতিতেই সমাজের ও দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি। এই উন্নতিতে অনন্য ও অভাবনীয় ভূমিকা রেখেছে বিজ্ঞান। আজকের বিশ্বে প্রতিটি ক্ষেত্রের মতো কৃষিক্ষেত্রেও বিজ্ঞানই আজ বাড়িয়ে দিয়েছে তার সুদূরপ্রসারী কল্যাণী হাত।

কৃষিকাজে বিজ্ঞান : মানুষ খাদ্যের জন্য কৃষির ওপর নির্ভরশীল। আজ বিজ্ঞানের প্রভাবে কৃষিকাজ আদিম স্তর কাটিয়ে আধুনিক স্তরে পৌঁছেছে। পানি সেচের ব্যবস্থা, উন্নত ধরনের বীজ, বীজ বপন, ফসল কাটা ও মাড়াই, ভূমি সংরক্ষণ ইত্যাদির প্রভূত উন্নতি কৃষিবিজ্ঞানেরই আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর মেশিনের অবদান। পৃথিবীতে আজ জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু ফসলি জমির পরিমাণ সীমিত। এ সীমিত কর্ষণযোগ্য জমিতে বিজ্ঞানের সহায়তায় নতুন বীজ আবিষ্কার, নতুন পদ্ধতি প্রয়োগে মানুষ ক্ষুধার্তের অন্ন সংগ্রহের প্রয়াস চালাচ্ছে।

বিভিন্ন দেশে কৃষিকাজে বিজ্ঞান : উন্নত দেশগুলোর কৃষিব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিজ্ঞাননির্ভর। জমিতে বীজ বপন থেকে শুরু করে ঘরে ফসল তোলা পর্যন্ত সমস্ত কাজেই রয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়া। বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক কৃষিযন্ত্র, যেমন– মোয়ার (শস্য-ছেদনকারী যন্ত্র), রপার (ফসল

কাটার যন্ত্র), বাইন্ডার (ফসল বাঁধার যন্ত্র), থ্রেশিং মেশিন (মাড়াইযন্ত্র), ম্যানিউর স্প্রেডার (সার বিস্তরণ যন্ত্র) ইত্যাদি উন্নত দেশগুলোর কৃষিক্ষেত্রে এনেছে বৈপ্লবিক সাফল্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের খামারে একদিনে ১০০ একর পর্যন্ত জমি চাষ হচ্ছে কেবল এক-একটি ট্রাক্টরের মাধ্যমে। সেগুলো আবার একসাথে তিন-চারটি ফসল কাটার যন্ত্রকে একত্রে কাজে লাগাতে সক্ষম। তারা বিভিন্নভাবে কৃষিকাজের এমন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করছে যার ফলে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তারা কৃষিকাজে ব্যাপকভাবে অগ্রগামী। যেমন বলা যায় জাপানের কথা। জাপানে জমির উর্বরাশক্তি বাংলাদেশের তুলনায় কম। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে তারা বাংলাদেশের তুলনায় ৬ গুণ বেশি ফসল উৎপাদন করছে। শীতপ্রধান দেশে 'শীত নিয়ন্ত্রণ' ঘর বানিয়ে শাকসবজি এবং ফলমূল সংরক্ষণ করছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে বর্তমানে শুষ্ক মরুভূমির মতো জায়গাতে সেচ, সার ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় চাষাবাদ করে সোনার ফসল ফলানো সম্ভব হচ্ছে। এভাবে বিজ্ঞান কৃষিকাজে এক যুগান্তকারী বিপ্লব সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশের কৃষিকাজে বিজ্ঞান : আমাদের দেশেও এখন কৃষিকাজে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে জমি খণ্ডবিখণ্ড হচ্ছে। এই খণ্ডবিখণ্ডতার কারণে জমি কর্ষণে ব্যাপকভাবে ট্রাক্টর ব্যবহার করা যাচ্ছে না। তবে মানুষ এখন আর চাতকের ন্যায় বৃষ্টিধারার জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে না। সেচের জন্য এখন ব্যবহার করা হয় গভীর নলকূপ এবং মেশিনচালিত পাম্প। বপনের জন্য ব্যবহার করা হয় উন্নত ধরনের বীজ। বীজ সংরক্ষণে সাহায্য নেওয়া হয় বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির। বর্তমানে রাসায়নিক সার ব্যবহার করে ফসল উৎপাদনের মাত্রা বাড়ানো হচ্ছে। আগে যে জমিতে একধরনের ফসল হতো, বিজ্ঞানের সাহায্যে এখন সেখানে তিন ধরনের ফসল হয়। ধানের চারা রোপণ, ধান কাটা ও ধান মাড়াইয়ের আধুনিক যন্ত্রপাতি বাংলাদেশে বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে আমাদের দেশের কৃষিকাজ এখনো সম্পূর্ণ যান্ত্রিক করা সম্ভব হয়নি। চাষাবাদে বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারলে আমাদের খাদ্য সমস্যা সমাধান করা যাবে এবং বিদেশেও রপ্তানি করা যাবে।

বিজ্ঞানসম্মত কৃষির গুরুত্ব : আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কৃষির বাস্তবিক গুরুত্ব অনেকখানি। তবে পুরোনো পদ্ধতির চাষাবাদে বর্তমানে আর সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। এখন প্রয়োজন অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ। উন্নত বিশ্বের মতো ছোটো জায়গায় অধিক ফসল ফলানোর কৌশল আমাদেরও আয়ত্ত করতে হবে। তবেই কৃষক ও কৃষির সমন্বিত সাফল্য ত্বরান্বিত হবে।

বৈজ্ঞানিক কৃষি ও অর্থনীতি : বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষিকাজের ফলে অর্থনীতির অগ্রগতি সাধিত হওয়া সম্ভব। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, আমরা এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি। আমরা নিজেদের উৎপাদিত ফসল বাইরেও রপ্তানি করতে সমর্থ হচ্ছি। জীবনরহস্য আবিষ্কারের ফলে পাটের সোনালি দিন আবার আমাদের মধ্যে আসতে শুরু করেছে। বহু আগে থেকেই আমরা বিভিন্ন দেশে চা রপ্তানি করে আসছি। সুতরাং সর্বাধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদের ফলে আমাদের পক্ষে এ সাফল্যকে আরও ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

উপসংহার : কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞানের জাদুর ছোঁয়ায় অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। কেননা বিজ্ঞানকে আমরা যত কাজে লাগাতে পারব, ততই আমাদের কৃষিতে অপার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। তাই সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায় থেকেই বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদে কৃষককে উৎসাহিত করা আবশ্যক এবং সহযোগিতার হাতকে প্রসারিত করা একান্ত কর্তব্য।